বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত নারী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
থেকে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত।
ডিসেম্বর, ২০০১।

449613

Dhaka University Library
449613

গবেষক
জেসমিন দীনা রায়
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

তত্ত্বাবধায়ক
ডঃ নাজমা চৌধুরী
অধ্যাপক,
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

449613

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন

ঃ প্রেক্ষিত নারী

জেসমিন দীনা রায়

GIFT

449613

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ডিসেম্বর, ২০০১
সংশোধন ও পরিমার্জন, ২০০৩

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

আমি সানন্দে প্রত্যয়ন করছি যে, " বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত নারী" শিরোনামের অভিসন্দর্ভটি জেসমীন দীনা রায় - এর একক ও নিজস্ব গবেষণার ফলশ্রুতি।

আমি আরও প্রত্যয়ন করছি যে, এই অভিসন্দর্ভটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি তত্ত্বাধান করেছি এবং আদ্যোপান্ত পড়েছি এবং এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-এর এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য জমা দেয়ার সুপারিশ করছি।

449613

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ডঃ নাজমা চৌধুরী
অধ্যাপক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত নারী' শিরোনামে এই অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ-এ এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য প্রনীত হয়েছে এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ইনস্টিটিউটে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য পেশ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

নারীকে মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচনায় নারীর সমঅধিকার এবং সম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় যেসকল শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি ও সংগঠনসমূহ প্রচলিত বিশ্বাস ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

৬০ ও ৭০ দশকে নারী বিষয়টি সরাসরি ধারণাগত ও প্রায়োগিক সংযোগ স্থাপিত হয়। ৮০-এ দশকে বিশ্বব্যাংক উন্নয়ন মডেলের সহযোগী হিসেবে উন্নয়নে নারী নীতিমালার প্রাতিষ্ঠানিকরণে আরো জোরদার হতে থাকে। '৯০-র দশকে অতীত সীমাবদ্ধতামুক্ত নারী উন্নয়নের নয়া পথ বিকল্পের নসধান দেয় যা শুধুমাত্র নারী উন্নয়নই নয় - বরং নারী ও পুরুষের অসম সম্পর্ক উন্নয়নই মূল লক্ষ্য বলে চিহ্নিত করা হয়, তাই এই অসম সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ ও দাতাসংস্থাসমূহ প্রতিটি দেশের সরকারের জন্য করণীয় বিষয় চিহ্নিত করে, যা পালনপূর্বক নারীকে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেবে।

এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উন্নয়ন দর্শন দলিল হিসেবে পরিচিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর অবস্থা ও অবস্থান বিশ্লেষণের লক্ষ্যে আমি গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠি। কেননা আমি বিশ্বাস করি নারীকে উন্নয়নের সমঅংশীদারিত্বের নিরীখে দেখতে হলে রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন, আইনী সহায়তার পাপাশি পরিকল্পনায় নারীকে পুরুষের পাশাপাশি উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমঅংশগ্রহণকে মতামত গুরুত্ব দিতে হবে। মানব সম্পদ গঠন প্রক্রিয়ায় নারীকে সমস্থান দিতে হবে। এ বিবেচনা থেকে 'বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত নারী' বিষয়টিকে গবেষণা কর্ম হিসেবে গ্রহণ করি।

এ গবেষণা কার্য্য পরিকল্পনায় যেসব মৌলিক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার থেকে অকুণ্ঠ সাহায্য নেয়া হচ্ছে তা' প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্বনামধন্য লেখক-গবেষকের ঋণ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এম. ফিল. সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রদানে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণা কার্য্যকে বিভিন্ন তথ্য, প্রতিবেদন, পুস্তকের জন্য উইমেন ফর উইমেন, উন্নয়ন পদক্ষেপ, গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার, বিডস গ্রন্থাগার প্রভৃতি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তাদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছে।

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মা-বাবা, আমার সন্তান অবন্তিকা ও জীবন সঙ্গী খ্রীষ্টফার-কে যারা আমাকে আমার গবেষণায় উৎসাহসহ মায়ের দায়িত্ব ও সাংসারিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত রেখেছে যার ফলে আমি আমার লেখায় যথেষ্ট সময় দিতে পেরেছি। আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ, সংকলনে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে সেই আর্থিক সুবিধা আমি আমার স্বামী খ্রীষ্টফারের কাছ থেকে পেয়েছি।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা জানাই আমার মেঝভাই এডওয়ার্ড-কে যে, তার নিজ কর্মের পাশাপাশি গবেষণার লেখা কম্পিউটারে ধারণ করেছে, যেখানে শুধু তার সময়ই নয় পাশাপাশি দিনের পর দিন গভীর রাত পর্যন্ত শ্রম দিয়েছে।

সর্বশেষে, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি আমার তত্ত্বাবধায়ক ডঃ নাজমা চৌধুরীকে যিনি তার কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও আমার লেখার পরিমার্জন, পরিবর্ধনে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ডিসেম্বর, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্রঃ

বিষয় ঃ	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	III
ঘোষণা পত্র	IV
উৎসর্গ	V
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	VI
সূচীপত্র	VIII
সারণী ও চিত্র তালিকা	X
শব্দ সংক্ষেপ	XII
সার সংক্ষেপ	XIII

প্রথম অধ্যায়

১.১	ভূমিকা	১
১.২	গবেষণার উদ্দেশ্য	২
১.৩	গবেষণার পরিধি ও যৌক্তিকতা	৩
১.৪	গবেষণা পদ্ধতি	৪
১.৫	গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস	৬
১.৬	সংশ্লিষ্ট সাহিত্যপত্রের পর্যালোচনা	৭
	তথ্য নির্দেশিকা	১২

দ্বিতীয় অধ্যায় **বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা**

২.১	পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ	১৩
২.২	বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট	১৫
২.৩	উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ	১৭
	তথ্য নির্দেশিকা	৩৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়	উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন	পৃষ্ঠা নং
৩.১	উন্নয়ন ধারণা	৩৭
৩.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৪০
৩.৩	মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্রমবিবর্তনের ধারণা	৪২
৩.৪	মানব সম্পদ উন্নয়নের মাত্রা	৫৩
৩.৫	মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও অগ্রাধিকার	৫৪
৩.৬	মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ	৬০
	তথ্য নির্দেশিকা	৬৩

চতুর্থ অধ্যায়	মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ নারীর অবস্থান	
৪.১	বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রান্তিকতা	৬৫
৪.২	নারী ও রাজনীতি	৭৫
৪.৩	নারী ও আইন	৮০
৪.৪	মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ঃ নারী ও পুরুষের বৈষম্য	৮৩
৪.৫	মানব সম্পদ উন্নয়ণ ও নারী ঃ প্রান্তিকতা	৮৮
	তথ্য নির্দেশিকা	৯৫

পঞ্চম অধ্যায়	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী	
৫.১	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন	৯৭
৫.২	পরিকল্পনার আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন	১০০
৫.৩	পরিকল্পনা ও নারী	১০৪
৫.৪	পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী কর্মসূচী	১০৪
৫.৫	পরিকল্পনায় নারী : উন্নয়ন সম্পদ বরাদ্দ	১২৬
৫.৬	পরিকল্পনাধীন কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন	১২৮
	তথ্য নির্দেশিকা	১৩০

ষষ্ঠ অধ্যায়	মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী ঃ পরিকল্পনা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা	
৬.১	পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ঃ একটি পর্যালোচনা	১৩২
৬.২	মানব সম্পদ উন্নয়ন বনাম নারী উন্নয়ন কর্মচারী	১৩৬
৬.৩	নারী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা	১৪৩
৬.৪	উপসংহার ও সুপারিশমালা	১৪৮
	অথ্য নির্দেশিকা	১৫৬
গ্রন্থপঞ্জী		১৫৭

Dhaka University Institutional Repository

সারণী ও চিত্র তালিকা ঃ-

		পৃষ্ঠা নং
১.১	রাজনৈতিক ব্যবস্থার মডেল	৫
২.১	বাংলাদেশের পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাঠামো	১৬
২.২	উন্নয়ন চলক	১৯
২.৩	বীক্ষণের উৎস সমূহ	২১
২.৪	বীক্ষণ, অঙ্গীকার এবং সামর্থের আন্তঃসম্পর্ক	২২
২.৫	প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী	৩৩
২.৬	পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত নারী	৩৩
৩.১	মানব উন্নয়নে মূল সূচক	৫৫
৩.২	উইএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের নির্দেশকসমূহ	৫৫
৩.৩	Maslow – এর প্রয়োজন তত্ত্ব	৫৯
৩.৪	রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শ	৬০
৩.৫	মানবিক উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা	৬১
৪.১	বিভিন্নক্ষেত্রে নারী নির্যাতন	৬৮
৪.২	শ্রমশক্তি জরিপে নারীর অংশগ্রহণ	৭০
৪.৩	কর্মস্থলে পদমর্যাদা অনুযায়ী নারী-পুরুষের শতকরা ভাগ	৭০
৪.৪	২০০০ সাল পর্যন্ত গ্রামীন ও শহর এলাকায় নারীদের শ্রমশক্তি	৭১
৪.৫	মজুরী বৈষম্য	৭১
৪.৬	পুরুষ-নারীর কাজ ও আয়ের একটি বৈষম্যমূলক চিত্র	৭২
৪.৭	প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার (১৫ বছরের উর্দ্ধে)	৭৩
৪.৮	লিঙ্গ ও বাসস্থান অনুযায়ী স্বাক্ষরতার তুলনামূলক হার	৭৩
৪.৯.	শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারী ও পুরুষের শতকরা হার	৭৪
৪.১০.	প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৮১-৯১)	৭৪
৪.১১.	পুরুষ ও নারীর পুষ্টি গ্রহণের তারতম্য	৭৫
৪.১২.	পরিবারে নারী ও পুরুষের খাদ্য গ্রহণের ব্যবধান	৭৫
৪.১৩.	রাজনীতিতে নারী : দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় ('৮১)	৭৭
৪.১৪.	রাজনীতিতে নারী : দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় ('৮৭)	৭৭
৪.১৫.	জাতীয় সংসদে নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার ('৭৩-'৯১)	৭৮
৪.১৬	জাতীয় সংসদে বিজয়ী নারী সদস্যাদের শতকরা হার	৭৮
৪.১৭	প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা	৭৯

Dhaka University Institutional Repository

৪.১৮ বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে নারী মন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার ৭৯
৪.১৯ নির্যাতনে নারী পুরুষের বৈষম্য ৮২
৪.২০ স্বাক্ষরতা, মজুরীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য ৮৪
৪.২১ মানব উন্নয়ন সূচকে তুলনামূলক চিত্র (বিভিন্ন দেশ) ৮৭
৪.২২ মাথাপিছু আয় ও মানব উন্নয়নসূচকের ক্রমরাশিমান ব্যবধান ৮৭
৪.২৩ বাংলাদেশের মানব উন্নয়নের অগ্রগতি ও বঞ্চনার চিত্র ৮৯
৪.২৪ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে নারী-পুরুষ বৈষম্য ৯০
৪.২৫ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে নারী-পুরুষ বৈষম্য (১৯৯৮) ৯০
৪.২৬ কৃষিশ্রমশক্তিতে নারীর সম্পৃক্ততা (১৯৮৯) ৯২

৫.১ বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের নির্দেশক ১০০
৫.২ ৪টি পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়নে তুলনামূলক বরাদ্দ ১০১
৫.৩ মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রগতি ১০৩
৫.৪ নারী উন্নয়নে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ ১২৬
৫.৫ ৪র্থ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে খাতওয়ারী ব্যয় বরাদ্দ ১২৭
৫.৬ ৫ম পরিকল্পনায় নারী ও শিশু সম্পর্কিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ ১২৭

৬.১ নারী বিষয়ক প্রকল্পের জন্য দাতাদের সাহায্য ১৩৮
৬.২ নারী-পুরুষ ভেদে স্বাক্ষরতার হার ১৩৯

Dhaka University Institutional Repository

ABBREVIATION :

1. ASEAN	-	Association of South East Asian Nations.
2. DM	-	Development Matrix.
3. ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council.
4. FBN	-	Fulfillment of Basic Needs.
5. GDI	-	Gender Related Development Program.
6. GEM	-	Gender Empowerment Measure.
7. HCO	-	Human Capital Oriented.
8. HDI	-	Human Development Index.
9. HRD	-	Human Resource Development.
10. ILO	-	International Labor Organization.
11. JPA	-	Jakarta Plan of Action.
12. LLP	-	Local Level of Planning.
13. MCH	-	Mother Care Health.
14. NAP	-	National Association of Planning.
15. NCWD	-	National Council for Women Development.
16. NEC	-	National Economic Council.
17. PFD	-	Poverty Focused Development.
18. PQLI	-	Physical Quality of Life Index.
19. PD	-	Poverty Driven.
20. PFA	-	Platform For Action.
21. SAM	-	Social Accounting Matrix.
22. SBP	-	Socio-Psychology Based.
23. SAARC	-	South Asian Association for Regional Co-operation.
24. TYRIP	-	Three Years Rolling Investment Program.
25. TTC	-	Technical Training Center.
26. UNDP	-	United Nations Development Program.
27. UNIDO	-	United Nations Industrial Development Organization.
28. UNICEF	-	United Nations International Children's Emergency Fund.
29. UNESCO	-	United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.
30. UNCTED	-	United Nations Conference on Trade and Development.
31. VTI	-	Vocational Training Institute.
32. WID	-	Women in Development.
33. WHO	-	World Health Ordanization.

Dhaka University Institutional Repository

সার সংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বের প্রায় সকল দেশেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উন্নয়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনা বিবেচিত হয় এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারকদের দিক নির্দেশনা প্রদানে উন্নয়ন পরিকল্পনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় প্রথমদিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করলেও পরবর্তীতে মানবীয় সমস্যা ও প্রয়োজন নিরসন অর্থাৎ আশা-আকাংখা নিবৃত্তির শক্তি সামর্থ অর্জন বা সক্ষমতা লাভের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে থাকে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য মানবিক দিককে পৃথক পৃথকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং সামগ্রিক উন্নয়নের প্রশ্নে এসব দিকগুলো পারস্পারিক সম্পর্ক গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হতে দেখা যায়। আবার এই মাববিক দিকের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সমগ্র মানব সম্পদের অর্ধেক নারী, সেই নারী উন্নয়ন পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে উন্নয়ন তত্ত্ব নারীর দিকে দৃষ্টি ফেরায় এবং উন্নয়ন ধারণায় নারী ইস্যু সংযোগ স্থাপিত হয়। *উন্নয়নে নারী* মতবাদ ও কাঠমো ভিত্তিক আন্দোলন দ্রুত বিকশিত হতে শুরু করে যেখানে নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক সম্পর্ক নিরসনের পরিবর্তে *'উন্নয়নে নারী'* প্রতি মূল দৃষ্টিপাত করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে উন্নয়নের পরিমন্ডলে দারিদ্র দূরীকরণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নারীরা যে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি এবং অবহেলিত উপকারভোগী এই উভয় সত্যটি সামনে উঠে আসে। উন্নয়ন পরিকল্পনাবিদদের কাছে কেবল মা ও গৃহবধু অবলম্বন থেকে নারীরা উন্নীত হয় উৎপাদনে এবং পরিসেবা প্রদানকারীর অবস্থানে।

'উন্নয়নে নারী' মূলতঃ নারী কল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, যেখানে নারীদের গৃহকর্মের অবস্থার উন্নয়ন এবং সন্তান উৎপাদনী ভূমিকা সম্পর্কিত চাহিদা পূরণ ছাড়াও প্রয়োজনীয় আইনগত ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পর্কিত করার উপর জোর দেয়।এই মতবাদ নারীর উৎপাদন (Productive) ক্ষমতায় উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং উৎপাদনশীল খাতে নারীর পশ্চাৎপদতা কাটানোর লক্ষ্যে কৌশল উদ্ভাবনের কথা বলে।পরবর্তী পর্যায়ে *'উন্নয়নে নারী'* ধারণাটির বিপরীতে *'নারী ও উন্নয়ন'* বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে, যার মূল কথা হলো অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোয় নারীর সীমিত প্রতিনিধিত্বের সমাধান স্বরূপ পরিকল্পিত হস্তক্ষেপমূলক কৌশলগ্রহণ। এরপর 'নারী পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়ন' তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে যেখানে নারীর সকল দিককে ধারণ করে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে। পরবর্তীতে ১৯৮০-র দশকে *উন্নয়নে নারী, নারী ও উন্নয়ন* নীতিমালায় সীমাবদ্ধতার প্রেক্ষিতে জেন্ডার এবং উন্নয়ন (Gender and Development - GAD) নামক নারী উন্নয়ন তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে, যার ভিত্তি সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ এবং যে নীতি নারীর জীবনের সকল দিককে ধারণ করে নারী কর্তৃক সম্পাদিত

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনমূলক বা পুনঃউৎপাদনমূলক ব্যক্তিগত বা সামাজিক সকল ধরণের কাজের উপর মনোযোগ স্থাপন করে পারিবারিক ও সাংসারিক কাজকে অবজ্ঞা করার যে কোন প্রচেষ্টাকে নাকচ করে। এই নীতিমালা কেবল নারীর উপরই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্কের ওপরই আলোকপাত করে এবং এর চূড়ান্ত লক্ষ্য নারীর ক্ষমতায়ন, তাদের এমন স্তরে উন্নীত করা যেখান থেকে তারা নিজেদের অধিকার, পছন্দ, অগ্রাধিকারের জন্য লড়াই করতে সক্ষম। এভাবে অর্ধেক মানব সম্পদের অংশ হিসেবে নারী পরিকল্পনায় স্থান পেতে পারে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ গবেষণার বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যেখানে গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে পরিকল্পনার প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নকে উন্নয়নের পূর্ব শর্ত হিসেবে গ্রহণ করে অর্ধেক মানব সম্পদ হিসেবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন বিশ্লেষণ করতে বিগত ৫টি পরিকল্পনার আলোকে নারীর অবস্থান আলোচনা করতে গবেষণা যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি, গবেষণা পদ্ধতি, প্রকল্প অনুমান প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রভৃতির আলোচনার সাথে বাংলাদেশের উন্নয়ন স্বপ্ন, নারী উন্নয়ণ নীতিমালা ও বাস্তবতাসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার বিষয়বস্তুর আলোকে তৃতীয় অধ্যায়ে উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্রমবিবর্তন ধারণার উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং এর মাত্রা, প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার উল্লেখপূর্বক মানব সম্পদ উন্নয়নকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন মতাদর্শ আলোচনা করা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য 'মানব সক্ষমতার গঠন' এবং 'সক্ষমতার ব্যবহার'-এর জন্য একটি সহযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি একটি পরিকল্পিত নীতিমালা থাকা প্রয়োজন কেননা, একমাত্র নীতিই পারে মানুষের সম্ভাবনাকে চর্চা ও বিকশিত করতে।

আমাদের পরিকল্পনায় মানব সম্পদ হিসেবে নারীকে স্বীকার করলেও মানব সম্পদ উন্নয়ণ প্রশেণ নারী বিযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে তাই এখনো নারী-পুরুষের জন্য পৃথক সূচক তৈরী হয় এবং অসম অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সামাজিক মূল্যবোধ, সরকারী নীতিমালা ও পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয়হীনতা। সামাজিক মূল্যবোধ যেখানে পিতৃতান্ত্রিকতা, ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেকানে নারী মা ও গৃহবধু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু মানুষ হিসেবে নয়, বিষয়টি চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণার পঞ্চম অধ্যায়ে, বাংলাদেশে এযাবৎ যে ৫টি পরিকল্পনা ও একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনীত হয়েছে তার আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী কর্মসূচীর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেকানে মানব সম্পদ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং নারী কর্মসূচী দুঃস্থ্য সেবা, মাতৃকল্যান, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

দ্বারা আবদ্ধ। এবং এ সব কর্মসূচীসমূহ যথাযথ সময়ে বাস্তবায়ন হয়নি এবং সম্পদের ক্ষেত্রে কম বরাদ্দের বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।

গবেষণার শেষ অধ্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন হিসেবে নারী উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে নারী উন্নয়ন বিষয়টির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। নারী এই আলোচনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্ণীত কর্মসূচীসমূহের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে শক্তিশালী সমর্থক হিসেবে রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন, প্রশাসনের গুরুত্ব অনুধাবন ও বিশ্লেষণপূর্বক কিছু সুপারিশ উপস্থাপিত হয়েছে, যার মূল কথা হলো - "নারীকে মূল ধারায় আনতে হলে কল্যাণমূলক কর্মসূচীর পরিবর্তে নারীর ক্ষমতায়ন ও বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য নারী-পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থার উন্নয়নে নারীরপক্ষে আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা ও আইনী সহায়তার পাশাপাশি রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠনে, প্রমাসনে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত ও নিশ্চিত করতে হবে এবং সরকারী পর্যায়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নীতিমালাসমূহকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত করতে হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

১.১ ভূমিকা

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

১.৩ গবেষণার পরিধি ও যৌক্তিকতা

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি

১.৫ গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস

১.৬ সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

১.১ ভূমিকা ঃ

নারীকে রাষ্ট্র-সরকার-সমাজ-পরিবার দীর্ঘকাল ধরে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অবহেলা করে আসছে। অধিকার বঞ্চিত করে আসছে। রাষ্ট্র নারীকে দেখছে অধ:স্তন হিসেবে, নারীকে ব্যবহার করছে তার ক্ষমতা সংহত করার উপায় হিসেবে, সমাজ তাকে দেখছে একজন মা হিসেবে। সুশীল সমাজের একটি শক্তি হিসেবে নারীকে দেখা হয়নি। নারীকে দেখা হয় উন্নয়নের ক্ষেত্র হিসেবে, পুণরুৎপাদনমূলক যন্ত্র হিসেবে যেখানে জন্মনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে নারীকেই ওতপ্রোতভাবে জড়িত করা হয়।[*১] এভাবে দেখা যায় যে, নারী ব্যবহৃত হচ্ছে, ব্যবহারে সক্ষম হয়ে উঠছে না। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, পরিকল্পনার আলোকে বিষয়টি দেখতে গেলে দেখা যায় যে, সমাজ হঠাৎ করে বদলায়না, বছরেও বদলায়না, দশকেওনা, যদি না সমাজের অবকাঠামোতে পরিবর্তন আসে। সত্তর দশক যখন একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটালো-সে সময়েও কোন নতুন সমাজ গড়ে উঠেনি। নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজের জন্ম দেয়নি। এমনকি পুরাতন সমাজকেও ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেনি, সমাজ নড়েবড়ে হয়েছে কিন্তু ভেঙ্গে পড়েনি। এর প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে মানুষে মানুষে বৈষম্য, নারী-পুরুষে বৈষম্য।[*২] আরো বলা হয়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতায় বলা যায় যে, আগে দেশ তারপর মানুষ, তারপর নারী। অর্থাৎ উপর থেকে নীচে।[*৩] বাংলাদেশে উন্নয়নের জন্য যে কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তাতে নারীকে সতন্ত্র টার্গেট গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা হয়নি বা করার উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে বৈষম্য কমেছে হয়তো কিন্তু রোধ হয়নি। এই সুদীর্ঘকাল পর্বে নারীর চাহিদা ও স্বার্থের অনুকূল কোন তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন চোখে পড়েনি। উন্নয়ন পরিকল্পনায় একটি ব্যাপক ও সমন্বিত নারী উন্নয়ন নীতিমালার অভাবে এবং বিভিন্ন সেক্টরে অপর্যাপ্ত সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দরুণ কোন বাস্তব অগ্রগতিই সাধিত হয়নি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে সামষ্টিক অর্থনীতি নীতিমালার পরিবর্তনের সঙ্গে নারী উন্নয়ন নীতিমালাও পরিবর্তিত হয়েছে। আধুনিকায়ন, মৌলিক চাহিদা, কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস কর্মসূচী, বিশ্ব বানিজ্য সংস্থা, বিশ্ব ব্যাংক / আই.এম.এফ., জাতিসংঘ, দাতাগোষ্ঠী ইত্যাদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক দাতা ও ঋণদান সংস্থা নারী উন্নয়ন নীতিমালাকে প্রভাবিত করেছে।[*৪] উন্নয়নশীল বিশ্বে আধুনিকায়ন তত্ত্বসহ বিভিন্ন সামষ্টিক অর্থনৈতিক তত্ত্বের (Macro Economic Theory) ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ ছয় দশক (নারী উন্নয়ন দশক) উপলব্ধি করে যে, প্রবৃদ্ধি যদি অসাম্য, বৈষম্য, দারিদ্র, বেকারত্বের জন্ম দেয় তবে উন্নয়নের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। তবে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পদের পুনর্বন্টন, বিশ্ব দারিদ্রকে মোকাবেলা করা, আই.এম.ও.-এর কর্ম সংস্থান, প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদাপূরণ এসব নতুন ধারণা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উদ্দেশ্যের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালায়। উন্নয়নের তত্ত্বের এই নয়া মাত্রা নারীর প্রতিও দৃষ্টি ফেরায়।

পরিকল্পনায় নারী-পুরুষের সমতা স্থাপনে নারীর মৌলিক অধিকার ও দীর্ঘমেয়াদী সুষম উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সামাজিক ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়ন নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব এবং এই ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক দিক যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পরিকল্পনায় নারীর অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত পাঁচটি পরিকল্পনায় নারীর বিষয় বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রাথমিকভাবে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুনর্বাসন, প্রশিক্ষণ, দুঃস্থসেবা প্রভৃতির মধ্যে সীমিত থেকে পরবর্তীতে নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনার জন্য বৈষম্যকে চিহ্নিত করে তা' দূরীকরণে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে যা থেকে নারীর অধ:স্তন অবস্থার মুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও মানুষ হিসেবে তার সক্ষমতা গঠন ও পছন্দের ব্যবহারকে নিশ্চিত করে না এবং ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণেও নারীর অংশগ্রহণকে অনুপ্রানীত করে না। পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনয়নের প্রেক্ষাপটে গৃহীত কর্মসূচীসমূহের বিশ্লেষণ এ গবেষণায় আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে উন্নয়নের পরিমন্ডলে দারিদ্র দূরীকরণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণের দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়ায় নারীরা যে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চালিকা শক্তি এবং অবহেলিত উপকারভোগী - এই উভয় সত্য সামনে চলে আসে। ফলতঃ উন্নয়নের পরিকল্পনাবিদদের কাছে কেবল মা ও গৃহবধু হয়ে থাকার দশা থেকে নারীরা উন্নীত হয় উৎপাদক এবং পরিসেবা প্রদানকারীর অবস্থানে।[৫] গত অর্ধ শতাব্দী ধরে উন্নয়নকে নানাভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ধারা বেরিয়ে এসেছে। জনকেন্দ্রীক উন্নয়ন, মৌলিক চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন, মানবিক উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি ধারণা বিকশিত হয়েছে। যার মূল কথা উন্নয়নকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে না দেখে তা' মানুষের চোখে দেখা, মানুষের মাঝে দেখা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তি ও শিল্পায়নের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থা, প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ, বাজার ব্যবস্থার বিপরীতে দু'টি প্রধান বিষয়ের মোকাবেলা করা হচ্ছে। প্রথমতঃ, উন্নয়নের সুফল যা সম্পদ, সুযোগ এবয় সুবিধা দরিদ্রদের মাঝে পৌঁছে দেয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য মানব সক্ষমতা বাড়ানো।[৬]

যে মানুষের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই মানুষের কল্যাণ, মৌলিক চাহিদাপূরণ প্রভৃতিকে পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। নারী সেই মানুষের অন্তর্ভূক্ত, আলাদা কোন জাতিগোষ্ঠী নয়। তাকে পৃথক করে টার্গেট না করে তাকে কেন্দ্রীক অবস্থানে নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কেননা, অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করে অগ্রগতি সম্ভব নয় । যদি উন্নয়নের অর্থ হয় মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধার বিস্তৃতি, তবে নারীরা জীবনের এইসব সুযোগের বাইরে পরে থাকলে উন্নয়ন প্রক্রিয়াই অর্থহীন হয়ে পড়বে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য ঃ

পূর্বে উন্নয়নকে পরিমাপ করা হতো সে দেশের উৎপাদনে সামর্থ, জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয়ের প্রবৃদ্ধির নিরীখে। বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হচ্ছে জনগণের নিজেদের ভিতর এবং জাতি-রাষ্ট্রের মাঝে সমান সুযোগ-সুবিধা দিয়ে উন্নয়ন ধারায় 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' ধারণাকে প্রাধাণ্য দেয়া, যেখানে-

১। মানুষের সক্ষমতা গঠন এবং

Dhaka University Institutional Repository

২। সেই সক্ষমতার ব্যবহার - এই দু'টো দিক ধরা হবে।[৭] অর্থাৎ উন্নয়ন স্বাস্থ্য, জ্ঞান, ক্ষমতার পাশাপাশি বিশ্রাম, উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড অথবা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয়তা তৈরীর ফলে একটি দীর্ঘ, সুস্থ্য, সৃষ্টিশীল ও অর্থবহ জীবন উপভোগের জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা - যা আপনা-আপনি হয়ে উঠে না। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নিয়সনে যথাযথ নীতিমালার সচেতন বাস্তবায়ন। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উন্নয়নের নীতিমালায় মানব সম্পদ হিসেবে নারী উন্নয়নের লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের গুরুত্ব বহন করে।

স্বাধীনতার তিন দশকে বাংলাদেশে আজও গড় আয়ুস্কাল, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষা, সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে অব্যহত বৈষম্য বিদ্যমান। নানা ধরণের সূচক / নির্দেশক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান অনেক নীচে। প্রচলিত সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, নারীর শিক্ষার সুযোগ, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ সীমিত করে তোলে। যদিও বর্তমানে নারীকে মূলধারায় আনয়নে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, আয় বন্টন, অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারীকে প্রাধান্য দেয়া শুরু হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে,

১। পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীসমূহ নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনয়নে যথেষ্ট কিনা,

২। মানব সম্পদ হিসেবে নারীর মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা,

৩। অধিকার নিশ্চিত করার নীতিমালায় প্রণয়নের প্রেক্ষিতে অধিকার ভোগের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি পরিকল্পনার আলোকে খুঁজে বের করা।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যের নিরীখে বলা যেতে পারে যে, মানুষকে সমস্যা হিসাবে নয় বরং সম্পদ হিসেবে গণ্য করা এবং নারী সেই মানুষ এবং সম্পদের অন্তর্ভুক্ত বিবেচনা করে তার উন্নয়নকে নিশ্চিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করে সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে যে, বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ নারীর সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করেনি এবং পরিকল্পনায় নির্ণিত মানব সম্পদ উন্নয়নে নারীর অন্তর্ভূক্তি অতি সীমিত।

১.৩ গবেষণার পরিধি ও যৌক্তিকতাঃ

নারী দেশের অর্ধেক মানব সম্পদ। সংযথা, রাষ্ট্র ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে নারী নানাভাবে আলোচিত হচ্ছে। এর কারণ - এখনো নারী অর্ধেক মানব সম্পদ হওয়া সত্ত্বেও মানব জীবনের প্রতিটি স্তর থেকে তারা নিগৃহীত, বঞ্চিত, শোষিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের সূচক নির্দেশক থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের তুলনায় নারীর অবস্থান অধ:স্তন। নারীর

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষরতার হার ৩৮.১০ ভাগ, যা পুরুষের স্বাক্ষরতার হারের (৫৫.৬০) তুলনায় অনেক কম। তাদের গড় আয়ুষ্কাল ৫৭.৬ বছর আর পুরুষের হচ্ছে ৫৮.১০ বছর। নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং আন্তর্জাতিক পরিসরে তার ক্ষমতায়ন, নারীর মানুষ হিসেবে দক্ষতা অর্জন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা গভীর এবং ব্যাপক। গবেষণার বিষয়বস্তুতে নারীকে একজন দক্ষ মানুষ হিসেবে তার অধিকার, কর্তব্য ভোগের পরিবেশ তৈরীর পরিকল্পিত নীতিমালার বিশ্লেষণ করা এবং যে সমস্ত নীতিমালা এ যাবৎ প্রনীত হয়েছে তার যথার্থতা বর্তমান নারীর অবস্থানের প্রেক্ষাপটে ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ও একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে আলোচনার মধ্যে সীমিত রাখা হয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা হিসেবে দেখানো যেতে পারে যে,

১। বাংলাদেশের প্রশাসন যন্ত্রের সর্বোচ্চ পর্যায় হতে সর্বনিম্ন পযন্ত নারীদের কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে গৃহস্থালির ক্রিয়াকর্মে, গ্রামীন কৃষি অর্থনীতিতে, উৎপাদনশীলতায় নারীর ভূমিকা যথাযথ মূল্যায়নের গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

২। নারীর সমস্যা তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইনগত পরিবেশগত অর্থাৎ সার্বিক অস্তিত্বে পশ্চাৎপদ অবস্থান এবং এসব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্যের নিয়সন ঘটানো, নারীর স্বকীয় ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া ও সিদ্ধান্তগ্রহণ নারী সক্রিয় অংশগ্রহণে পরিকল্পিত কর্মসূচী বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে।

৩। মানব সম্পদ উন্নয়নের নিরীখে নারীকে মানব সম্পদ বিবেচনায় সক্ষমতা গঠন ও তার ব্যবহারের সুযোগের প্রেক্ষিতে যাচাই এর প্রয়োজন রয়েছে।

১.৪ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

প্রতিটি গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যকে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিশ্লেষণ করেত হয় এবং তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে পদ্ধতি নির্ভর হতে হয়। এদিকব থেকে বর্তমান গবেষণা কর্মটি 'সিষ্টেম তত্ত্ব'-র অন্তর্ভূক্ত।

'সিষ্টেম তত্ত্ব'-র ধারণা অনুযায়ী 'সিষ্টেম' বা ব্যবস্থা হলো পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ কতকগুলি উপাদান বা অংশের সমন্বয়।[৮] এবং এই সকল অংশ পরস্পর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার অর্থ হলো, যে সকল অংশ বা উপাদান নিয়ে ব্যবস্থা গঠিত তার মধ্যে কোন একটি অংশের পরিবর্তন সূচীত হলে অন্যান্য উপাদানের উপর এবং সমগ্রিকভাবে ব্যবস্থার উপর তার প্রভাব পড়ে।[৯] প্রত্যেক সিস্টেম হচ্ছে এক ধরণের যোগাযোগ বা সমাযোজন ব্যবস্থা যার ফলে খবরের আদান-প্রদান গয় ও চূড়ান্ত পর্যায়ে সিস্টেমটি স্বনিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে।[১০]

সিস্টেম তত্ত্বের উক্ত ধারণা অনুসারে গবেষণা কর্মের মূল শিরোনাম "বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত নারী" – বিষয়টির সংযোগ স্থাপন

Dhaka University Institutional Repository

ফয়লে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে ধরে নিলে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' একটি ক্ষুদ্রতর সিস্টেম বা উপ-সিস্টেম এবং নারী তার একটি অংশ। কেননা, আমরা জানি যে, বৃহৎ সিস্টেমের মধ্যে ক্ষুদ্রতর সিস্টেম বা উপ-সিস্টেম থাকতে পারে। উল্লেখ করা আছে যে, 'ব্যবস্থা'-র একটি অংশের পরিবর্তনে অন্যান্য অংশ তথা সমগ্রভাবে ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোন থেকে প্রচলিত তথাকথিত নারীর ভূমিকার পরিবর্তন ঘটলে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে। নারীকে ব্যবস্থার একটি অংশ হিসেবে গণনা কের তার বর্তমান পশ্চাতপদ অবস্থার মূল্যায়নপূর্বক ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তন শুধুমাত্র নারী ক্ষেত্রেই হবে না বরং সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ণ ঘটবে।

'সিষ্টেম' তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক সিস্টেমের থাকে কিছু ইনপুট (Input) ও আউটপুট (Output)। ইনপুট সিস্টেমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ও সিস্টেমকে প্রভাবিত করে। আউটপুট সিস্টেম থেকে বাহির হয় ও পরিবেশকে প্রভাবিত করে।[১১] সারণী ১.১ এর মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো।

সারণী - ১.১ ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থার মডেল

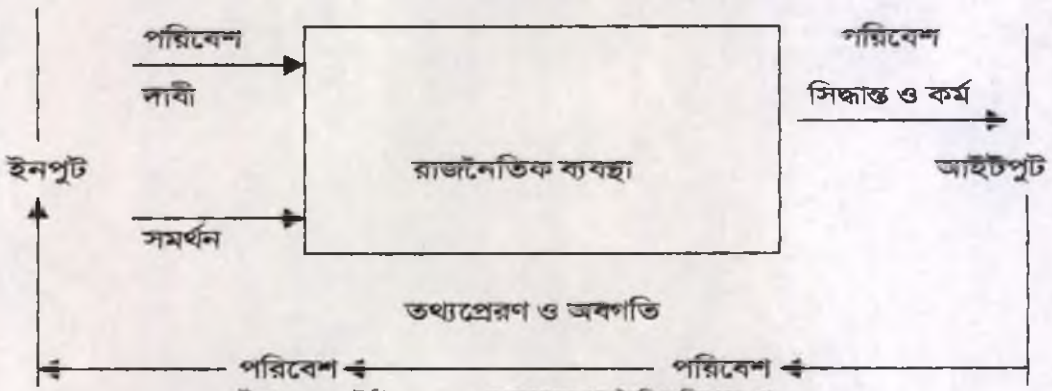

উৎস ঃ এমাজ উদ্দীন আহমেদ, তুলনামূলক রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, পৃ: ১৩৭.

প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় (Political System) সিদ্ধান্ত ও তা কার্যকর করার জন্য পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কেননা পরিবেশ থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সমাজের প্রয়োজন সম্পর্কে ইনপুটের আকারে অবহিত হতে পারে। তথ্যগ্রহণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আউটপুট আকারে সমাজকে প্রভাবিত করে এবং এই সিদ্ধান্ত ও কার্যকলাপের ফলাফল পুনরায় ইনপুট আকারে সিষ্টেমকে অবহিত করে। এভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা কোন সংকট সৃষ্টি হলে তা দূর করতে, সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে অবহিত হতে এবং তথ্য গ্রহণের মাধ্যমে সমর্থনের মাত্রা ও ধারা সম্পর্কে সচেতন হয় ও প্রয়োজনবোধে নতুন কাঠামো সৃষ্টি করে সমর্থনের পরিমান বৃদ্ধি করে। এই ধারণা অনুযায়ী 'পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন'-কে একটি ব্যবস্থা হিসেবে পরিগণিত করে নারীকে তার অংশ হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে এর উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু দাবী - সমর্থন যা ইনপুট হিসেবে ব্যবস্থায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করাণো গেলে তা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করবে এবং ব্যবস্থা দ্বারা তা

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধান্ত কর্মে রূপলাভ করে আউটপুট হিসেবে পরিবেশকে প্রভাবিত করবে এবং সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে।

১.৫ গবেষণা কার্যক্রমে ব্যবহৃত তথ্যের উৎস

'বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রেক্ষিত নারী' বিষয়টি গবেষণা পরিচালনায় দু'টো উৎসের ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন -

প্রাথমিক উৎস হিসেবে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য বাংলাদেশের ৫টি পঞ্চবার্ষিক ও ১টি দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনকে গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় উৎস হিসেবে পরিকল্পনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বিশ্লেষণ, মতামত পর্যালোচনা জন্য দ্বিতীয় পুস্তক ও সাহিত্যপত্রের সহায়তা নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন তথ্য, প্রতিবেদন, পুস্তিকা, পত্রিকা প্রভৃতির জন্য যেসকল গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি তা'নিম্নরূপ :

ব্যবহৃত গ্রন্থাগারসমূহ ঃ-

১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার,

২। বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ গ্রন্থাগার,

৩। বেগম সুফিয়া কামাল গ্রন্থাগার,

৪। উন্নয়ন পদক্ষেপ গ্রন্থাগার,

৫। ব্রাক গ্রন্থাগার,

৬। বাংলাদেশ গণউন্নয়ন গ্রন্থাগার,

৭। Bangladesh Institute of Development Studies Library (BIDS),

৮। Women for Women Library,

৯। Banbies Library.

Dhaka University Institutional Repository

সংশ্লিষ্ট সাহিত্যের পর্যালোচনা

"বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন : প্রেক্ষিত নারী" বিষয়ের গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা, মানব সমপদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপট এবং পরিকল্পনা ও নারী বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন লেখকের বই-এর সহায়তা নেয়া হয়েছে, নিম্নে ধারাবাহিকভাবে তা উল্লেখ করা হলো -

উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যবহৃত বই -

Nurul Islam, Development Planning in Bangladesh : A Study in Political Economy (1979) গ্রন্থে বাংলাদেশের পরিকল্পনার সামাজিক, রাজনৈতিক মতাদর্শ ভিত্তিক নির্ভরতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। উন্নয়ন পরিকল্পনায় রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ, নেতৃত্ব, আদর্শ মুখ্য ভূমিকা পালন করে বলে মত দেন। এছাড়া তিনি পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনার কাজের পদ্ধতি, এর সমস্যা, সরকারী পর্যায়ে যোগাযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিকল্পনা বিভাগ যেভাবে কাজ করে আসছে সে বিষয়ের আলোচনা করেন। শুধু কাঠামোগত বিশ্লেষণই নয় বরং সমাজ রাজনীতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। বইটি মূলত: ১৯৭২-৭৫ সময়কালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও নীতিমালার যৌক্তিকতা ও বিশ্লেষণাত্মকধর্মী।

কাজী খলীলুজ্জামান আহমেদ, "বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ - পথের সন্ধানে", (১৯৮৩) বইটিতে সমাজ বিকাশের পথে মূল সমস্যা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের বিবর্তনের ধারা আলোচনা করেন এবং সমাধানহিসেবে ভূমি সংস্কার ও গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখীকরণকে পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিক, দ্বি-বার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপর আলোচনার মাধ্যমে এদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপ ও ধারা এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতে তার অসারতার বিবরণ দিয়েছেন। এছাড়াও ব্যাপক জনগণের সক্রিয় ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর্থ-সামাজিক বিকাশের পূর্বশর্ত, এই ঐাবনায় উদ্যোগী হয়ে এর জন্য গায়িপাশ্বিকতা সৃষ্টি ও তাদের নিজেদের প্রস্তুতি, সচেতনীকরণ ও রাজনৈতিকায়নের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে যা আলোচিত গবেষণা কর্মের বিষয় যা উন্নয়ণ পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের অংশ নারী উন্নয়নকে প্রভাবিত করেছে। নারী উন্নয়ন ঘটাতে চাইলে অনুন্নয়নের মূল বিষয়কে চিহ্নিত করতে হবে।

সৈয়দ আবদুস সামাদ, "পরিকল্পনা"-য় (১৯৯০) লেখক মূলতঃ পরিকল্পনার মৌলিক দিকসমূহ বইটিতে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি তার রচনায় ধারাবাহিকভাবে পরিকল্পনা, উন্নয়নশীল দেশের পটভূমিতে পরিকল্পনা, পরিকল্পনা দলিল, প্রযুক্তি বাছাই, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন - বাস্তবায়নের সমস্যাবলী এবং সমাধানের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করেন। এছাড়াও তিনি পরিকল্পনায় নতুন সমকালীন পরিপ্রেক্ষিত ও বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেছেন, যেখানে বাংলাদেশের পরিকল্পনার ইতিহাস, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে এবং যা আমার গবেষণায় দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আলোচনায় তথ্য সংগ্রহে সহায়ক হয়েছে।

মো: আনিসুর রহমান, "উন্নয়ন জিজ্ঞাসা", (নভেম্বর ১৯৯২) একটি সংকলন গ্রন্থ যেখানে লেখক বিকল্প চিন্তায় সমাবেশ ঘটিয়েছেন। লেখক পরিকল্পনা কমিশনে থাকাকালীন সময়ে পরিকল্পনা ব্যর্থতা বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ব্যাখ্যা করেন এবং সেই সাথে আত্মনির্ভরশীল প্রশ্নে নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। তার যে রচনা আমার গবেষণা কর্মে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে সেটি হলো জনগণের আত্ম-উন্নয়ন প্রসঙ্গ যা মানুষের গভীরতম স্পৃহা, মানবিক মর্যাদার অধিকার, অর্থনৈতিক আত্ম উন্নয়ন প্রভৃতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে মত ব্যক্ত করেন।

ড: সেলিম জাহান, "অর্থনীতির কড়চা", (১৯৯৬) গ্রন্থে উন্নয়নকে মানুষের উন্নয়ন, মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষের দ্বারা উন্নয়ন বলে অভিহিত করেণ। মানব উন্নয়ন একটি সামগ্রিক ধারণা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেণ যে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি থেকে শুরু করে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুফল সমাজের প্রতিটি মানুষ যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক স্বীকৃতি, সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা থাকবে যেখানে মানুষ সিদ্ধান্ত বাচাই করার সুযোগ ও সামর্থ অর্জন করবে। আলোচিত বিষয়গুলো উক্ত গাবষণা কর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করতে সহায়ক হয়েছে। উন্নয়নকে জনকেন্দ্রিক শুধু নয় উন্নয়নের সুফল ভোগ করতেওদক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং জনগণকে দক্ষ করে গড়ে তোলাও উন্নয়নেরই অংশ।

এম খোরশেদ আলম, "বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা - প্রাসঙ্গিকত্ব, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি" (১৯৯৭) বইটিতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। যেখানে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভূমিকা ও মাত্রা অনুসন্ধানসহ পরিকল্পনার উন্নয়ন ও পতন, বাজার অর্থনীতিতে পরিকল্পনান প্রাসঙ্গিকতা বিষয়ে বাজার ব্যর্থতার সংশোধন, সরকারী পণ্যের উৎপাদন ও বন্টন, সরকারী খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা, সম্পদের দক্ষ বরাদ্ধ বিষয়ে ব্যাপক মতামত রেখেছেন এবং এছাড়াও বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনার যে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে যে অলোচনা করেছেন যেখানে তিনি এর সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি প্রেক্ষিত পরিকল্পনার গুরুত্ব, টেকসই উন্নয়নে পরিবেশের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন।

সৈয়দ শওকতুজ্জামান, "উন্নয়ন ও পরিকল্পনা", (নভেম্বর ১৯৯৭) গ্রন্থের সামগ্রিক আলোচনাকে প্রধানতঃ দু'খন্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খন্ডে, উন্নয়ন তত্ত্ব - মতামত ও

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গী উন্নয়নে অর্থসংস্থান এবং দ্বিতীয় খন্ডে, উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারণা ও প্রকারভেদ, প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বাস্তবায়ন ব্যবস্থা ও স্বল্পোন্নত দেশের অভিজ্ঞতার একটি ব্যাপক অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা রয়েছে যা আমার দ্বিতঅয় অধ্যায় বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আলোচনায় সহায়ক হয়েছে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিকল্পনা পদ্ধতির গুরুত্ব বিবেচনায় বইটি উল্ল্যেখযোগ্য।

মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যবহৃত বই

অমর্ত্য সেন, ''জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি'', (১৯৯০) বইটিতে লেখক উন্নয়ণ প্রসঙ্গে মানুষের জীবন যাত্রার মান এবং এর সাথে সংযুক্ত স্বত্বাধিকার, সক্ষমতা গঠন প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করেণ। মানুষ নিছক অর্থনৈতিক মানুষ নয়। তার ইচ্ছা বা কামনা ব্যক্তিগত সুখে সীমাবদ্ধ না থেকে মানব কল্যাণের সাথে জড়িত থাকতে পারে, যেখানে সে তার তৃপ্তি খুঁজে পায় এবং জীবন যাত্রার মানের গুরুত্ব জীবন যাপনের মধ্যে, পণ্যের আচরণে নয় এবং এই জীবনযাত্রার মানের মূল্য বিভিন্ন ধরণের জীবনধারণের সক্ষমতা দিয়ে নির্দিষ্ট। এভাবে তিনি মানুষের উন্নয়ন প্রসঙ্গে জীবনযাত্রা, সক্ষমতা গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে আলোচনা করেন যা আমার আলোচ্য বিষয় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে পরিস্কার ধারণা লাভ করতে বইটি সহায়ক হয়েছে।

R. Jayagopal, "Human Resource Development : Conceptual, Analysis and Strategies" (1990) বইটিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া তিনি মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ প্রভৃতির উন্নয়ন মানব উন্নয়নের পূর্বশর্তরূপে ব্যাখ্যা করেন। তার মতে, সত্যিকারের মানব উন্নয়ন হবে না যদি না উক্ত বিষয়ের উন্নয়ন ঘটে এবং এটি শুধুমাত্র উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ বাহক নয় বরং এসবের উন্নয়ন জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার। এভাবে তিনি মানব সম্পদ উন্নয়নকে মূল বিষয় হিসেবে ধরে অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন যা আমার সমগ্র গবেষনঅ কর্মে সহায়ক হয়েছে।

Q. K. Ahmed, "Development and Democracy", (1995) গ্রন্থে বাংলাদেশর সমাজ - রাজনীতি - অর্থনীতি বিষয়ের আলোচনা করেন যেখানে তার মূল আলোচ্য বিষয় হিসেবে থেকেছে 'জনগণ-ই প্রথম' ()এ প্রেক্ষাপটে জনগণকে প্রধান হিসেবে ধরে তার সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ের আলোচনা করেন এবং বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের জন্য নীতি ও কৌশলের আলোচনায় প্রধমতঃ অর্থনৈতিক বৃদ্ধির নিম্নগতি, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, খাদ্যের অনিশ্চয়তা প্রভৃতি সমস্যা চিহ্নিত করণের মধ্য দিয়ে সমাধানের পথ আলোচনা করেন এবং সবশেষে সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টির পাশাপাশি জনগণের জীবনমান উন্নয়নের সুপারিশ আলোচনা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

T. V. Rao, "Human Resource Development – Experiences, interventions, strategies", (1995) লেখক মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক ধারনা থেকে বর্তমান সময়ে বিবর্তীত ধারণা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। মানব সম্পদ উন্নয়নের সঙ্গে তিনি মানব উন্নয়ন, উন্নয়নের লক্ষ্য, মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার বিশদভাবে প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে - মানব সম্পদ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেন, যেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নে, মানব সম্পদ উন্নয়নের পরিমাপ, যেমন - স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, আত্ম-কর্মসংস্থান, উৎপাদন, প্রযুক্তির ব্যবহার প্রভৃতি। উক্ত গ্রন্থের মূল যে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়, তা'হলো মানুষ যেহেতু পরিবেশ বা ঘটনা তৈরী করে, যেহেতু সে পরিস্থিতি তৈরী করে ঘটনা/পরিবেশ গঠনে। মানব সম্পদ উন্নয়ন এমন একটি প্রক্রিয়া যা মানুষকে ঘটনা/পরিবেশ সৃষ্টিতে সামর্থ করে তোলে। সামর্থ হতে পারে, জ্ঞান, দক্ষতা, আচরণ, মূল্যবোধ নির্ভর। আবার অন্যদিকে হতে পারে কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন পেশা যথা - চিকিৎসা, আইন, প্রকৌশল, শিক্ষা প্রভৃতি। এই সব সামর্থের অধিক উন্নয়ন যা মানুষকে সামর্থশীল করে তোলে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য। সুতরাং এসব সামর্থের সাথে মানুষের অধিক সংযোগ ঘটাতে পারলে ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠী তথা জাতি লাভবান হতে পারে। সেসব বিষয়ের উন্নয়ন এবং পদ্ধতি/পরিসংখ্যানগত আলোচনা করেছেন উক্ত গ্রন্থে।

Parminder Kaur, " Human Resource Development for Rural Development ",(1996) বইটিতে মানব সম্পদ উন্নয়ণকে মূল বিষয় হিসেবে ধরে শিক্ষ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আলোচনা করেন, যেখানে উন্নয়নকে পৃথকভাবে যেমন - শিক্ষার মান, স্বাস্থ্য সেবা, অর্থনৈতিক কাঠামো, জীবনমান, প্রভৃতিকে চিহ্নিত করাই শুধু প্রয়োজন নয় বরং সামগ্রিকভাবে উন্নয়নকে বিচার করতে হবে যেখানে মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও সামর্থকে বিবেচনা করা যাবে। এভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে গ্রামীন জীবন যাত্রার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। মূলতঃ মানুষের জীবনযাত্রার পরিবর্তনে মানব সম্পদের উন্নয়ন প্রয়োজন।

নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত ব্যবহৃত বই

Ronaq Jahan and Hanna Papanek সম্পাদিত **"Women and Developmet : Perspectives from South and Southest Asia" (1979)** গ্রন্থটি মূলত: ঢাকায় অনুষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সেমিনারে পঠিত বক্তব্যের সমাহার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারীর উন্নয়নে অংশগ্রহণ ও দক্ষতা আনয়নে নীতি প্রণয়নের সুপারিশসহ এবং দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপটে নারী বিষয়ক উন্নয়ণ কৌশল, নীতি নির্ধারণ, নারীর কাজ, নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাসহ উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ ও সমতা আনয়নে সীমাবদ্ধতা ও সমাধান বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম, "নারী : রাষ্ট্র, উন্নয়ন মতাদর্শ" (১৯৯০) গ্রন্থের মূল সূত্র হলো - উন্নয়ন নীতি, রাষ্ট্রযন্ত্র ও মতাদর্শের মাধ্যমে নারী কিভাবে অধ:স্তন হচ্ছে এবং এই অধ:স্তনতার প্রতিবাদ করেছে। রাষ্ট্রীয় নীতি ও সামাজ পরিসরে কাজে করে মতাদর্শ যা পিতৃতান্ত্রিক কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আবার এই মতাদর্শিক রাষ্ট্রীয় নীতির প্রভাব পড়ছে উন্নয়ন নীতিতে। এভাবে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি - উন্নয়ন নীতিতে নারী সমাজ, মতাদর্শের ক্ষেত্রে নারীর অধ:স্তনতা, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা উক্ত গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, "নারী ও রাজনীতি", (১৯৯৪) একটি সংকলন গ্রন্থ। উক্ত সংকলনে রাজনীতি, উন্নয়ন ও নারী বিষয়ের আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেখানে নারীকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি থেকে যে বৈষম্য তার নিরোসনেও সমতা আনয়নে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে মনে করা হয়। কারণ, নারীর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা, প্রয়োজন-তাগিদ রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিফলিত হলে নারী নিজেই নিজের রূপকার হতে পারবে। এই উদ্দেশ্যে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বিষয় সম্পর্কিত মতামত, মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমাবেশ ঘটানো হয়েছে উক্ত সংকলনে।

খাদিজা খাতুন, "নারী ও উন্নয়ন ঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান",(১৯৯৫) বাংলাদেশের সমাজে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈসম্যের কিছু পরিসংখ্যান উক্ত প্রকাশনায় স্থান পায় যা সমাজে নারীর ক্ষমতাহীনতা এবং পশ্চাৎপদতার উৎস সম্পর্কে ধারনা দেয়। সমগ্র পুস্তিকায় সাতটি অধ্যায়ে নারী সংক্রান্ত জনমিতি, শিক্ষা, শ্রম ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, রাজনীতি ও ক্ষমতায়ন, নারীর আইনগত অধিকার, নারী ও উন্নয়নে বেসরকারী সংগঠন ইত্যাদি তথ্য সংকলিত হয়েছে।

Shamim Hamid, Why Women Count : Essays on women in Development in Bangladesh (1996) বইটিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নের ধারা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেখানে, সামাজিক খাতে নারী ভূমিকার মূল্যায়ন ছাড়াও নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা, নারীর দারিদ্রতা, রাজনীতি, নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া গণমাধ্যম ওমুক্তবাজার অর্থনীতিতে নারীর প্রভাব বিষয়ের আলোচনা এবং এ প্রেক্ষাপটে নারী উন্নয়নে রাষ্ট্র ও বেসরকারী পর্যায়ে ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

তাহমিনা আখতার, "মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা - বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট"(১৯৯৫), বইটিতে নারীর অধিকার একটি মানবাধিকার বিষয় হিসেবে বিবেচিত করে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথ সুপারিশ করে আলোচনা করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা উল্লেখ করে বৈষম্য নিরোধে প্রচলিত আইন, সাংবিধানিক নীতিমালার আলোচনা ও বাস্তবায়নে সফলতা ও সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে।

আলতাফ পারভেজ, "বাংলাদেশের নারী - একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ" (২০০০) একটি সংকলন গ্রন্থ, যেখানে নারীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সাংবাদিকতার ফল এবং একটি তথ্যনির্ভর প্রকাশনা। বইটিতে নারীর শিক্ষা, আইন, শিল্প, উন্নয়ন, নির্যাতন, কর্ম, রাজনীতি, প্রশাসন প্রভৃতিতে তুলনামূলক তথ্য ও তার আলোচনা করা হয়েছে।

অথ্যসূত্র ঃ

*১ মেঘনা গুহঠাকুরতা : 'বাংলাদেশের নারী নির্যাতন : রাষ্ট্রের ভূমিকা' মোহাম্মদ উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর এবং জারিনা রহমান খান (সম্পাদিত), সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র-'৯৩, পৃ: ৭/৮.

*২ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঃ বাংলাদেশের সমাজ: আশির দশকের নিরীখে, সমাজ নিরীক্ষা ১৫, পৃ: ৪৬.

*৩ ফ.র. মাহমুদ হাসান ঃ উন্নয়ন বিকল্প দৃষ্টিকোণ / মতাদর্শ, সমাজ নিরীক্ষা ৪২, পৃ: ৬৪.

*৪ শাহীন রহমান, 'নারীর উন্নয়ন নীতিমালা : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত', উন্নয়ন পদক্ষেপ-১৪ সংখ্যা, পৃ: ৫৩.

*৫ শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত পৃ: ৫৩.

*৬ T. V. Rao, "Human Resource Development – Experience Interventions Strategies" SAGE Pub. New Delhi, P-23.

*৭ আজাদুর রহমান চন্দন, 'পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৪ সংখ্যা, পৃ: ৭.

*৮ নির্মলকান্তি ঘোষ "আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা", ছায়া প্রকাশনী, কলকাতা, পৃ:- ১০৩.

*৯ প্রাগুক্ত।

*১০ আহমেদ, এমাজ উদ্দীন, "তুলনামূলক রাজনীতিঃরাজনৈতিক বিশ্লেষণ", বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন লিঃ, পৃ:- ১৩৬.

*১১ প্রাগুক্ত, পৃ:- ১৩৬.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

২.১ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ

২.২ বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট

২.৩ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশ

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা

কয়েক শতাব্দী ধরে এক নাগারে বিদেশী শাসন ও শোষণ ভোগ করে, অত্যন্ত জটিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পন্ন স্বল্পোন্নত একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিকল্পকদের সামনে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।*১ বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কাঠামো রয়েছে। বাংলাদেশেও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ও প্রশাসনিক কাঠামো বিদ্যমান, যা একদিনে এই কাঠামো গড়ে ওঠেনি। পঞ্চাশের দশক থেকেই বাংলাদেশ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে পরিচিত। তবে উন্নয়ন ভাবনায় পরিকল্পনার বিষয়টি আরো পুরাণো।

২.১ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ ঃ-

প্রথম উৎস ঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা

১৯১৭ সালে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত সে দেশে "War Communism" বা 'যুদ্ধ সাম্যবাদ', 'New Economic Policy' বা 'নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা' ইত্যাদি পরীক্ষামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা স্তর অতিক্রম করে ১৯২৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সর্বপ্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার নীল নকশা প্রস্তুত করা হয়। অতএব ১৯২৮ সাল থেকে প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত 'পরিকল্পনা' বা 'পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা'-র সূত্রপাত।*২ যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে ভৌত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পথ ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপ এবং বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ এবং চীন, উত্তর কোরীয়া, ভিয়েতনামসহ অনেক দেশেই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে সকল সম্পদ বন্টনের এক ব্যাপক প্রয়াস নেয়া হয়।*৩

দ্বিতীয় উৎস ঃ পাশ্চাত্যের সমষ্টিগত পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা ঃ

১৯৩০ এর দশকে বাজার অর্থনীতিতে সৃষ্ট মন্দা ও এর প্রেক্ষিতে কেইনসীয় মতবাদের উত্থান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে উপনিবেশিক ব্যবস্থার পতন ও সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নের আকাঙ্খা উন্নয়ন অর্থনীতিতে আর একটি ধারার জন্ম হয়। অর্থনীতির দ্রুত উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার আবশ্যকতা তৈরী হয়। কেইনসীয় অর্থনীতির উত্থান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা পরিকল্পনা প্রত্যয়টিকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করে। এ সময় যুক্তরাজ্যে অধিকাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ্যপণ্য ও বৈদেশিক বিনিময় রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো। এটি বিশ্বাস করা হয় যে, সরকারী হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পণ্যের বন্টন ব্যবস্থায় যে সাফল্য অর্জিত হয়েছিলো তা কেবলমাত্র বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরতার মাধ্যমে অর্জন সম্ভব ছিল না। এছাড়া যুদ্ধোত্তর ইউরোপের অর্থনৈতিক পুণর্গঠনে পরিকল্পনার ভূমিকার স্বীকৃতিলাভ এবং পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার সাফল্যও ছিল উল্লেখযোগ্য।*৪

এসব অভিজ্ঞতা এ উপলব্ধির জন্ম দেয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিকল্পনার একটি স্বীকৃত ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয় উৎস : রূপান্তর বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঃ

মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা - যা প্রচলিত অর্থে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা হ্রাস এবং সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ এক জনপ্রিয় প্রপঞ্চে পরিণত হয়েছে বা উন্নয়ন অর্থনীতিতে রূপান্তর বা মিশ্র অর্থনীতির নতুন সংযোজন । এটি সাধারণতঃ পথনির্দেশক পরিকল্পনাতে বিশ্বাসী। এ ধরণের পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা এবং পূর্বানুমান ভিত্তিক পরিকল্পনার মিশ্রণ।*৫ ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, দক্ষিণ কোরীয়া প্রভৃতি দেশ এই শ্রেণীভূক্ত।

পরিকল্পনার উত্থান ও পতনের কারণসমূহ ঃ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পনার অভিজ্ঞানের প্রাথমিক সাফল্য ছিল খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু সময়ের ব্যাপ্ত পরিসরে এটি উৎপাদন বিরোধী হিসেবে পরিদৃষ্ট হয়।*৬ বাস্তবে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার আওতায় ফার্মসমূহে মুনাফা ও পণ্যমান বৃদ্ধি, নতুন নতুন ভ্যারাইটি প্রবর্তন, গ্রাহক সেবা প্রদান ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব আরোপের বিষয়টি থাকে অবহেলিত। উদ্যম আর সৃষ্টিশীলতা হয় নিরুৎসাহিত। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ থেকে দূরে রাখা হয় এবং এমন এক নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তা পরিচালিত হয়, যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, সহজাত অদক্ষতার কারণে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা খুবই অস্থিতিশীল।

১৯৩০ এর মহামন্দা মোকাবেলা এবং যুদ্ধকালীন অথবা যুদ্ধ পরবর্তী অর্থনীতির পুণর্গঠনে সরকারের অগ্রগণ্য ভূমিকাই প্রধান ও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ ধারা ১৯৭০ এর দশকের সূচনা অবধি অবিতর্কিত ছিল। পরবর্তীতে, উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়ন পুরকল্পনার মিশ্র ফলাফল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগান ও গ্রেট বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের ক্ষমতারোহণ এবং তাদের নিজ দেশে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকাকে সংকুচিত করায় কর্মসূচী গ্রহণ, ১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং অবশেষে উক্ত

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থার পতন উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও নীতি নির্ধারকদের মাঝে বাজার ব্যবস্থা নির্ভর অর্থনীতি সম্পর্কে পূর্ণভাবনায় জন্ম দেয়।*৭ বর্তমানের রূপান্তর বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেই পূর্ণভাবনারই পরিনতি। যার কার্যক্রম হচ্ছে, কত দ্রুত বি-নিয়ন্ত্রণ করা যায়, বাজার মুখীনতার গতিকে কিভাবে দ্রুততর করা যায় এবং সরকারের অবয়ব ও ভূমিকাকে কিভাবে সংকুচিত করা যায়।

এখন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে উন্নয়ন ভাবনায় যে ক্রমবিবর্তন ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে, যথা - মানব সম্প উন্নয়ন, তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পদক্ষেপসমূহের ভূমিকা কিরূপ।

২.২ বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট ঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আইনগত বাধ্যবাধকতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেই বিবৃত রয়েছে। সংবিধানের ২য় ভাগের ১৫ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে উল্লেখিত আছে। ''রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবন যাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতি মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

(ক) অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের উপকরণের ব্যবস্থা।

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার।

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতা-পিতাহীন, বার্ধক্যজনিত কারণে অভাবগ্রস্থতার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।''*৮

সংবিধানে বর্ণিত পরিকল্পিত 'অর্থনৈতিক বিকাশ' এর অংশ হিসেবেই দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে গঠিত হয় 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন'।*৯

১৯৮৩ সালের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বর্তমানে এর গঠন কাঠামো হচ্ছে ঃ সরকার প্রধান চেয়ারম্যান, পরিকল্পনামন্ত্রী ভাইস চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান (পদে কেউ নিযুক্ত থাকলে), কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিব সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত।*১০

১৯৯২ সালে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের পর থেকে বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী। ভাইস চেয়ারম্যান দু'জন - পরিকল্পনামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী এবং সদস্য হচ্ছেন চারজন।*১১

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যুগপৎভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কার্যক্রমে, বিশেষ করে প্রকল্প পরিকল্পনার সাথে জড়িত। বহু ক্ষেত্রেই অবশ্য 'প্রকল্প পরিকল্পনা'র কাজের অনেকটাই বাস্তবায়ন সংস্থা এবং পরিদপ্তরগুলোর উপর বর্তায়। প্রায় সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থায় এজন্য পরিকল্পনা কোষ রয়েছে। পরিকল্পনা প্রক্রিয়া একটি চক্রাকার কতিপয় ধাপের সমষ্টি। পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও সংশোধিত পরিকল্পনা তৈরী এবং পরবর্তীকালে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আবার নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এরূপ চক্রাকারে আবর্তিত হয় পরিকল্পনা প্রক্রিয়া। তবে পরিকল্পনার ব্যাপকতা এবং প্রয়োগ ক্ষমতা নির্ভর করে সেই দেশটির উন্নয়নের পর্যায়, পরিকল্পনা, অভিজ্ঞতা এবং পরিকল্পনা সংক্রান্ত প্রযুক্তি জ্ঞান দেশটি কতোটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তার উপর।*[১২] সারণী-২.১ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাংগঠনিক কাঠামো দেখানো হলো:

সারণী - ২.১ঃ বাংলাদেশে পরিকল্পনার সাংগঠনিক কাঠামো

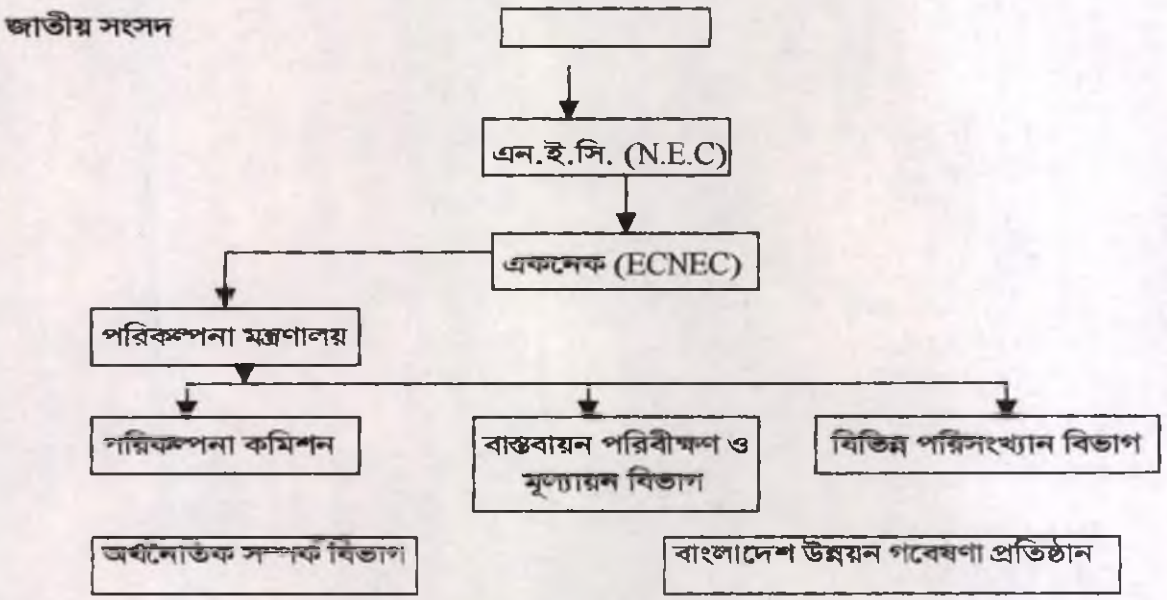

উৎস : মজিদ, এম. এ.;প্রকল্প ব্যবস্থাপনা; প্রাগুক্ত; পৃ:- ১৭৩

বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের দায়িত্বে সাংগঠনিকভাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের। এর অধীনে ৩টি প্রতিষ্ঠান - যথাক্রমে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং পরিসংখ্যান বিভাগ যথাক্রমে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন এবং পরিসংখ্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।*[১৩]

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে পরিকল্পনা কমিশন ছাড়াও দু'টি শক্তিশালী কমিটি রয়েছে; যথা -

১) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এবং

২) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের পরিকল্পনার স্তর

বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ৪টি স্তর রয়েছে এবং প্রতিটির ভিন্ন মাত্রা এবং যাতব্যয়ন পরিধি (Planning Horizon) রয়েছে। বাংলাদেশের চারস্তর বিশিষ্ট পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার (Four Tiered Cascading Planning Mechanism) অঙ্গসমূহ হচ্ছে ঃ-*[১৪]

ক) দীর্ঘ মেয়াদী প্রেক্ষিত পরিকল্পনা,

খ) মধ্য মেয়াদী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা,

গ) ত্রি-বার্ষিক আবর্তক বিনিয়োগ কর্মসূচী এবং

ঘ) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী।

পরিকল্পনার অনুসৃত পদ্ধতি

বাংলাদেশে পরিকল্পনায় দ্বিমুখী কৌশল ব্যবহৃত হয়। যেমন -

১) উর্দ্ধ থেকে নিম্নমুখী (Top-down),

২) নিম্ন থেকে উর্দ্ধমুখী (Bottom-up)।

২.৩ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার আইনগত বাধ্যবাধকতা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানেই বিধৃত হয়েছে। সংবিধানের ২য় ভাগে ১৫ নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে উল্লেখিত আছে। "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতি মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নোমলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায় ঃ

ক) অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের উপকরণের ব্যবস্থা।

খ) কর্মের অধিকার কর্মের গুণ ও পরিমান বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা র অধিকার।

গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার এবং সামাচিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতাহীন, বার্ধক্যজনিত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভের অধিকার।"*[১৫]

সংবিধানে বর্ণিত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশ - এর অংশ হিসেবেই দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে গঠিত হয় " বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন"। স্বাধীনতার পর থেকে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্ঠার অংশ হিসেবে ২০০২ সাল পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশন ৫টি পঞ্চবার্ষিক এবং ১টি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়নকে বিশ্লেষণ এবং উন্নয়ন প্রশ্নে পরিকল্পনার প্রাসঙ্গিকতা আলোচিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে পরিকল্পনা ঃ-

উন্নয়নের একটি পন্থা হচ্ছে যথাযথ পরিকল্পনা। পূর্ব নির্ধারিত কিছু লক্ষ্যকে সামনে রেখেই পরিকল্পনা পরিচালিত হয় এবং লক্ষ্যভিন্ন পরিকল্পনা অর্থহীন, আসলে লক্ষ্য না থাকলে পরিকল্পনা নিস্প্রোয়োজন। এদিক থেকে লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে, 'একটি দেশ বা সমাজের ক্ষেত্রে এ লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে উন্নয়নের লক্ষ্য। সুতরাং উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানো পরিকল্পনার প্রয়াশ।'[১৬]

'সাধারণ কথায় কোন লক্ষ্য অর্জনের পূর্ব থেকে সুচিন্তিত যে কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাকে পরিকল্পনা বলে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কোন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যে পরিকল্পনা নেয়া হয় তা' উন্নয়ন পরিকল্পনা হিসেবে পরিচিত। অন্য কথায় উন্নয়ন পরিকল্পনা হলো জনগণের দীর্ঘকালীন কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে দেশের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সুচিন্তিত প্রচেষ্টা।'[১৭]

ড: সেলিম জাহান, 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা - প্রসঙ্গ কথা' প্রবন্ধে উল্লেখ করেণ যে, ''সম্পদের একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে ন্যূনতম সময়ে পূর্বনির্ধারিত এক বা একাধিক লক্ষ্য অর্জনের সচেতন প্রয়াসকেই পরিকল্পনা বলা যেতে পারে।'' তিনি এ সংজ্ঞার প্রেক্ষিতে ৪টি বিষয়কে চিহ্নিত করেণ; যথা:-

১। পরিকল্পনা মাত্রই একটি সচেতন প্রয়াস।

২। লক্ষ্য ছাড়া পরিকল্পনা অর্থহীন।

৩। অসীম সম্পদের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা নিস্প্রয়োজন।

৪। পরিকল্পনা ক্ষেত্রে ন্যূনতম সময়ের প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। [পৃ: ২২]

এক্ষেত্রে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মূলতঃ উন্নয়ন প্রশ্নে নীতি ও কৌশলের সমাহার। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট দেশটির জন্য সবচেয়ে বেশী কাম্য উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। এ অর্থে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন বাঞ্চনীয় এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে তার আলোচনা আরও বেশী আবশ্যক।

বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবতা আলোচনার পূর্বে উন্নয়নের চালিকা শক্তিগুলো আলোচনার প্রয়োজন। উন্নয়নের চালিকা শক্তিগুলো যদি অচল হয় তবে কোন উন্নয়নই সংগঠিত হবে না এবং আলোচিত পরিকল্পনাও একটি অর্থহীন বিষয়ে পরিণত হবে। নিম্নে বিষয়টির আলোচনা এবং তার আলোকে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা করা হলো :-

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন রাষ্ট্রের ভূমিকা ঃ-

উন্নয়নকে যদি আঙ্গিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হয় তা'হলে বলতে হয় যে, উন্নয়ন হচ্ছে একটি অবস্থা থেকে পরিবর্তনের মাধ্যমে একটি উন্নততর অবস্থায় রূপান্তর। অনুন্নত দেশসমূহ বর্তমানের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়নের একটি এবং কেবলমাত্র একটি সংজ্ঞাই গ্রহণযোগ্য এবং তা'হচ্ছে "উন্নয়ন মানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ণ্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণ।"[*১৮]

এবং রাষ্ট্র (State) হচ্ছে কতিপয় আইনসঙ্গত বৈধ প্রতিষ্ঠানের (অর্থাৎ নিয়ম কানুন) সমষ্টি। এইসব প্রতিষ্ঠান বা নিয়মকানুন প্রণয়নকারীরা এগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বভুক্ত এলাকায় অর্থনৈতিক বা অ-অর্থনৈতিক আচরণসমূহকে অপ্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে বল প্রয়োগের বা প্রণোদনার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন।'রাষ্ট্র'-এর নিয়ম-কানুনগুলো পরিচালনা ও প্রয়োগের ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি হচ্ছে 'সরকার' (Government) এবং এ অর্তে রাষ্ট্রের ভূমিকা মানে সরকারের ভূমিকা।[*১৯] তাই উন্নয়নে রাষ্ট্র পরিচালকদের দক্ষতাই এখানে মুখ্য ব্যাপার। এক্ষেত্রে এম. এম. আকাশ তার 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন ঃ পারস্পারিক সম্পর্ক'[*২০] প্রবন্ধে একটি মডেলের ব্যবহার করে যে উন্নয়ন আলোচনা করেছেন তা' সংক্ষেপে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, উন্নয়নে ৩টি চলক, যথা:-

১। বীক্ষণ বা স্বপ্ন (Vision)

২। অঙ্গীকার (Commitment) এবং

৩। সামর্থ (Capacity)।

সারণী - ২.২ উন্নয়ন চলক

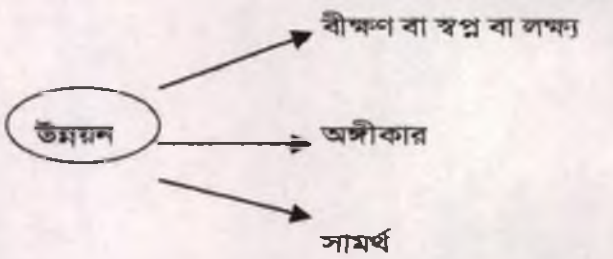

ধরে নেয়া যায় যে, প্রতিটি সরকারের কিছু লক্ষ্য থাকে এবং এই লক্ষ্য বিবৃত থাকে সরকারের বীক্ষণ বা স্বপ্নের দলিলে। এই বীক্ষণ তখনই একটি রাষ্ট্রীয় গ্রহণযোগ্য 'বীক্ষণ'- এর মর্যাদা পেতে পারে যখন তার পিছনে ণ্যূনতম সামাজিক সম্মতি থাকে। যে কোন প্রকৃত বীক্ষণের আগে সমাজের নানা শ্রেণী ও সামাজিক দলের সঙ্গে প্রচুর আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সংলাপের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে এই সংলাপের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগলো হচ্ছে, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, আমলাতন্ত্র, ব্যক্তিখাতের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোক্তাকৃত, দাতা গোষ্ঠী, এনজিওসমূহ অন্যান্য পেশার গ্রুপ ইত্যাদি। সমর্থনের শক্তি বা চরিত্র দু'টি উপাদানের উপর নির্ভরশীল এবং এই দু'টি উপাদানই বীক্ষণের পিছনে সামাজিক 'অঙ্গীকার'-এর প্রাথমিক মাত্রাটি নির্ধারণ করে দেয়। এই দু'টি উপাদানের প্রথমটি হচ্ছে 'বীক্ষণের মালিকানা', যেমন- বীক্ষণটি যদি বহিঃশক্তির হেড কোয়ার্টারে নির্মিত হয় এবং তারপর গ্রহীতা রাষ্ট্রের উপর তা' আরোপ করা হয় তা' হলে অবশ্যই আভ্যন্তরীণ শক্তি 'বীক্ষণের' যথাযথ মালিকানা থাকবে না এবং ঐ ধরণের বীক্ষণের প্রতি তাদের সমর্থন ও অঙ্গীকারও যথেষ্ট দুর্বল থাকবে। পক্ষান্তরে একটি 'বীক্ষণ' যদি আভ্যন্তরীণ শক্তি মালিকানাধীন হয় তা' হলে তার প্রতি আভ্যন্তরীণ অঙ্গীকার মাত্রা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ তখন 'বীক্ষণ'টি আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে নির্মিত হবে এবং তা'হবে নির্মাতাদের নিজস্ব ইচ্ছার মূর্ত প্রতীক। তবে যদি 'বীক্ষণ'টি অষ্টপষ্ট, বিমূর্ত এবং নিছক জনপ্রিয় শ্লোগানের আকারে পরিবেশিত হয় তা' হলে তা' আভ্যন্তরীণ মালিকানাধীন থাকলেও তার প্রতি অঙ্গীকারমাত্রা প্রায় শূণ্য বা খুবই কম হতে পারে। 'বীক্ষণ' নির্মাণ যত বেশী মূর্ত (Concrete) হবে, যত বেশী স্পষ্ট হবে, যত বেশী অনুপুঙ্খ হবে এবং 'বীক্ষণ'-এর আওতাধীন দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যসমূহ, স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যসমূহ এবং মাইক্রো পর্যায়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে যৌক্তিক যোগাযোগ যত বেশী সুষ্ঠভাবে তুলে ধরা হবে ততই 'বীক্ষণ'টির সামগ্রিকতা এবং অঙ্গীকার মাত্রা উচ্চতর রয়েছে বলে বুঝতে হবে। পক্ষান্তরে 'বীক্ষণ'-কে নিছক একটি শ্লোগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দিলে বুঝতে হবে যে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের এক্ষেত্রে অঙ্গীকারের ঘাটতি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে, রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ যদি ঘোষণা করেন যে, 'আগামী দিনের বাংলাদেশ হবে ভাল-ভাতের বাংলাদেশ' অথবা 'দুঃখীমানুষের মুখে হাসি ফোটানোর সোনার বাংলা' আর এরপর এই শ্লোগানের কোন মূর্তায়ন বা বিশ্লেষণ যদি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ কষ্ট করে না করেন তা' হলে বুঝতে হবে শ্লোগানগুলোর প্রতি রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের অঙ্গীকার মোটেও শক্তিশালী নয়। উপরোক্ত 'বীক্ষণ' বা 'স্বপ্ন' কিভাবে নির্মিত হয় তা' সারণী-২.৩ এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

যদি মূর্ত বীক্ষণ নির্মিত হয়ে থাকে তখন দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োজন হয় বাস্তব কর্মোদ্যোগ। রাষ্ট্রকে প্রথমে অনেকগুলো কঠিন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। সাধারনত: নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ বর্জনের ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে : সম্পদ সংগ্রহ, সুশীল সমাজের সমর্থন সংগ্রহ, প্রশাসন যন্ত্রের সমর্তন সংগ্রহ ইত্যাদি। অবশ্য 'বীক্ষণ'-এর পক্ষে এসব শক্তির সমর্থন সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এগুলো যাতে কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবায়ন ক্ষমতা সরকারের ধরণের (Form of Government) উপরও নির্ভর করে। এছাড়া সরকারের 'বীক্ষণ'-এর চরিত্র এবং নির্বাচিত নীতিমালার উপরও রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন ক্ষমতা অংশত নির্ভর করবে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, যদি সরকারী 'বীক্ষণ'-এর চরিত্র এমন হয় যে, তা' বাস্তবায়িত হলে সমাজের সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ উপকৃত হবে তা'হলে ঐ 'বীক্ষণ'-এর পক্ষে সামাজিক শকিাত ভারসাম্য

Dhaka University Institutional Repository

অধিকতর অনুকূল হবে, ফলে রাষ্ট্রের পক্ষে উক্ত 'বীক্ষণ'-এর বাস্তবায়নের ক্ষমতা একসাথে বেড়ে যাবে।

সারণী - ২.৩ঃ বীক্ষণের উৎসসমূহ

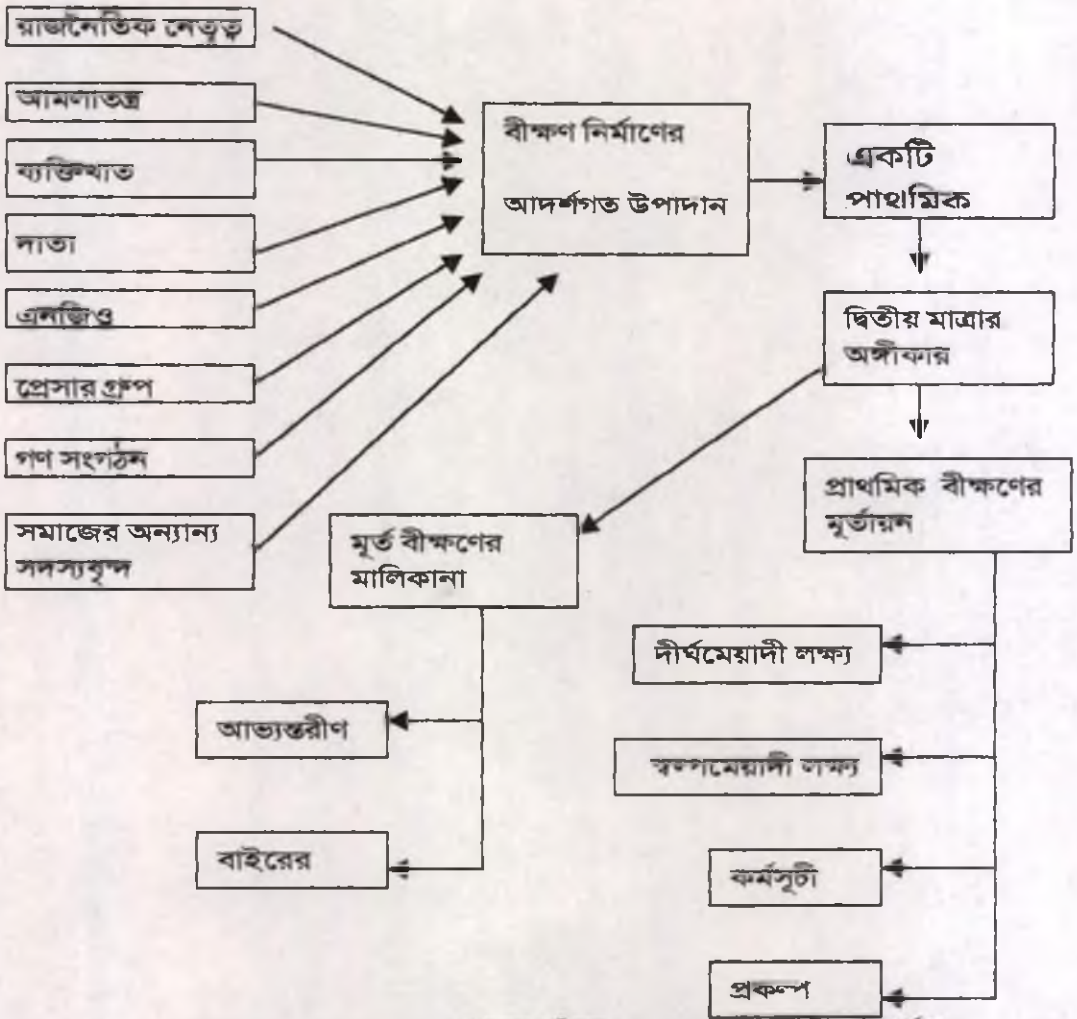

উৎস ঃ এম. এম. আকাশ " শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন : পারস্পারিক সম্পর্ক "
বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা '৯৭, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, পৃ: ৪৬.

'বীক্ষণ' বাস্তবায়ন ক্ষমতা রাষ্ট্রযন্ত্রের টেকনিক্যাল গুণাগুণ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, একটি অনুকূল ব্যক্তিস্বার্থের উপস্থিতি ইত্যাদি শর্তের দ্বারাও অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রথমে একটি 'বীক্ষণ'-এর নির্মান করেন যেটি আর কিছুই নয় বরং উন্নয়ন সম্পর্কে তাদের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ। অবশ্য রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে দু'টি সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করতে হয়। বিদ্যমান সামর্থ এবং অঙ্গীকার - এই সীমাবদ্ধনে দু'টি 'বীক্ষণ' বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে দেয়। যেহেতু 'বীক্ষণ'-এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যসমূহ, সেহেতু উন্নয়ন

Dhaka University Institutional Repository

সাফল্যের তারতম্য 'বীক্ষণ' বাস্তবায়ন মাত্রার তারতম্যেরই প্রতিফলক। যেহেতু 'বীক্ষণ' বাস্তবায়নের মাত্রা অঙ্গীকার ও সামর্থের মাত্রার তারতম্য দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্ধারিত হয়, সেহেতু একার্থে উন্নয়ন সাফল্যের তারতম্যও এই দু'টি চলক দ্বারাই নির্ধারিত হয়। চিত্র – ২.৪ এ বিষয়টি দেখানো হলো ঃ-

সারণী – ২.৪ ঃ বীক্ষণ, অঙ্গীকার এবং সামর্থের আন্তঃসম্পর্ক

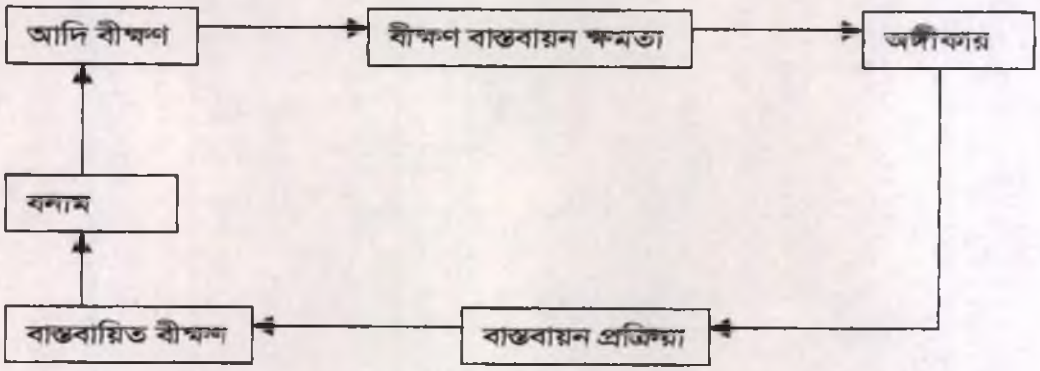

উৎস ঃ প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮.

প্রায়োগিক মডেল ঃ উন্নয়নের বাস্তবতা

উন্নয়ন মডেলে পূর্বালোচিত ৩টি চলকের সাহায্যে গবেষণার বিষয়বস্তু নারী উন্নয়নকে আলোচনা করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহীত হবে এই গবেষণার বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের বিস্তৃত বর্ণনা ও উপাত্তমালা থেকে। তবে তার পূর্বে বাংলাদেশের শাসন প্রক্রিয়ার ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরা প্রয়োজন। "বাংলাদেশ জন্মের চার বছর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালে শাসন ক্ষমতার রক্তক্ষয়ী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে শাসন প্রক্রিয়ার বীক্ষণটিই এদেশে মৌলিকভাবে বদলে যায়।"[২১] মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আভ্যন্তরীন শক্তির অনুপ্রেরণায় ও মালিকানায় যে বীক্ষণটি গড়ে উঠেছিল তা' প্রত্যাখ্যান করে ধীরে ধীরে শাসকরা বহিরারোপিত বীক্ষণকে গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই পরিবর্তিত বীক্ষণের ফলে যে সংকট তৈরী হয় তা' নিম্নরূপঃ-

বাংলাদেশে বীক্ষণ পরিবর্তনের সংকট ঃ-

১৯৭৫ সাল পূর্ব পর্যন্ত শাসনের মূল বিষয় ছিল সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় খাতের প্রাধান্য ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি। কিন্তু ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকারকে সামরিক বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত করা হলে রাষ্ট্রীয় বীক্ষণের মৌলিক রদবদল ঘটে এবং রাষ্ট্রীয় খাতকে সংকুচিত করে ব্যক্তিখাতকে বিকশিত করে। এবং পরবর্তী সমস্ত সরকারই ব্যক্তিখাতের প্রসারের চেষ্টা করেছে। এই নতুন ব্যক্তি কাত নির্ভর পুঁজিবাদী বীক্ষণ নির্মাণের

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষেত্রে দাতাগোষ্ঠী ও তার বহুপাক্ষিক সংস্থাসমূহ এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।[*২২] যেমন:-

মেঘনা গুহঠাকুরতা, 'বাংলাদেশের উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য ও নারী সমাজ'[*২৩] প্রবন্ধে উল্লেখ করেণ যে, ১৯৭১-৭২ থেকে ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত সর্বমোট ১৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন্তন ডলার বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশকে বরাদ্দকৃত করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রেরিত হয়েছে ১১.৭ বিলিয়ন ডলার। ১৯৭৭ সালে অনুমান করা হয় যে, উন্নয়নকাজের জন্য সর্বমোট ব্যয়ের শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ এসেছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে। এবং বিশ্ব ব্যাংকের এক রিপোর্টে জানা গেছে যে, বৈদেশিক সাহায্য কেবলমাত্র রাষ্ট্রীক বিনিয়োগের জন্য অর্থ যোগাচ্ছে না বরং কিছু রাষ্ট্রীক ভোগের (Consumption) খরচও যোগান দিচ্ছে। রাষ্ট্রীক বিনিয়োগের জন্য শতকরা ১০০ ভাগ ও মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের জন্য শতকরা ১০ ভাগ যোগান দিচ্ছে ঋণসহ বৈদেশিক সাহায্য থেকে।

রেহমান সোবহান তার বই 'The Crisis of External Dependence'[*২৪] -তে উল্লেখ করেছেন যে, বছরের পর বছর নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে মোট প্রেরিত সাহায্য মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শতকরা ৯.৫ ভাগ ছিল। পরবর্তী বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব ও অর্থনৈতিক স্থবিরতার দরুণ এই সাহায্যের পরিমান কিছু কমে আসে বটে তবে ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরে এটা আবার বেড়ে হয় GDP-র শতকরা ৮.৫ ভাগ ও ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে GDP-র শতকরা ১১.৩ ভাগ পর্যন্ত।

"বৈদেশিক সাহায্য বাংলাদেশে তিনভাবে আসে ঃ খাদ্যদ্রব্য সাহায্য, পণ্যদ্রব্য সাহায্য ও প্রকল্প সাহায্য। ১৯৮৩-৮৪ পর্যন্ত সর্বমোট বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে শতকরা ১৪.৪ ভাগই আসে খাদ্য দ্রব্য সাহায্য হিসেবে, শতকরা ৩১.৭ ভাগ আসে পণ্যদ্রব্য সাহায্য হিসেবে ও শতকরা ৫০.৫ ভাগ প্রকল্প সাহায্য হিসেবে। প্রকল্প সাহায্যের পরিমান ক্রমেই বেড়েছে এবং ১৯৭৬-৭৭ সালে এটা পণ্যদ্রব্য সাহায্যের সমান সমান হয়েছিল। ১৯৭৭-৭৮ থেকে আবার বেড়ে চরেছে এবং বর্তমানে এটা মোট বরাদ্দকৃত সাহায্যের সিংহভাগ দখল করেছে।"[*২৫] এভাবে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্যের মুখ্য ভূমিক। যে পরিমানে দেশের উন্নয়ন বাজেট বিদেশী সাহায্যের দ্বারা অর্থায়িত হয়েছে সে পরিমানে উন্নয়ন বীক্ষণের উপর দাতাদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এম. এম. আকাশ, 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন'[*২৬] প্রবন্ধে বলেছেন যে, বাংলাদেশে একটি আভ্যন্তরীণ মালিকানাধীন দীর্ঘ মেয়াদী বীক্ষণের অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রধানতঃ কয়েকটি পরস্পর বিচ্ছিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আওতার পরিচালিত হচ্ছে। আর এই পরিকল্পনাগুলো মূলতঃ হচ্ছে নিছক কতকগুলো বড় বড় প্রকল্পের সমষ্টিমাত্র। এসব প্রকল্পের একটি বড় সংখ্যকই আবার অতীতের অসমাপ্ত প্রকল্পের জের হিসেবে এক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে আরেক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চালান হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যায়। এর মধ্যেও যে সামান্য দু'একটি নতুন প্রকল্প প্রতি বছর গৃহীত হয় তাও মূলতঃ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন দাতাগোষ্ঠীর দ্বারাই পৃথকভাবে প্রনীত হয়। স্বাধীনভাবে সূচীত হয় এসব প্রকল্পের উদ্যোক্তা পৃতক পৃথক দাতাদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমন্বয়ের কোন বাধ্যবাধকতা বর্তমানে নেই। অবশেষে চুড়ান্তভাবে যে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনীত হয় সেখানে কিছুটা সমন্বয় সম্ভব হলেও, যে সব বিদেশী অর্থভিত্তিক প্রকল্প এর বাইরে স্বাধীনভাবে প্রনীত হয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় স্থানলাভ করেছে তাদের ক্ষেত্রে সেই সমন্বয় আদৌ সম্ভব হয় না।

এভাবে বৈদেশিক নির্ভরতা বীক্ষণের মৌল বিষয়কে পরিবর্তন করে ফেলে যার ফলাফল পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও কার্যক্রমের ফলাফল ঃ-

টাস্কফোর্স প্রতিবেদন ১৯৯২[*২৭] -তে '৯২ পূর্বগত ১৯ বছরে উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গীর ও কার্যক্রমের ফলাফল বিশ্লেষণ করেণ যা পরবর্তী সময়ের জন্যও প্রযোজ্য। নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো -

১। সশস্ত্র স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের জনগণের উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস, প্রত্যাশা এবং ঐক্যকে অগ্রসর করে নেয়ার জন্য কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দল ও প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় ভূমিকা তখন ছিল অনুপস্থিত। ফলে জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং তার থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এবং বৈরিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে উন্নয়ন সম্পর্কিত দৃষ্টভঙ্গী নির্মাণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া সংকুচিত হয়েছে।

২। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রনীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছাড়া কোন দলিলই একটি জাতীয় আশা-আকাংখাকে কেন্দ্র করে এবং জনগণের অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দিয়ে প্রনীত হয়নি। পরবর্তীকালে সবগুলো পরিকল্পনা দলিলই বস্তুত বিদেশী সাহায্য নির্ভর প্রকল্পের সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে সবগুলো পরিকল্পনার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে আগের পরিকল্পনার অসমাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত করা।এসব পরিকল্পনা দলিলে বরাবরই কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বয়ান করা থাকে। যেমন, দারিদ্র বিমোচন, বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরতা হ্রাস, উৎপাদন বৃদ্ধি, শিক্ষার বিস্তার, জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি। কিন্তু এই লক্ষ্যগুলোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজগুলো কখনোই সেভাবে নির্দিষ্ট হয়নি। এগুলো বরাবরই বাগাড়ম্বর হিসেবে থেকেছে।

৩। একটি গতিশীল উন্নয়ন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশ কিভাবে কর যাবে তা' বস্তুতঃ একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, নিছক অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। স্বাধীনতার পর কোন রাজনৈতিক দল বা বেসামরিক-সামরিক কোন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশের জন্য কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জনগণকে নিজের পিছনে সমবেত

Dhaka University Institutional Repository

করতে পারেনি বা করেনি। ফলে যতটুকু অভ্যন্তরীন সম্পদ সমবেত হয়েছে তারও অনেকখানি বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বিদেশী সাহায্যের এই নির্ভলশীলতার ফলে আমাদের আমদানী কি হবে, রপ্তানী কি হবে, কোন ধরণের শিল্পায়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে, অর্থনীতিতে মুক্ত আর অমুক্ত অনুপাত কি হবে; কৃষিখাতে ভর্তুকি যাবে না সামরিক খাতে যাবে, কোন দেশের প্রকৌশলী কোন প্রকল্প তদারক করবে, রেল লাইন কোথায় বসবে, সড়ক কোথায় হবে, সেতু কোথায় হবে, শিক্ষাখাতের কোন উপখাতকে বেশী বরাদ্দ দেয়া হবে, বেতস স্কল কি হবে, কোন কাতের বিকাশ ঘটানো হবে, কোন বিষয়ে গবেষণা দরকার ইত্যাদি সকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক শক্তি সমূহের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, জনগণের প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের প্রশ্নটি অবান্তর ও অযৌক্তিক হয়ে যায়। এসব সিদ্ধান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে সয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত হয় এবং এগুলো পরিকল্পনা দলিলে যৌক্তিক লক্ষ্য বা সংবিধানে প্রদত্ত জনগণের অধিকারকে নাকচ করলেও তা বলবৎ হয়।

৪। এ রকম একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যখন ক্রমে জোরদার হয়েছে সেখানে উন্নয়নের গতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত এবং বিভিন্ন বরাদ্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত উৎপাদনমুখিতা বা জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনা হয়নি। এই সিদ্ধান্তগুলোর পেছনে কাজ করেছে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির বিন্যাস। এই বিন্যাস অনুযায়ী শাসক গোষ্ঠীর সমর্থক শ্রেণীর বিকাশ ঘটানোই প্রধান বিবেচনা হিসেবে কাজ করেছে। এই সমর্থক শ্রেণী পরজীবী একটি গোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে বিকশিত হয়েছে। ক্ষমতার সঙ্গে যোগাযোগ এবং চুক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে সম্পদ বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন। এর ফলে সামগ্রিক উন্নয়ন ধারার সঙ্গে জনগণ যুক্তিসঙ্গতভাবেই কখনো একাত্মবোধ করেনি।

৫। বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারায় উন্নয়নের বাস্তব সমস্যাসমূহ আড়াল করে বা আড়াল করার জন্য বরাবর গৌণ সমস্যা বা উপজাত সমস্যাগুলোকে প্রধান বা মূল কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে। যেমন:- সম্পদের অভাব, জনসংখ্যা, অশিক্ষা এবং আলোস্য। কিন্তু দেশ ও জনগণ নিজেদের ক্রমাগত উন্নত পর্যায়ে তুলে নিতে পারবে কিনা তা' নির্ভর করে মূলতঃ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর, রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ভূমিকার ওপর যা এদশে অনুপস্থিত।

৬। প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলের প্রধান বৈশিষ্ট্য ওফলাফল হচ্ছে সমগ্র অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজে মধ্যস্বত্বভোগীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এছাড়া কোন ক্ষেত্রে উৎপাদকদের আধিপত্য না থাকায় এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের অবস্থান ক্রমান্বয়ে প্রবল করার মাধ্যমে কিছু কর্মসংস্থান বা আয় সংস্থান হয়েছে। কিন্তু উৎপাদনশীল খাতে পুণরুৎপাদন প্রক্রিয়া হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উৎপাদকেরা।

৭। এ ধরণের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোন সামগ্রিক লক্ষ্য থাকে না। লক্ষ্য থাকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সমৃদ্ধি। সে কারণে বিভিন্ন ভাল কথা বা ঘোষিত লক্ষ্যগুলোও কোন সমন্বিত রূপ পায়নি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ; কৃষি ওশিল্পের উন্নয়ন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য,

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিবেশ, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি একটি আরেকটি থেকে বিচ্ছিন্নভাবে বেশীদিন অগ্রসর হতে পারে না। এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার ফলে সামগ্রিক কোন লক্ষ্য অর্জিত হয় না।

৮। ণ্যূনতম চিকিৎসা সুবিধা, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদিকে জনগণের মৌলিক অধিকার এবং এই অধিকার পূরণ যে রাষ্ট্রেরই মূল দায়িত্ব। সেটাও সব সময়ই অস্বীকৃত হয়েছে। প্রচলিত উন্নয়ন কৌশলে রাষ্ট্র বরাবর এই দায়িত্ব এড়িয়ে গেছে। বেসরকারী খাতের বিকাশের নামে জনগণের কর্মসংস্থানের অধিকারও রাষ্ট্র বরাবর অবহেলা করেছে।

৯। এ রকম একটি উন্নয়ন কৌশল সর্বক্ষেত্রে জনগণের অধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা দূরের কথা এমনকি একটি পশ্চাৎপদ সমাজ ও অর্থনীতিকে নিচু মাত্রা থেকে বের করে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজনীয় প্রবৃদ্ধি হারও নিশ্চিত করতে পারেনি। নিরক্ষরতার অনুপাত কমেনি, অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষিত দক্ষ, মেধা ও জনশক্তি পাচার হয়েছে। বিনা চিকিৎসায় মানুষের মৃত্যু হচ্ছে কিন্তু ডাক্তারদের কর্মসংস্থানের সমস্যা বেড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কোন উন্নতি দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়; কিন্তু দেশীয় বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের কর্মসংস্থান হয়নি। শিক্ষিত ও নিরক্ষর বেকার জনগোষ্ঠীর অনুপাত কমেনি। ক্ষুধা, দারিদ্র, নিরাপত্তাহীনতা ও আশ্রয়হীনতা নিয়মিত অনুসঙ্গে পরিণত হয়েছে।

ট্যাক্সফোর্স প্রতিবেদনে এই বলে মতামত ব্যক্ত করা হয় যে, বিদ্যমান উন্নয়ন কৌশলের প্রধান তিনটি ভিত্তি হচ্ছেঃ

১। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল ও নিয়ন্ত্রণ;

২। মালিকানা ব্যবস্থা এবং

৩। শ্রেণীবিন্যাস।

এই তিনটি ভিত্তির পরিবর্তন ছাড়া উন্নয়ন কৌশলে মৌলিক কোন রূপান্তর সম্ভব নয়।

বীক্ষণ ঃ নারী উন্নয়ন নীতিমালা:-

উপরোল্লিখিত উন্নয়ন ফলাফল উন্নয়ন কৌশলের মধ্যেই লুকায়িত বলে প্রতীয়মান হয় যেখানে রাজনৈতিক শক্তিসমূহের সদিচ্ছার অভাবটি প্রকট। এ প্রসঙ্গে শহিদুজ্জামান, ১৯৯১ থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে, "আমি সত্যিই বিশ্বাস করি যে প্রবৃদ্ধির হারকে আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল - যদি প্রাপ্ত সম্পদকে ঘোষিত অগ্রাধিকার অনুযায়ী ব্যয় করা হতো, যদি এ্যাড হক ভিত্তি মূল্যবান সম্পদ যত্র-তত্র অপরিকল্পিত ব্যয়ের প্রবনতা নিয়ন্ত্রিত করা যেত, যদি সরকারি খাতে সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য আরো জোরদান প্রচেষ্ঠা পরিচালনা হরা হতো এবং যদি বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকেই আরো শক্তিশালী করে তাদের সদ্ব্যবহার করা যেত। আমি এ কথাও বিশ্বাস করি যে নিয়মিতভাবে ও দক্ষতার সাথে আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রন ও ভারসাম্য স্থাপন সম্ভব হলে সম্পদের বন্টন বিনিয়োগের গুণগতভাবে উন্নততর হত। কিন্তু এসব প্রক্রিয়ার একটি রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে।"[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ভূমিকার প্রেক্ষাপটে নারী বিষয়টি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, "সমাজে বিদ্যমান সার্বিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে অধঃস্তনতায় আবদ্ধ নারীর বৈষম্যমূলক অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা রাজনীতির স্রোতে সন্নিবেশিত হয়নি। রাজনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নারীর সমস্যা বিবর্জিত।"[২৯] জনসংখ্যার অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী বিভিন্নভাবে সমাজ কাঠামোয় পশ্চাৎপদ এবং অসম অবস্থানে বিরাজ করছে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে, যথা:- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, আইনগত অধিকার (৩য় অধ্যায়ে আলোচিত) ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলের ঘোষণা, কর্মসূচী, নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হবে যে, নারী ও নারী অধিকারের বিষয়টি আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখনো পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। আবার 'যে সমাজে নারীর অধঃস্তনতা প্রায় সর্বস্তরে গৃহীত এবং যে সমাজে পরিবেশগতভাবে নারীর সমস্যা, সমাধান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী নেই, যে সমাজে নারীর রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ সীমিত এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিতান্তই ক্ষীণ।'[৩০] তাই নারীর এই অবস্থান থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে উন্নয়ন বিষয়টি নারীর সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। নিম্নে উন্নয়নে নারীর সম্পৃক্ত, গৃহীত সহায়কারী পদক্ষেপসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন আলোচিত হলোঃ-

উন্নয়ন ঃ নারীর সম্পৃক্তি

৬০- এর দশকে উন্নয়ন ক্ষেত্রে উৎপাদন মানবিক উন্নয়ন ধারায় রূপ নেয় এবং মানবিক উন্নয়ন ভিত্তিক ধারা স্বভাবতই পুরুষ প্রধান হিসেবে কার্যকরী হয়। ৭০- এর দশকের প্রারম্ভে একদল উন্নয়ন বিশারদ গবেষণার ভিত্তিতে দেখেছেন যে, তৃতীয় বিশ্বে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছিল তাতে নারীরা অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। এবং যতক্ষণ না নারীরাএই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে, ততোক্ষণ সেই সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে না। মূলত: ক্রমবর্ধমান চাপের মুখে ১৯৭০ সালে সর্বপ্রথম উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বিষয়টি তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত লাভ করে। এবং গবেষকগণ নারী উন্নয়ন (Women in Development) নামে নতুন এক উন্নয়ন ধারা চালু করেন। এই ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বরং বলা যায়, "এই বিশেষ উন্নয়ন চিন্তার প্রভাবেই জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালে ১৯৭৬-১৯৮৬ সালকে নারী দশকের ঘোষণা করে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গ্রহণ করার সাথে সাথে দাতাসংস্থাসমূহ বিশেষ অনুদান বরাদ্দ করে নারী উন্নয়নের জন্য"[৩১] যার সুযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নারী বিষয়ক কার্যক্রম হাতে নেয়।[৩২]

জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর বাংলাদেশেও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে বিভিন্ন সাহায্যপুষ্ট বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এবং "এই প্রকল্পগুলি অধিকাংশ পড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রিলিফের খাতে।"[৩৩]

Dhaka University Institutional Repository

নারী উন্নয়নে সরকারী নীতিমালা ঃ-

১৯৯৫ সালে চীনের রাজধানী বেইজিং এ অনুষ্ঠিত ৪র্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের প্লাটফরম ফর এ্যাকশন (PFA) কে সামনে রেখে সরকারী পর্যায়ে যে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা'হলো:-

১। মহিলা উন্নয়নকল্পে বাংলাদেশ সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা পর্যালোচনা।

২। জাতীয় কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন।

৩। জাতীয় মহিলা উন্নয়ন নীতি ঘোষণা।

৪। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়নকে গুরুত্বারোপ।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিগত ৪টি পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। নিম্নে নারী উন্নয়নে অন্যান্য জাতীয় কার্যক্রম সংক্ষেপে আলোচিত হলো:-

নারী উন্নয়নে জাতীয় কার্যক্রম ঃ-

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় লাভের পর হতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এইসব কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত চিত্র আলোচিত হলো।

১। নারীর সাংবিধানিক অধিকার (১৯৭২)ঃ-

সংবিধানে নারীর সমানাধিকার ঘোষণা ১৯৭২ অনুযায়ী অনুচ্ছেদ ২৭, ২৮ -এর ১,২,৩; ২৯ -এর ২ এবং ৬৫-এর ৩ এ নারীর অধিকারসমূহ বর্ণিত হয়। যেখানে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শণ করবে না; সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমানাধিকার উপরোক্ত কোন কারণে কাহাকেও কোন শর্তের অধীনে করবে না, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদলাভের অযোগ্য হবে না এবং বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। এবং জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

২। নারীর ক্ষমতায়ন ঃ-

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসন ১৫ থেকে ৩০-এ উন্নীত করা এবং সিটি কর্পোরেশন। ইউনিয়ন পরিষদ, গ্রাম পরিষদ নারীর আসন সংরক্ষণ হয়েছে।

৩। নারীর মানবাধিকার ঃ-

সিডও সনদ অনুমোদন ১৯৮৪-এর দ্বারা সরকার নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ এর ৩টি ধারা সংরক্ষণসহ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করে। পরবর্তীতে সরকার ১৩ (ক), ১৬ (গ) ধারার উপর থেকে সংরক্ষণ প্রত্যাহার করে। বিবাহের ক্ষেত্রে নারী অধিকার

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠা, বাল্য বিবাহ রোধে বয়স সীমা বেঁধে দেয়। এবং মুসলিম বিবাহ আইনের ১৯৭৪ আওতায় নারীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৪। নারীর পূণর্বাসন ঃ-

নারী পূণর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা ১৯৭২ দ্বারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ, ছিন্নমূল নারীর জন্য পূণর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে এবং দুঃস্থ গর্ভিতা ও তাদের সন্তানদের এসিডদগ্ধ মেয়েদের চিকিৎসার জন্য তহবিল গঠন ও পূণর্বাসনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু ও সামাজিক জীবন পূণঃনির্মাণ নামে প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণ করে। অক্টোবর ১৯৯৮ থেকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশের প্রতিটি মহিলাকে মাসিক ১০০ টাকা আর্থিক সহায়তায় ৪৬১টি পল্লী থানায় ৪ লাখ ৩ হাজার ১১০জন মহিলা এই কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত।

৫। প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ঃ-

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। যার মধ্যে,

ক) ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নারী পূণর্বাসন বোর্ড গঠিত হয় এবং তা' ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ নারী পূণর্বাসন বোর্ড ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত হয়।

খ) ১৯৭৬ সনে শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে গঠিত হয় জাতীয় মহিলা সংস্থা।

গ) ১৯৭৬ সনে সমাজকল্যাণ বিভাগে উইমেন্স এ্যাফেয়ারের সেল সৃষ্টি করা হয় ও রাষ্ট্রপতির মহিলা বিষয়ক সহকারী নিয়োগ করা হয় এবং এই দু'য়ের সমন্বয়ে পরে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের উইমেন্স এ্যাফেয়ার ডিভিশন গড়ে ওঠে।

ঘ) ১৯৭৮ সালে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্থাপন করা হয় যা ১৯৮২ সালে সমাজকল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক নতুন মন্ত্রণালয়ের রূপ লাভ করে এবং এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর গড়ে তোলে যা ১৯৯০ সালে ডিপার্টমেন্টে উন্নীত হয়।

ঙ) ১৯৮৯ সালে মহিলা বিষয়ক নতুন মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯৯৪ সালে তা' মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৬। নারীর আইনী সহায়তা ও নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ-

নারীর জন্য নিম্নরূপ আইন ও আইনী সহায়তায় ব্যবস্থা করা হয়েছে -

ক) বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন ১৯৭৪ ইং;

খ) যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, সংশোধনী ১৯৮৬;

গ) নারী নির্যাতন নিবর্তনমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য) ১৯৮৪;

ঘ) বাল্য বিবাহ আইন (সংশোধিত অডিন্যান্স ১৯৮৪);

ঙ) মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ ১৯৬১ (সংশোধিত ১৯৮৫);

Dhaka University Institutional Repository

চ) অপরাধ দমন আইন (দ্বিতীয় সংশোধিত অধ্যাদেশ);

ছ) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫;

জ) সন্ত্রাস দমন অধ্যাদেশ ১৯৯২;

ঝ) নারী নির্যাতন নিয়র্তনমূলক আইন (শাস্তিযোগ্য);

ঞ) নারী ও শিশু পাচার দমন আইন ১৯৯৩;

ট) নারী ও শিশু দমন আইন ১৯৯৫ (সংশোধনী) এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ১৯৯৮ (চূড়ান্ত বিল);

ঠ) নারী নির্যাতন বিলোপে সমন্বিত প্রকল্প ১৯৯৭;

ড) বিশেষ আদালত গঠণ;

ঢ) সামারিট্রায়াল যেখানে বিশেষ বিধান অনুযায়ী মামলার তারিখ হতে ৯০টি কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্নের বিধান রাখা হয়েছে;

ণ) লিগ্যাল এইড কমিটি যেখানে ৬১টি জেলায় বিশেষ আদালত গঠিত না হওয়া পর্যন্ত নারী ও শিশুর সাহায্যার্থে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে;

ত) নারী ও শিশু মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় সেল গঠন;

থ) পুলিশ বিভাগে নারীদের জন্য অধিক সংখ্যক পদ সৃষ্টি, মহিলা তদন্ত কেন্দ্র স্থাপন ১৯৯৬;

দ) আইন, স্বরাষ্ট্র, মহিলা ও স্বাস্থ্য ৪টি মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে "মাল্টি সেক্টরাল কর্মসূচী" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়;

ধ) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ পাস।

৭। যাতায়াত, বাসস্থান ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম ঃ-

পোশাক শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের যাতায়াত সুবিধার জন্য ঢাকা-আরবান এ মিনিবাস চালু ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এবং কর্মজীবি মুহলাদের জন্য ৪টি বিভাগে ৪টি এবং যশোর জেলায় ১টি মোট ৫টি হোষ্টেল নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকায় আরো ২টি হোষ্টেল নির্মিত হচ্ছে। এছাড়া মাতৃকালীণ ছুটি, ভিজিডি কার্ড প্রবর্তন, ঢাকায় ১১টি, বিভিন্ন শহরে ৫টি মোট ১৬টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মধ্যে মোট ১৩টি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও কর্মজীবি, নারী ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গামী নারী যাত্রীদের সুবিধার্তে ঢাকায় ৯৮ থেকে বিআরটিসি-সিটি মহিলা বাস সার্ভিস চালু করেছে।

৮। আয় ও কর্মসংস্থান ঃ-

পাবলিক সেক্টরভিত্তিক কর্মখাতে নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণ করে সচিবালয়ে সরকারী চাকুরীতে নারী অফিসারের সংখ্যা ১৯৮৭ সালের ১৭% থেকে ১৯৯১ সালে ২৫.৭% করা হয় এবং পরিদপ্তরের নারী অফিসারের সংখ্যা ১৯৮৭ সালের ৭.১% থেকে ১৯৯১ সালে ১৯.৬%-এ উন্নীত করা হয়। এছাড়া আয়মূলক কাজের জন্য সমবায় মহিলা শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়ন নামক কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং মহিলাদের জন্য মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয়পত্র, 'পাবর্ত্য চট্টগ্রাম মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প' গ্রহণ করে। এছাড়া ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৯। নারীর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা ঃ-

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিতকল্পে সরকার ইউনিয়ন পর্যায়ে টিকাদান কর্মসূচী ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও থানা পর্যায়ে সবুজ ছাতা কেন্দ্রে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ও মাতৃমৃত্যুহার কমাতে সারাদেশে '১৫টি নারী বান্ধব' হাসপাতাল চালু করেছে।

১০। গণ মাধ্যমে নারী ঃ-

ধর্ষিতা নারী যাতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন না হয় সে জন্য 'ধর্ষিতা নারীর ছবি সংবাদ পত্রে ছাপানো নিষিদ্ধকরণ (বিশেষ বিধান) ১৯৯৮' নামে একটি নতুন আইন প্রস্তাবিত হয়েছে।

১১। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ঃ-

বিনা বেতনে মেয়েদের ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় যেখানে এই লক্ষ্যপূরণের জন্য,

ক) খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা,

খ) মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৫% উপস্থিতি সাপেক্ষে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত নারীদের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন করা হয়েছে।[*৩৪]

উক্ত কিছু কার্যক্রম গুলো বাংলাদেশ সরকার বেইজিং প্লাটফরম্ ফর এ্যাকশন-এ বর্ণিত ১২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের নিরিখে যে ১৪ দফা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করে তার আলোকে গ্রহণ করা হয়। নিম্নে এই ১৪ দফা নীতিমালাসহ কার্যক্রমের বাস্তবতা আলোচনা করা হলো।

নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের বাস্তবতা ঃ-

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, উন্নয়ন ও নারী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বৈদেশিক অর্থ সাহায্য নির্ভর যেমন, তেমনি দর্শণ সাহায্য নির্ভরও বটে। কিন্তু সেগুলো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে ও নারী সমাজকে কতটুকু অগ্রগতি ও অনুপ্রাণিত করছে সেটাই বর্তমানের বিবেচ্য বিষয়।

১৯৯৭ সালের ৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে বর্তমান সরকার নারী উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (National Policy for Women Development) ঘোষণা করেছে। ১৪ দফার এই দাবীগুলো হলো ঃ-

১। নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার বাস্তবায়ন।

২। মেয়ে শিশুদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন এবং সেই লক্ষ্যে নতুন আইন প্রণয়ন।

৩। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরকরণ।

৪। সশস্ত্র সংঘর্ষ ও নারীর অবস্থান

Dhaka University Institutional Repository

৫। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ।

৬। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি।

৭। জাতীয় অর্থনীতির সকল কর্মকাণ্ডে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সমানাধিকার নিশ্চিতকরণ:-

৭.১ নারীর দারিদ্র দূরীকরণ;

৭.২ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন;

৭.৩ নারীর কর্মসংস্থান;

৭.৪ সহায়ক সেবা;

৭.৫ নারী ও প্রযুক্তি;

৭.৬ নারীর খাদ্য ও নিরাপত্তা;

৮। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

৯। নারীর প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন ।

১০। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি।

১১। গৃহায়ন ও আশ্রয়।

১২। নারী ও পরিবেশ।

১৩। নারী ও গণমাধ্যম এবং

১৪। বিশেষ দুদর্শাগ্রস্থ নারী।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ঘোষিত নীতিমালা এবং গৃহীত কার্যক্রমের নিরীখে নারী উন্নয়ন পরিসর বা বাস্তবতা নির্ধারণে উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন খাতগুলো পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, 'নারী উন্নয়ন' প্রকল্পগুলো অধিকাংশ পড়েছে জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রিলিফের নীচে। শিক্ষায়, পুষ্টিতে, বিত্তে, আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দেশের মহিলা জনগোষ্ঠী অমানবিকভাবে পিছিয়ে আছে (৩য় অধ্যায়ের পরিসংখ্যানসমূহ প্রনিধানযোগ্য)। এবং বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়টি পর্যালোচনায় (৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত) দেখা যায় যে, নারীর ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকারের উপর গতানুগতিক ভূমিকার উৎকর্ষ সাধনের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয় কিন্তু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যথা, কৃষি, গৃহকর্ম প্রভৃতি কম গুরুত্ব পায়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, পরিকল্পনাসমূহ শিক্ষাবৈষম্য দূরীকরণে যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় তা অর্জিত হয়নি (৩য় অধ্যায়ে শিক্ষা পরিসংখ্যান পরিদৃষ্ট)। উন্নয়নের কৌশল হিসেবে প্রশিক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয় কিন্তু মহিলাদের জন্য যে ধরণের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা করা হয়, যেমন:- হাঁস-মুরগী, ডেইরী ফার্ম, মৎস চাষ, হস্তশিল্প, কুটির শিল্প.তাঁত শিল্প ইত্যাদি ধরণের যেগুলোর মান অত্যন্ত নিম্ন মানের এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা রয়েছে। উপরন্তু যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা কাজে লাগাতে পারছে কিনা তা অনুসরণ করা হয় না। সর্বপরি যে লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বরাদ্দ

Dhaka University Institutional Repository

দেয়া হয় তা সমগ্র নারী সমাজের ক্ষেত্রে চরম হতাশা ব্যঞ্জক। এবং আইনের ক্ষেত্রে যে আইন প্রনয়ন ও আইনি সহায়তা ও সেল গঠন করা হয়েছে তা সত্যিকার অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা সেটা লক্ষ্যনীয়। (এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়া, নারী নির্যাতন পরিসংখ্যান পরিদৃষ্ট)। প্রশাসন ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত মহিলাদের অবস্থান (সারণী ২.৫ ও ২.৬) বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, পরিকল্পনা একটি দেশের উন্নয়ন দলিল হিসেবে বিরাজ করে, সেখানে নারী উন্নয়নে নারীর অবস্থান সংহত ও সুসংগঠিত করতে পরিকল্পনায় নারীদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য্য। নারীর সমস্যা উত্তরণে নারীর সিদ্ধান্তকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এখানে পুরুষ কর্তৃক পরিকল্পনায় নারীর স্বার্থ আদৌ রক্ষা করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে পরিকল্পনা কমিশনে দেখা যায় যে, নারী শুধুমাত্র ৪জন প্রথম শ্রেণীতে কর্মরত আছেন। অন্যদিকে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে নারী সচিব পদে ১ জন, অতিরিক্ত সচিব পদে ১জন, যুগ্মসচিব ৫জন, উপসচিব ৮জন কর্মরত আছেন।সুতরাং নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতির স্বল্পহার নারী উন্নয়ন নীতিমালায় কোন সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে না। প্রকল্প প্রণয়ন ও নীতিমালা নির্ধারণে পুরুষের প্রাধান্য থাকায় নারীর সমস্যার আশাপ্রদ সমাধান নারীর উন্নয়নে উত্তোরণ হচ্ছে না বলে ধরা যেতে পারে। একজন নারী তখনই স্বাধীন হয় যখন সে মনে করবে, "হ্যাঁ, আমি স্বাধীন!

সারণী - ২.৫ ঃ- প্রশাসনে উচ্চ পর্যায়ে নারী

উদ	পুরুষ	নারী	মোট	শতকরা
সচিব	৫৩	১	৫৪	১.৯%
অতিরিক্ত সচিব	৫৯	১	৬০	১.৭%
যুগ্ম সচিব	২৫৭	৫	২৬২	১.৯%
উপসচিব	৬৫৮	৮	৬৬৬	১.২%

উৎস ঃ- আবেদা সুলতানা, ক্ষমতায়ন ১৯৮, উইমেন ফর উইমেন, পৃ:- ৫৭০.

সারণী - ২.৬ ঃ- পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত নারী

শ্রেণী	পদ	কর্মরত নারী	মোট নারী
প্রথম শ্রেণী	সিনিয়র জুনিয়র	১৭ জন ২৫ জন	৪২ জন
দ্বিতীয় শ্রেণী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	৩ জন ৪ জন	৭ জন
তৃতীয় শ্রেণী	টেনো কাম সহকারী অফিস সহকারী ও মুদ্রাক্ষরিক	৫ জন ৬ জন	১১ জন
৪র্থ শ্রেণী	ঝাড়ুদার, পিয়ন	১৫ জন	১৫ জন

উৎস ঃ- পরিকল্পনা কমিশন থেকে গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত, ১৫ই জুলাই, ২০০১

Dhaka University Institutional Repository

আমি তাই করতে পারি যা আমি চাই এবং এখানে আইন আছে যা আমাকে সাহায্য করে" সামিনা সিদ্দিক, বাংলাদেশ অবজারভার, মে ১৬, ২০০১. আর এ জন্য দরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান-এর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা; নারীর স্বার্থ ও সমস্যাকে জাতির স্বার্থ ও সমস্যার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা এবং নারী উন্নয়ন, পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য মাত্রা হিসেবে গ্রহণ করার পক্ষে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা।

উপসংহার ঃ-

উন্নয়নের প্রায়োগিক মডেল আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'বীক্ষণ' বা স্বপ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে উন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্যসমূহ এবং অর্জিত উন্নয়ন সাফল্যের তারতম্য 'বীক্ষণ' বাস্তবায়ন মাত্রার তারতম্যেরই প্রতিফলক। কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত বাস্তবায়ন ক্ষমতা সরকারের ধরণের (Form of Government) উপরে যেমন কিছুটা নির্ভরশীল তেমনই সরকারে 'বীক্ষণ'-এর চরিত্র এবং নির্ধারিত 'নীতিমালা'-র উপরেও রাষ্ট্রের বাস্তবায়ন ক্ষমতা অংশতঃ নির্ভর করে। আবার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসমূহ, আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, একটি অনুকূল ব্যক্তিস্বার্থের উপস্থিতি ইত্যাদি শর্তের দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সুতরাং 'বীক্ষণ'-এর পক্ষে এসব শক্তির সমর্থন প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, এগুলো কার্যকরী শক্তিতে পরিণত হয় সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।

"আজকের যুগে উন্নয়ন নিশ্চিতভাবে বহুবিধ আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক শক্তি ও তাদের পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়তার উপর নির্ভর করে এবং পরিকল্পনার স্বরূপ ও প্রকৃতিও নির্ভর করে কোন খাতে এ শক্তিগুলোকে প্রবাহিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে। এটা আজ দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, কোন একটি অনুন্নত দেশে কোন দিকে এ শক্তিগুলোকে চালিত করা হবে এবং সে প্রেক্ষিতে কি ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে, তা' পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে সে দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের শ্রেণী চারত্র ও তাদের ক্ষমতার উৎসের উপর। রাষ্ট্র যন্ত্র যদি গণপ্রতিনিধিত্বশীল হয় তা'হলে নিশ্চিতভাবে দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা গণমুখী হবে এবং তা' জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নতকরণে সক্ষম হবে।"[৩৫] কিন্তু গত তিন দশক ধরে ধীরে ধীরে 'বাংলাদেশের উন্নয়ন বীক্ষণটি (সমাজতন্ত্র, রাষ্ট্রীয় খাতের প্রাধান্য প্রভৃতি যা গণমুখী ছিল) ক্রমাগত বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। এই প্রক্রিয়ার পেছনে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা।'[৩৬] বিদেশী অর্থভিত্তিক প্রকল্প চালু হওয়ায় দরুণ বাংলাদেশ সরকারের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলোর প্রতি আদৌ কোন সুবিচার করা হয় না। প্রকল্পের চাপে ও ভীড়ে সেই অগ্রাধিকারগুলো হারিয়ে যায় এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় দাতা গোষ্ঠীর সক্রিয় প্রভাবই নির্ধায়ক প্রভাবে পরিণত হয়। তাই দেখা যায় যে, অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের মতো নারী উন্নয়ন বিষয়টিও বৈদেশিক দর্শনভিত্তিক

Dhaka University Institutional Repository

এবং প্রকল্প ভিত্তিক। একারণে নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ সমগ্র নারী সমাজের উন্নীতকরণের জন্য প্রস্তুত হয়নি এবং এইসকল কার্যক্রমসমূহ যথাঃ-

১। স্বাস্থ্য সেবা বলতে নারীর গর্ভধারণ জনিত বিষয় সংশ্লিষ্ট;

২। আর্থিক উন্নয়নে (দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী) প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যা হাঁস-মুরগী, গবাদী পশু পালন প্রভৃতি বিষয় সংশ্লিষ্ট;

৩। শিক্ষাকে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার মধ্যে সীমিত;

৪। ঋণ সহায়তা;

৫। ভিজিডি কার্ড প্রবর্তণ - প্রভৃতি যা নারী সমাজের উন্নতির জন্য প্রবর্তণ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিটি নারীর আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার জন্য গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ হতে পারে না। এগুলো নারীর অধঃস্তন অবস্থান পরিবর্তন করে না, নারীর সমস্যা সমাধান করে না।

সুতরাং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনপ্রশাসনিক জনমালিকানার গণপ্রতিনিধিত্বশীল পরিকল্পনার প্রয়োজন। এর কাঠামো, পরিধি, মাত্রা, অগ্রাধিকারকে জনগণকে নিয়েই করতে হবে। যে মডেল উন্নয়ন ধারণায় প্রাথমিক ও আবশ্যিকভাবে মানুষের কল্যানকে নিয়েই কর প্রণীত হবে এবং সে সঙ্গে উন্নয়নের সফল উদ্যোগ নিশ্চয়তার সাথে নারী উন্নয়নকে সত্যিকার উন্নয়নে পরিণত করা যাবে যেকানে বিদেশী ধারণায় নয়, দেশীয় ধারণায়, দেশীয় সমস্যায় তার সমাধান দেশীয় প্রেক্ষাপটে হবে। এবং নারীর উন্নয়ন নীতিমালায় নারীর জন্য তৈরী প্রকল্প, কর্মসূচী প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে হবে। তা'না হলে পরিকল্পনা হবে গতানুগতিক, লোক দেখানো, গ্রন্থ সর্বস্ব এবং ব্যক্তি বিশেষ ও বিদেশীদের ইচ্ছার দলিল।

তথ্যসূত্র ঃ

*১ কাজী খলীকুজ্জামান আহম্মদ;বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক বিকাশ: পথের সন্ধানে, ঢাকা, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ:- ৯৮.

*২ এম. খোরশেদ আলম; 'বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা - প্রাসঙ্গীকতা, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি', ঢাকা, বুক বিউটি, মে ১৯৯৭, পৃ:- ১.

*৩ প্রাগুক্ত, পৃ:- ২.

*৪ প্রাগুক্ত; পৃ:- ৩.

*৫ আনু মোহাম্মদ; 'বাজেটঃ পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন', ঢাকা, হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ:- ৯৪.

*৬ এম. খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ:- ২.

*৭ প্রাগুক্ত, পৃ:- ৩.

*৮ বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯০, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, পৃ:- ১০.

*৯ এম. খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ:- ২৭.

*১০ এম. খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ:- ৩০.

Dhaka University Institutional Repository

*১১ মোস্তফা হাসান ও মো: আবুল হোসেন; প্রাগুক্ত, পৃ:- ৯২.

*১২ মোহম্মদ আসাদুজ্জামান; প্রাগুক্ত, পৃ: ১০১-১০২.

*১৪ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭.

*১৫ এম, খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭.

*১৬ সেলিম জাহান; 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : প্রসঙ্গ কথা' উন্নয়ন বিতর্ক, সংখ্যা ৮৭, পৃ:- ২২.

*১৭ সৈয়দ শওকতুজ্জামান, 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা', শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ:-২৯১.

*১৮ ড: সেলিম জাহান, 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা - প্রসঙ্গ কথা', প্রাগুক্ত, পৃ: ২১-২৯.

*১৯ এম. খোরশেদ আলম; 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন : পারস্পারিক সম্পর্ক' অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা 'সেন্টার ফর পলেসি ডায়ালগ, ইউনিভার্সিটি প্রেস।

*২০ প্রাগুক্ত, পৃ: - ২৬.

*২১ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০.

*২২ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১.

*২৩ মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং অন্যান্য, 'নারী-রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ', সনিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০, পৃ: ২.

*২৪ Rehman Sobhan , "The Crisis of External Dependence : The Political Economy of Foreign and to Bangladesh", University Press Ltd, Dhaka, 1982.

*২৫ মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩.

*২৬ এম. এম. আকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১.

*২৭ ড: নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা', টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ: ২০.

*২৮ এম. এম. আকাশ, 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন', প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪.

*২৯ ড: নাজমা চৌধুরী, 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ : প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', 'নারী ও রাজনীতি', উইমেন ফর উইমেন; পৃ: ১৬.

*৩০ ট্যাস্কফোর্স প্রতিবেদন; ১৯৯২, প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬.

*৩১ রাশেদা আখতার, 'উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও : গ্রামীন নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন; একটি গু-তাত্বিক আলোচনা', ক্ষমতায়ন সংখ্যা-১;'৯৬; পৃ: ১.

*৩২ মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য; ''নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন, মতাদর্শ'', সনিকে ১৯৯০; পৃ: ৪.

*৩৩ মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য; ''নারী ঃ রাষ্ট্র, উন্নয়ন, মতাদর্শ'', সনিকে ১৯৯০; পৃ: ৭.

*৩৪ সংকলন ও গ্রন্থনা; উপকরণ উন্নয়ন ও পলিসি ও এডভোকেসী উন্নয়ন পদক্ষেপ; পৃ: ১৮.

*৩৫ ড: সেলিম জাহান, 'উন্নয়ন ও পরিকল্পনা': প্রসঙ্গ কথা, উন্নয়ন বিতর্ক, সংখ্যা ১, ১৯৮৭; পৃ: ৩১.

*৩৬ এম. এম. আকাশ, শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন : পারস্পারিক সম্পর্ক, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পর্যালোচনা; প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.১ উন্নয়ণ ধারণা

৩.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন

৩.৩ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্রমবিবর্তন ধারণা

৩.৪ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাত্রা

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার

৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিকরণ

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক পরিকল্পনা, সংশ্লিষ্ট দেশটির জন্য সবচেয়ে বেশী ফলপ্রসূ উন্নয়নের পথ নির্দেশ করে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে উন্নয়ন পরিকল্পনা একটি ধারণা হিসেবে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বে অংকুরিত ও পল্লবিত হয়েছিল। উন্নয়নবিদরা তখন ভেবেছিলেন যে পরিকল্পনার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণের দ্বারা সর্বজন ইপ্সিত একটি সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 'বাজার নয় পরিকল্পনা' (Not Market but buy planning) এই শ্লোগান মুখরিত হয়েছিল। কিন্তু সত্তরের দশকে দেখা গেল যে, পরিকল্পনা তার প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। দারিদ্র, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা, ব্যাধি, ভূমিহীনতা, সামাজিক অবিচার, দুর্বল শ্রেণীর উপর অন্যায় অত্যাচার কমেনি বরং আপেক্ষিকভাবে বেড়েছে। মূলধন গঠন ও প্রবৃদ্ধি বাড়াতেও সক্ষম হয়নি। অসমতা বেড়েছে। ফলে পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।[*১]

আশির দশকে পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। প্রবৃদ্ধি থেকে উন্নয়ন, সেখান থেকে সুষম প্রবৃদ্ধি (Equitable Growth), দারিদ্র অধিশ্রায়িত উন্নয়ন (Poverty Focused Development), মৌলিক পরিবর্তন চরিতাথকরণ (Fulfilment of Basic Needs), স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা (Local Level Planning), গণ-অংশায়ন প্রবৃদ্ধি থেকে আজ মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human Resource Development) পরিকল্পনায় বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ও উন্নয়নের বিভিন্ন মাত্রা যোগ হতে দেখা যায়। যাই উন্নয়ন মাত্রা প্রাথমিক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণের মধ্যে সীমিত ফলে মানব সম্পদ উন্নয়ন শব্দটিতে লক্ষ্য করা যায় এর যথার্থ ব্যবহার ঘটেনি। এপ্রসঙ্গে Gunner Myrdal - বলেন, 'দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে সরকারী পরিকল্পনায় সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থাকে। কিন্তু উন্নয়নের অধিকাংশ সুফল গরীবের দুয়ারে পৌছায় না।' এই পর্যালোচনা করেন ষাট দশকের মাঝামাঝি, কিন্তু তার এক দশক পরও ডেনিশ গুলেট (Denis Goulet) উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে এই একই উপসংহারে উপনীত হন।[*২]

৩.১ উন্নয়ন ধারণা ঃ-

মানুষের জন্য দীর্ঘ, সুস্থ, সৃষ্টিশীল ও অর্থবহ জীবন উপভোগের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলাই ছিলো অতীত যুগের দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদদের কাছে উন্নয়নমের মূল লক্ষ্য।[*৩] পরবর্তীতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, বর্ধিত মাথাপিছু আয় বা জাতীয় আয়, ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্যতা প্রভৃতির দরুণ উন্নয়নের প্রেক্ষাপট হারিয়ে যায়। এর ফলে গত অর্ধ-শতাব্দী ধরে চলে আসছে বিশ্বব্যাপী গণ-দারিদ্র, বৈষম্য-বঞ্চণা, পরিবেশ বিপর্যয়। তখন এই উন্নয়ন নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। ইতিহাস তাই একবিংশ শতাব্দীর অগ্রগতিকে বিচার করছে,

Dhaka University Institutional Repository

জনগণের নিজেদের মধ্যে কিংবা জাতি-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমান সুযোগ-সুবিধাপাচ্ছে কিনা? মানুষকে পাশ কাটিয়ে যে উন্নয়ন সে উন্নয়ণের সুফলে বৃহত্তর মানুষের কোন কল্যাণ বয়ে আনছে না। তাই বর্তমানে উন্নয়নের বস্তুগত প্রবৃদ্ধি থেকে সরে এসে উন্নয়ন ধারায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব কল্যাণ, মৌলিক চাহিদাপূরণ ইত্যাদি ধারণাকে প্রাধান্য দেয়া শুরু হয়েছে। ফলে আজ 'উন্নয়ন'-এর একটি মোটামুটি ও আপাত গ্রহণযোগ্য সংগা নিরুপণ করা সম্ভব হয়েছে যে, 'প্রবৃদ্ধিসহ সমতা' (Growth with Equity) কিংবা 'সমতাপূর্ণ প্রবৃদ্ধি'-ই হচ্ছে উন্নয়ণ।"[৪]

উন্নয়নের ক্রমবিবর্তন ধারণা

সমাজ চিন্তার বিকাশ ধারায় সুখী-সমৃদ্ধ মানব জীবন লাভ, সামাজিক বিবর্তন ও উর্দ্ধমুখী পরিবর্তন এবং রাষ্ট্রীয় অগ্রগতি ও জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধিকে নিয়ে উন্নয়ন ভাবধারা পরিপুষ্টি লাভ করলেও চল্লিশের দশকের শেষ লগ্নে বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতির ব্যাপকতর পরিবর্তন জনিত পরিস্থিতিতে উন্নয়ন অধ্যায়ন একটি আলাদা আঙ্গিকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার গঠন প্রকৃতি, মানবীয় চাহিদা ও ক্ষমতা প্রসঙ্গ, রাষ্ট্রীয়নীতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন উন্নয়ন ব্যাখ্যায় বিশেষ গুরুত্ব পায়।"[৫]

গতানুগতিক অর্থনৈতিক তত্ত্বে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের (জি.এন.পি.) বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হিসেবে অভিহিত করা হতো। কিন্তু উন্নয়ন ধারণায় এখন যুক্ত হয়েছে অনেক মাত্রা এবং উপাদান।

অর্থনীতিতে উন্নয়ন বিষয়টি সনাতন, নব্য সনাতন, সুম্পিটার ও ফিন্‌স ও কীনসোতোর মডেল এবং স্তরভিত্তিক উন্নয়ন ও মার্কসীয় মতবাদ-এ বিভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। শাস্ত্রীয় অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীক ধারণা এ প্রপঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে।

পাশ্চাত্যদেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ ধারার আলোকে ১৭৭৬ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত উন্নয়নের যে সনাতন ধ্যাণ-ধারণা গড়ে উঠে তাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বস্তুগত সমৃদ্ধি অর্জন হচ্ছে মূল কথা। এক্ষেত্রে মোট জাতীয় আয়, মোট পুঁজিগঠন ও বিনিয়োগ, শ্রম নিয়োগ ও মজুরী এবং মোট প্রবৃদ্ধি এবং অবাধ বাজার ব্যবস্থা ছিল আলোচ্য বিষয়।"[৬]

কিন্তু বাস্তবে তৃতীয় বিশ্ব বা দারিদ্রপীড়িত দেশসমূহের অভিজ্ঞতায় একথা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিমূলক সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন প্রয়াসে সমাজে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি আসলেও সাধারণ মানুষের জীবন মানের অবস্থা প্রায় অপরিবর্তিত থেকে গেছে। এত চরম দারিদ্র সীমান নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং বেকারত্ব ও আয় বন্টনের অসমতা ব্যাপকহারে হয়েছে।"[৭]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতায় সনাতন প্রবৃদ্ধিমুখী যে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় তার বিপরীতে ১৯৭০ এর দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাংকের পৃষ্টপোষকতায় মাহবুবুল হক, পল স্ট্রিটেন, জেমস গ্রান্ট প্রমুখ অর্থনীতিবিদ এক নতুন তত্ত্ব হাজির করেন । 'মৌলিক চাহিদা'-র (Basic Need) নামে এ তত্ত্বের মূল কথা। 'সব মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণই হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন'।[৮]

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিযোগী নয়। এদের প্রার্থক্য হলো প্রথমটি উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মধ্যে সীমিত; আর দ্বিতীয়টি মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণকে বিবেচনায় আনে।[৯] ১৯৭৬ সালে World Employment Conference - এ International Labour Organization (ILO) মৌলিক চাহিদা তত্ত্বের সঙ্গে আরো কিছু মাত্রা যোগ করে নতুন এক তত্ত্ব হাজির করে। Basic Human Needs - নামে এই তত্ত্বে - মানুষের জন্য পুষ্টি, মৌলিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, গৃহায়ন ইত্যাদি সুবিধাদি সৃষ্টি করাই উন্নয়ন বলে অভিহিত করে।

১৯৭৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক Overseas Development Council – এর উদ্যোগে মরিস ডেভিস মরিস উন্নয়নের এক নতুন ধারণা দেন - যা জীবনের ভৌত মানসূচক (Physical Quality of Life Index - PQLI) হিসেবে পরিচিত। তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত। যথা : ১। মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল,

২। শিশু মৃত্যুর হার এবং

৩। শিক্ষার হার।[১০]

আশির দশক থেকে দারিদ্রের ব্যাখ্যায় মানবীয় মৌলিক প্রয়োজন ধারণা আরো অর্থবহ ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হতে দেখা যায়। এ সময়ে অমর্ত্য সেন বলেন, 'আসল প্রশ্ন মানুষ কতোটা সুস্থ, সুন্দর জীবন যাপন করতে পারছে। জীবন ধারণের অবস্থায় কোন নির্দিষ্ট সুফল প্রাপ্তির জন্য সমাজ, সংস্কৃতি, সুস্বাস্থ্য প্রভৃতি নানান ধরণের দরকার হতে পারে। জীবনযাত্রায় মানের গুরুত্ব জীবন-ধারণের মধ্যে, পণ্যের মধ্যে নয়।'[১১] সুতরাং তাঁর মতে, উন্নয়ন হলো এমন এক প্রক্রিয়া যা সমাজে মানুষের জীবন যাপনে বিবেচিত হওয়ার মতো 'সক্ষমতা' ও 'স্বত্ব' লাভকে প্রসারিত করে।[১২]

১৯৯০ সালে ইউএনডিপি-র উদ্যোগে পাকিস্তানের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হক উন্নয়ন সূচকের এক নতুন ধারণা দেন - যা মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index - HDI) নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করেছে। HDI - তিনটি সূচক নিয়ে গঠিত, যথা:- ১। মানুষের গড় আয়ুষ্কাল,

২। শিক্ষার হার এবং

৩। ক্রয় ক্ষমতা (প্রকৃত মাথাপিছু আয়)।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে HDI - পরিমাপ করা হচ্ছে অনেক উপাদানের সমন্বয়ে, যথা:- আয়ুষ্কাল, শিক্ষা, খাদ্য ও পুষ্টি, আয়, মহিলা ও শিশুদের অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থা।[*১৩]

সুতরাং ৮০-র দশক থেকে উন্নয়ন ধারণায় সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়েছে এবং মানুষের প্রত্যাশায় প্রশ্নটি গুরুত্ব পেয়েছে। ৮০-এর দশকের পথ ধরেই ৯০-এর দশকে উন্নয়নে মানব প্রসঙ্গ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া শুরু হয়। এ দশকের

সূচনায় ইউএনডিপি সর্বপ্রথম মানুষের উন্নয়নকে উন্নয়নের পরিচয়বাহী রূপে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়।

"অতএব জনসাধারণের সক্ষমতার বিকাশেই উন্নয়ন। মানুষের সক্ষমতা নির্ভর করে তার স্বত্ত্বাধিকারের উপর অর্থাৎ কি পরিমান দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রীতে সে তার স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে তার উপর" - অমর্ত্য সেন।

UNDP ১৯৯৩ সালে মানুষের উন্নয়নকে আরও অর্থবহ করে বলে, "Development is development of people, for the people, by the people ।"[*১৪]

৩.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ-

ইদানিংকালে মানব সম্পদ উন্নয়নের বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা শুরু হয়েছে। শুধু মাথাপিছু আয় নয়; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সংস্থান ইত্যাদি দিয়েও পরিমাপ করা হচ্ছে দেশের অগ্রগতিকে।১৯৯৭ সালে দক্ষিণ এশিয়ায় মানব উন্নয়ন 'রিপোর্ট অন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইন সাউথ এশিয়া'-র মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে মাগবুব উল হক বলেন, "এখন একটি বিষয়ে ব্যাপক মতৈক্য হয়েছে, তা'হলো উন্নয়নের লক্ষ্য শুধু আয় বাড়ানো নয় বরং মূল লক্ষ্য হলো জনগণের পছন্দের তালিকাকে বিস্তৃত করা। যে সব পছন্দের মধ্যে থাকবে উপযুক্ত মানের শিক্ষা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ভালো স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, সামাজিক অংশগ্রহণ, পরিবেশগত নিরাপত্তা এবং মানুষের ভালো থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আরো নানা ক্ষেত্র। সচেতন জাতীয় পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে বিকাশ ও মানব জীবনের মধ্যে একটি যোগসূত্র গড়ে তুলতে হবে।"[*১৫]

গত তিন দশকে বিশ্ব প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, শিল্পসহ মানব সক্ষমতা, সামর্থ এবং জীবন যাত্রার মানে ঐক্যমত্যের অগ্রগতি সাধন করেছে। আজকে মানুষ দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন যাপন করছে। তথাপি দু'টি প্রধান বিষয় এর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করছে। যথা:-
১। অপেক্ষাকৃত দারিদ্রের মাঝে সম্পদ, সুযোগ ও সামর্থকে সমহারে বন্টন নিশ্চিত করা। ২। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানব সম্পদ উন্নয়ন।[*১৬]

এ প্রসঙ্গে মানব উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন নিয়ে যে জটিলতা রয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

মানব উন্নয়ন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ

কিছু সংস্থা এবং কোন কোন লেখক মানব উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের মাঝে প্রার্থক্য তৈরী করেছে বলে T. V. RAO উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, তাঁদের মতে, মানব সম্পদ উন্নয়ন থেকে মানব উন্নয়ন একটি বৃহৎ এবং সামষ্টিক ধারণা, যেখানে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও তার চাকুরী দানের উদ্দেশ্যে দক্ষতা ও জ্ঞানের উন্নয়নের মধ্যে সীমিত থাকে।[১৭] অন্যদিকে 'মানব উন্নয়ন একটি বৃহৎ ধারণা যেখানে মানবের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও পরিবেশের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।[১৮] তবে এর প্রয়োজন এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ উন্নয়ন প্রসঙ্গে মানব উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নকে ব্যবহার করে থাকে। 'মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান বিতর্ক'-এর সংক্ষিপ্ত ধারণা নিয়ে যার গুড়ার্থ হলো অধিকতর দক্ষতা উন্নয়ন। খুব অল্প সংখ্যক হলেও এর আরেকটি বিতর্ক হলো এর 'Resource' বা 'সম্পদ' শব্দটি নিয়ে যেখানে মনে করা হয় মানুষকে একটি বস্তুগত বিষয় হিসেবে দেখা এবং উন্নয়নের সুফলকারী (Beneficiaries of Development) হিসেবে না দেখে উন্নয়নের যন্ত্র (As Instrument of Development) হিসেবে দেখা হয়।[১৯] এই প্রার্থক্য যতোনা ধারণাগত (Conceptual) তার থেকে বেশী ভাষাগত (Linguistic)।

বিভিন্ন লেখক মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে যে সংজ্ঞা দেন তার উল্লেখপূর্বক বিষয়টি দূর হওয়া সম্ভব। যেমন, "It is the discovery of the Human Resource Development process and the realisation that this single variable of Human Resource Development can account for all other development process."[২০]

আবার "The Development of Human Resourtce is the development of the personality traits of the human beings. The past, present and future of the human beings is entertained with their demographic and socio-economic life."[২১]

যারা মনে করেন যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন মানব উন্নয়নের একটি অংশ এবং এটি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত তা' নিছকই একটি ভুল ধারণা। এটি একাধারে অর্থনীতি, মনোবিজ্ঞান এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে যা পরবর্তীতে আলোচিত হয়েছে। UNESCAP, ILO, CIDA, COMMONWELTH এবং অন্যান্য এরকম কিছু সংস্থাসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাকে প্রাধান্য দেয়। ESCAP অঞ্চলসমূহ কিছু লেখক বৃহৎ অর্থে মানব সম্পদ উন্নয়নকে দেখে থাকেন। T.V. RAO - এর গ্রন্থ "Human Resource Development : Concept and Background" প্রসঙ্গে আলোচনায় যে সব লেখকের সংজ্ঞা উল্লেখ করেছেন তা' নিম্নরূপ ঃ-

Lim Teck Ghee – এর দৃষ্টিতে, "HRD should refer not only to aspects of physical well-being of people such as life expectancy, infant morality, rates of

Dhaka University Institutional Repository

morbidity and levels of nutrition, but also to socio-cultural aspects, including education and employment, social cohesion and stability, political expression, cultural diversity and even ecological harmony. In fact the only dimension of intrinsic value in development is the human dimension in its totality."

Lorraine Corner – এশিয়া প্যাসিফিক -এর প্রেক্ষাপটে বলেন যে, Human resource development is used in thee senses : the first adopts a supply orientation and uses the phrase as a synonym for manpower planning and development. This approach emphasizes the contribution of human capital to economic growth. The second emphasizes 'equality of life' which is considered as an output of development. In this approach HRD is defined as social development particularly at the individual and social level. The third is an integrated view combining the first two approaches and seeking a complementarity between economic and social development."

Bacchus বলেন যে, "The ultimate goal of human resource development is any country is or should be to improve the quality of life of all its people."

অপরদিকে UNDP 'মানব উন্নয়ন' ধারণাকে প্রাধান্য দেয়। তবে সম্প্রতি, UNDP বৃহৎ অর্থে মানব উন্নয়নের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণাকে নির্দেশ করছে।[২৩] মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রসঙ্গে UNDP - এর প্রতিবেদন ১৯৯১ - এ উল্লেখ করেছে যে, "Policies and programs that support and sustain equitable opportunities for continuing acquisition and application of skills, knowledge and competencies which promote individual autonomy and are mutually beneficial to individuals, the community and the larger environment of which they are a part." P-19.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'মানব উন্নয়ন' এবং 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' শব্দ দু'টি ভাষার ব্যবহারজনিত পার্থক্য। মূল বিষয় মানুষ এবং মানুষের উন্নয়ন। উভয়ের মাঝে তার্কিকগণ মানুষের পছন্দের পরিসীমা বৃদ্ধির কথা বলেন যেখানে মানুষ একজন দক্ষ ও সক্ষম মানুষ হয়ে উঠতে পারে এবং যেখানে মানুষ তার নিজের পছন্দের গুরুত্ব উপলব্ধী করে তার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার অংশগ্রহণের ইচ্ছা/অনিহার প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

৩.৩ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্রমবিবর্তনের ধারণা

উন্নয়নে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' এমন একটি যোজনা যার মাধ্যমে উন্নয়ন পদ্ধতির সকল দিকের আলোচনা করতে পারে। অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিতে 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজি, সম্পদ, শ্রম, দক্ষতা ও মজুরী। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে - আচরণ, মূল্যবোধ, উপলব্ধি এবং বুদ্ধিমত্তা। আমার সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, মানব সম্পদ উন্নয়ন হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কের এবং মূল্যবোধের বিনিময়ের প্রয়োজনীয় দিক যা সামাজিক পরিবর্তনকে সম্ভব করে তোলে।[*২৪]

People makes things happen. মানুষ ঘটনা / কার্য তৈরী করে এবং যদি সে তা করতে চায় তার জন্য প্রয়োজন পারিপার্শ্বিকতা এবং আবশ্যিকভাবেই সেই নিজেই এই পারিপার্শ্বিকতা তৈরী করে, তাতে সে ঘটনা বা কাজ তৈরী করতে পারে। 'মানব সম্পদ উন্নয়ন' হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা মানুষকে ঘটনা বা কাজ তৈরী করার সামর্থ করে তোলে। মানুষের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং যোগ্যতার উন্নয়ন এই পদ্ধতির অন্তর্ভূক্ত। যোগ্যতা ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ তার নিজের স্বার্থ ও অন্যের স্বার্থ রক্ষা করে।[*২৫]

জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে যা বোঝানো হয়েছে তা' নিম্নরূপ:-

আন্তঃশাস্ত্রীয় ধারণায় মানব সম্পদ উন্নয়নঃ-

R. JAYAGOPAL, "HRD; Concept Analysis and Strategies" গ্রন্থে সমাজ বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় সমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নকে কিভাবে দেখা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তাঁর মতে, মানব সম্পদ উন্নয়নের বর্তমান ধারণা এসেছে বিভিন্ন শ্রেণীর একত্রীকরণ হিসেবে অর্থাৎ জ্ঞান শাস্ত্রের বিভিন্ন শাখা মানব আচরণ যে আলোচনা করে তারই বর্তমান রূপ হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন। যেমন- সমাজ বিজ্ঞান-এ দল, পরিবার, সমাজ, চাপ প্রয়োগকারী সংস্থা, বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করে আমাদের মানব আচরণ বিষয়ে বিশেষ ধারণা দিয়ে থাকে। বর্তমানে General Sociology এবং বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছে যা শিল্প ও মনোজগৎ সম্মন্ধীয় বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

মনোবিজ্ঞান ব্যক্তি মানুষের মানসিক আচরণকে প্রকাশ করে। এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে শারীরিক আচরণ অর্থাৎ আকাংখা, ইচ্ছা, দক্ষতা। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা, উপদেশদান, দক্ষতার পরীক্ষার জন্য সংশোধনমূলক কার্যক্রম হিসেবে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার হয়ে থাকে। এছাড়াও R. Jayagopal - এর মতে কোন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা সেক্টরে প্রবেশন-কার্য্যক্রম, ট্রেনিং, চাকুরীর যোগ্যতা নিরুপন Job appraisal, মনিটরিং, কর্ম মূল্যায়ন Program Evaluation - এর ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে নৃবিজ্ঞান নানাভাবে আলোচনা করে থাকে। অর্থাৎ নৃবিজ্ঞান মানব ইতিহাস নিয়ে কাজ করে যার মধ্যে রয়েছে ঐতিহ্য, জ্ঞাতিত্ব, সংস্কৃতি, পৌরাণিক এবং বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা। আমরা যদি সামনের দিকে এগোতে চাই তবে নৃ-বিজ্ঞানের উত্তোরত্তর চর্চ্চার প্রয়োজন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জ্ঞান নাগরিককে তার সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে আরো বেশী

Dhaka University Institutional Repository

সামর্থশীল করে তোলে। এর ফলে একজন নাগরিক সামাজিক ক্ষমতা, রাষ্ট্রীয় রাজনীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সরকার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বস্তুগত সম্পদ এবং শ্রম সম্পর্কে ধারণা দেয়। Classical Economist-গণ প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা দিচ্ছে। বর্তমানে যে মানব সম্পদ সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে তার আলোচনা করছে এবং মানুষের আচরণের যৌক্তিকতাদানে চেষ্টা করছে।

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও তার প্রয়োগ, মনিটরিং, ম্যল্যায়ন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত বিষয়সমূহ মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণায় ভূমিকা রাখছে।[২৬]

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক ধারণা

উন্নয়ন সাহিত্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং এর বিপরীতে মানব উন্নয়ন বিষয়টি গত শতাব্দী থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টি ৩টি পৃথক বিষয়ে আলোচিত হয়। যেমন -

১। মানব পুঁজি বিষয়ক (Human Capital Oriented),

২। সমাজ-মনোবিজ্ঞান নির্ভর (Socio-Psychology Based) এবং

৩। দারিদ্র দূরীকরণ (Poverty Driven)।[২৭]

নিম্নে বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো ঃ-

১। মানব পুঁজি ধারণা

১৯৫০-৬০ এর দশকে মানব পুঁজি ধারণা বিকাশ লাভ করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে তখন মানব পুঁজি গঠনকে মানব সম্পদ উন্নয়নের সমান্তরাল হিসেবে দেখা হতো।[২৮] মানব পুঁজির বিষয়টি কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সেই দেশের অধিবাসীদের জ্ঞান ও দক্ষতার সমাবেশকে বুঝানো হয়। বৃহৎ অর্থে মানব পুঁজি হলো উদ্যোগ, সম্পদের পরিপূর্ণতা, অধিক কার্যক্ষমতা, সঠিক মূল্যবোধ এবং অন্যান্য মানষিক গুনাবলী যা ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে তরান্বিত করে।[২৯]

T.V. RAO উল্লেখ করেন যে, মানব পুঁজি বিভিন্ন রকম কার্য্যক্রম নিয়ে গঠিত হয়। তিনি অর্থনীতিবিদ SCHULTZ এর উল্লেখ করে বলেন যে, SCHULTZ মানব পুঁজি ব্যাখ্যায় ৫টি বিষয়ের উপর নির্ভর করেছেন, যেমন- স্বাস্থ্য, চাকুরী-প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী এবং স্থানান্তর। তবে এর সাথে পুষ্টি সংযুক্ত করা যেতে পারে। অন্য দিকে R. JAYAGOPAL - এর মতে, মানব পুঁজি শ্রম সম্পদের গুণগত ও পরিমানগত বিষয়ের ব্যাখ্যা করে। পরিমানগত দিক হচ্ছে, জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বৈশিষ্ট্য, শ্রমশক্তি, দক্ষতা, স্বল্প দক্ষতা

Dhaka University Institutional Repository

এবং অদক্ষ শ্রম সম্পদ। অন্যদিকে গুণগত দিক হচ্ছে, প্রযুক্তি, শিল্প উদ্যোগের সামর্থ, নতুন কিছু করার সক্ষমতা, ঝুকি নেওয়া প্রভৃতি। যদিও সহজে এসব পরিমাপ করা যায় না, কেননা অর্থনৈতিক অবস্থা গুণগত বিভিন্নতাকে প্রভাবিত করে।

২। সমাজ মনোবিজ্ঞান মতবাদ

১৯৬১ সালে "The Achieving Society" নামের বইটিতে David McClelland বিষয়টির আলোচনা করেণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে। তিনি তাঁর বইটিতে উল্লেখ করেণ যে, কোন দেশের শিশুদের সামাজিকরণ প্রক্রিয়া, ভাষা ব্যবহারের প্রকৃতি এবং চিন্তা করার প্রদ্ধতি সে দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনের ভূমিকা রাখে। তিনি ব্যাখ্যা করেণ এভাবে যে, পরিবেশ, পারিবারিক লালন-পালন রীতি, শিশুদের সাথে পিতা-মাতার পারস্পারিক সম্পর্ক, ধর্মীয় ও সামাজিকমূল্যবোধ প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলে যা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে।[৩] T.V. RAO, David McClelland এর ব্যাখ্যায় মূল উৎসকে চিহ্নিত করেছেন মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, পৃ-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানকে। David McClelland বলেন, যারা উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত আছেন তাদের উচিত সেই সকল মূল্যবোধ, উদ্দেশ্য এবং জনগণের ইচ্ছাকে পরিকল্পনাতে অন্তর্ভুক্ত করতে মনোযোগী হওয়া।

৩। দারিদ্র দূরীকরণ

মানব উন্নয়নের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়টি একটি সাম্প্রতিক ধারণা। ১৯৮০ সালের World Development Report-এ বিষয়টিকে মূল বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে বলা হয়, মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজন দরিদ্রদের সাহায্য করা যাতে তারা নিজেরা নিজেদের সাহায্য করতে পারে। অর্থনৈদিক অর্জনে মানব উন্নয়নই একমাত্র এবং প্রাথমিকই নয় বরং ক্ষুধার্ত এবং শিশুমৃত্যু কমিয়ে আনা এবং প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বৈশ্বিকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। (World Bank, 1990, P-32.)

সংক্ষেপে তিনটি ধারণা থেকে মানব সম্পদ উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বেরিয়ে এসেছে, যেমন-

১। মানব পুঁজির ধারণা, মানব সক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে।

২। সমাজ-মনোবিজ্ঞান ধারণাটি, উন্নয়ন পরিবর্তনের কয়েকটি দিক যেমন, প্রেষণা (Motivation), আচরণ (Attitude) এবং মূল্যবোধ (Values) - এর উপর আলোকপাত করে।

৩। যখন মানব পুঁজির গঠনের গুরুত্বকে নির্দেশ করা হয়, তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য কর্মসূচীকে তখন দারিদ্র দূরীকরণ ধারণাটি জনগণের উন্নয়ন এবং এর জন্য দারিদ্র নিরোসনের লক্ষ্যে সরকারের মধ্যস্থতার প্রয়োজনকে প্রস্তাব করে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

মানব সম্পদ উন্নয়নের সাম্প্রতিক ধারণা

নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তার 'জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতি' নামক বইটিতে বলেছেন, ''সম্ভবতঃ সাবেকী উন্নয়ন তত্ত্বের প্রধান তত্ত্বগত ত্রুটি এই যে, এ তত্ত্বে জোড় দেয়া হয়েছে জাতীয় উৎপাদন, মোট আয় এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের মোট সরবরাহের উপর। মানুষের 'স্বত্ত্বাধিকার' এবং সেই স্বত্ত্বাধিকার থেকে পাওয়া ক্ষমতার দিকে নজর দেয়া হয়নি।অর্থনৈতিক উন্নয়নের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সক্ষমতা সৃষ্টি। মানুষ কি করতে পারছে, কী পারছে না, সেটাই উন্নয়ন তত্ত্বের আলোচ্য হওয়ার কথা। মানুষ কি দীর্ঘ জীবন লাভ করছে ? অকাল মৃত্যুকে কি জয় করতে পারছে? তার কি যথেষ্ট পুষ্টির ব্যবস্থা হয়েছে? সে কী লিখতে-পড়তে, পরস্পর চিন্তার আদান-প্রদান করতে শিখছে? সাহিত্য চর্চ্চায়, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পারঙ্গম হয়েছে? উন্নয়ন তত্ত্ববিদদের কাছে এগুলোই হওয়া উচিত ছিল আসল প্রশ্ন। Marx যেমন বলেছিলেন, ''মানুষের উপর অনিশ্চয়তা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের বদলে, অনিশ্চয়তা ও পরিস্থিতিকে নিয়ে আসতে হবে মানুষের নিয়ন্ত্রণে।'' [পৃ:- ৯৪]

অনেক দেরীতে হলেও উন্নয়ন ধারণায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানব কল্যাণ, মৌলিক চাহিদাপূরণ ইত্যাদি ধারণাকে প্রাধাণ্য দেয়া শুরু হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যেমন, The World Bank, The United Nations এবং এর অঙ্গ সংস্থাসমূহ যেমন, UNDP,UNIDO, WHO, ILO, UNICEF, UNESCO, UNFPA, UNESCAP,
আঞ্চলিক সংঘদাসমূহ যেমন ASEAN, SAARC, COMMONWEALTH, NGO'S প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক অগ্রগতিকে উন্নয়ন হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছে। এইসব বিষয়সমূহ হলোঃ- ১। খাদ্য ও পুষ্টি (Food and Nutrition),

২। প্রত্যাশিত গড় আয়ু (Life Expectancy),

৩। স্বাস্থ্য (Health),

৪। শিক্ষা (Education),

৫। আয় (Income),

৬। শিশু মৃত্যুহার (Child Mortality),

৭। দারিদ্র (Poverty)।

অন্যদিকে Permidar Kaur উল্লেখ করেণ যে, মানব সম্পদ উন্নয়নে ৮টি উপাদান আছে, যেমন - ১। খাদ্য ও পুষ্টি (Food and Nutrition),

২। পোশাক (Clothing),

৩। আশ্রয় ও পয়োঃনিস্কাশন (Housing & Sanitation),

৪। স্বাস্থ্য সুবিধা (Health Facilcities),

৫। শিক্ষা (Education),

৬। তথ্য মাধ্যম (Information Media),

Dhaka University Institutional Repository

৭। শক্তি ক্ষয় (Consumption),

৮। যোগাযোগ (Transport)।

এই আটটির মধ্যে তিনি শিক্ষাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। কারণ তাঁর মতে, "Education which creates the disparities in the population in developing their inner potential. Further, it implies that the development of education is basic for the development of the human resources, contribute to the improvement of people by providing the requisite environment where the human being may grow to its fullest stature and realise his fullest potentialities."

মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ আন্তঃর্জাতিক আলোচ্য বিষয় -

United Nations - এরঅধিকাংশ সংস্থাসমূহ মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং এ সম্পর্কে তাদের কিছু প্রস্তাবনা ও নির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কোন কোন সংস্থা তাদের সমস্য রাষ্ট্রের সরকারকে এ বিষয়ে কিছু নীতি ও কর্মসূচী আকারে
পরামর্শ প্রদান করে সাহায্য করে থাকে। এসব নীতি ও পরিকল্পনার কিছু প্রধান বিষয় নিম্নে আলোচনা হলোঃ-

❍ **UNESCP** এবং জাকার্তা কর্মপরিকল্পনা ঃ-

UNESCAP থেকে প্রচারিত ও প্রকাশিত জাকার্তা কর্মপরিকল্পনা যা জাতীয় উন্নয়নের মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রধান প্রধান বিষয়ের আলোচনায় পূণর্ব্যক্ত করে। JPA (Jakarta Plan of Action) এর মতে মানুষের সত্যিকারের উন্নয়ন নির্ভর করে তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে। এটি ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর জন্য ৩টি বিষয়কে চিহ্নিত করে যেমন,

১। চাকুরী এবং মনুষ্য শক্তি (Employment and Manpower) উন্নয়ন যা বৃহৎ আকারে উৎপাদন ক্ষমতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী করবে।

২। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বুঝতে, গ্রহণ করতে, ভূমিকা রাখতে জনগণকে তৈরী করার জন্য JPA দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৩। জীবনমান সম্পর্ক (In relation of quality of life), শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পরিবেশ কর্মসূচী উন্নয়নের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠীকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন মান উন্নয়ন। এছাড়া আরো যেসব বিষয়ের প্রতি JPA গুরুত্বারোপ করেছে তা কর্ম প্রস্তবনা আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ-

JPA ১০৬টি কর্মপ্রস্তাবনা তৈরী করে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো -

মানব সম্পদ উন্নয়নকে সমগ্র উন্নয়ন পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রতিটি দেশে উচ্চ পর্যায়ের নীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ক কমিটি (Bodies) গঠণ করতে হবে।

মানব সম্পদ উনণয়নে বিশেষ আইনে খাচেট তৈরী করা।

Dhaka University Institutional Repository

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, মনিটরিং এবং মূল্যায়নে জনগণের অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচী প্রণয়নের উৎসাহ প্রদান করা।

মানব সম্পদ উন্নয়নের নীতিসমূহের বাস্তবায়নে ব্যক্তিখাত এবং বেসরকারী সংস্থাকে সম্পৃক্ত করা।

মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনায় সুবিধা থেকে বঞ্চিত গোষ্ঠীকে (Disadvantaged Group) চিহ্নিত করে তাদের প্রতি বিশেষ মনোযোগ (Paid Special Attention) দিতে হবে।

নীতি, পরিকল্পনা, কর্মসূচীতে চাকুরী সংক্রান্ত এবং আত্মকর্মসূচী (Self Employment) মূলক কর্মকান্ড উল্লেখ করা উচিত।

সম্ভাবনামূলক অনানুষ্ঠানিক খাতকে (The Potential Of The Inform Sectors) চিহ্নিত করে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় এর ব্যবহার করা।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপযোগিতার মূল্যায়ন বা পরিমাপ করা।

প্রতিটি দেশের উচিত জাতীয় বিষয়সমূহের সাথে মানব সম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচীকে সমন্বিত করে প্রতিষ্ঠা করা।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ Jakarta Plan Of Action (JPA) - এ গৃহীত হয় যা ১৯৯২ সালে জাকার্তার Hawavitharana - এর ESCAP - এর ৬টি উন্নয়নশীল দেশসমূহের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত হয়। মানব সম্পদ উন্নয়নের একটি সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী এই কর্মপরিকল্পনায় গ্রহণ করা হয় যার অর্থ - অর্থনৈতিক ভারসাম্য, মানবপুঁজি ধারণা দ্বারা চালিত এবং সমাজ কল্যাণ - মানব প্রয়োজন ধারণা দ্বারা চালিত হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নের এই মতবাদ নীতি প্রণয়নের একটি নতুন ধারা দাবী করে। কোন কোন দেশ জাকার্তা কর্মপরিকল্পনা দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়নের মতবাদকে গ্রহণ করতে বদ্ধ পরিকর।[৩৪]

❍ UNCDP - এর প্রতিবেদন

The United Nations Committee for Development Planning (UNCDP) মানব উন্নয়ন কর্মসূচীর পরিবর্তে দারিদ্রের উন্নয়নের জন্য সচেতনতা প্রকাশ করে।[৩৫]

UNCDP মানব সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিবেচনা করে। মানব সক্ষমতা উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টির ভূমিকাকে গুরুত্বারোপ করেএবং এর জন্য অর্থনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনকে স্বীকার করে। উক্ত কমিটি মানব সক্ষমতা উন্নয়নে নারী শিক্ষা, জন্মহার, জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতির ভূমিকাকে উল্লেখ করে।[৩৬] এক কথায় UNCDP মানব সম্পদ উন্নয়নে মানব সক্ষমতা গঠনের কথা বলে যেখানে শিক্ষা, নারীশিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জন্মহার প্রভৃতির উন্নয়নের মাধ্যমে তা' অর্জন করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

○ UNICEF – মানবিক পূর্ণবিন্যাসের পর্যবেক্ষণ ঃ-

(The Unicef studies on adjustment with a huamn face) দশটি দেশের উপর UNICEF জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে মানব সম্পদ উন্নয়নের অবহেলা পর্যবেক্ষণ করে কাঠামোগত পূণর্বিন্যাস কর্মসূচীর (Structural Adjustment Programmes) মাধ্যমে। পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৮০ সালের দিকে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক ভাবে শিশুদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার পশ্চাৎপসরণ ঘটে। অনেক দেশে সামাজিক উন্নয়ন উপেক্ষিত হয়েছে অথবা ধীরগতি সম্পন্ন ছিল। পুষ্টি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে স্পষ্টত অবহেলিত হতে দেখা গেছে। গতানুগতিক পূণর্বিন্যাসের ধারায় এই সমস্যাকে চারকি প্রধান বিষয়কে চিহ্নিত করে। যেমন-

১। স্বল্প মেয়াদী চিন্তা (Short Term Horizon),

২। অপর্যাপ্ত অর্থ (Insufficient Finance),

৩। সামষ্টিক অর্থনীতির প্রাধান্য () এবং

৪। সুনির্দিষ্ট চিন্তার অভাব (The Lack of Explicit Consideration)।

উপরোক্ত বিষয়গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে দারিদ্র দূরীকরণে আয় বন্টন এবং বিশেষ গোষ্ঠীকে পুষ্টি ও স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

○ বিশ্ব সম্মেলন ঃ সবার জন্য শিক্ষা (World Conference on Education for All):-

World Bank, UNESCO, UNDP এবং UNICEF – এর সহায়তায় শিক্ষা এবং জ্ঞানের মাধ্যমে 'মানব উন্নয়ন' বিষয়ে ১৯৯০ সালে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের একটি পর্যায়ে অনুভব করে যে কি করে এই জ্ঞানকে ব্যবহার করে জীবনমান উন্নয়ন করা যায়। উক্ত সম্মেলনে মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা এবং জ্ঞানকে প্রাধ্যান্য দেওয়া হয়। এই ধারণায় মানব উন্নয়নকে সত্যিকার উন্নয়ন বলে অনুভূত হয় যার দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ (Social Well-being) উন্নয়নে রূপান্তরিত হয়।[*৩৭]

○ বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ঃ বিশ্বব্যাংক :-

বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯০-এ বিশ্ব ব্যাংক উল্লেখ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানব পুঁজিকে ব্যবহার করা না যাবে সে পর্যন্ত দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব হবে না। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং পুষ্টির উন্নয়ন দারিদ্র দূরীকরণের সাথে সম্পৃক্ত। বিশ্ব ব্যাংক উন্নয়নে ৪টি ভিন্ন বিষয়কে বিবেচনা করে; যেমন-

১। আয়ু (Longevity),

২। শিক্ষা (Literacy),

৩। শিশুমৃত্যুহার (Infant Mortality) এবং

৪। মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯১ এর বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "While recognising that human development stratigies may have to vary from country to country depending on the respective country situation, the 1991 World Development Report identifies the following common goals of human development for the depending countrues; slowing the population growth, improving k\health and nutrition, building technical capability and reducing poverty..... no country can escape the need to make long term commitments and long stratigic national and sectoral decisions regarding human resource development. (World Bank 1990)

○ ইউনেস্কো এবং ইউনিডো ঃ-

UNESCO-র মতে, যে কোন সভ্যিকায়ের উন্নয়নের চাবিকাঠি হলো মানব সম্পদের উন্নয়ন। সবার জন্য শিক্ষা বিশ্ব সম্মেলনের সমস্ত ধারায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের পক্ষে মত প্রকাশ করে।

UNIDO ১৯৯০-৯৫ মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক উদ্দেশ্যে (Primary Objective) প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগ গ্রহণে সক্ষমতা প্রভৃতিতে সামঞ্জস্য আনয়নের মাধ্যমে শিরেপর উন্নয়নে একটি টেকসই ব্যবস্থা গ্রহণে UNIDO উন্নয়নশীল দেশসমূহকে সহায়তা করে থাকে।

কমনওয়েলথ্ সেক্রেটারিয়েট ঃ ভবিষ্যতের ভিত্তি ঃ-

১৯৯১ সালে জিম্বাবুয়ে কমনওয়েলথ সমস্যভুক্ত দেশের সরকার প্রধানগণ মিলিত হন এবং স্বীকার করেন যে, যে কোন টেকসই উন্নয়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণে প্রধানতম বিষয় হচ্ছে মানব সম্পদের উন্নয়নের। তাই একটি সংগঠিত দল (Working Group) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন কৌশল এবং ব্যবহারোপযোগী নির্দেশাবলী (Operationa Guidelines) তৈরী করে।

কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েটের এই কর্মীদল (Working Group) মানব সম্পদ উন্নয়নের যে কৌশল নির্ধারণ করে প্রতিবেদন তৈরী করে তার শিরোনাম ছিলো 'Foundation for the future'। মানব সম্পদ উন্নয়নকে কার্যকর করে তুলতে ৫টি পৃধান কৌশলের পরামর্শ দান করে। সেগুলো হলো:-

১। দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং অধিক পেশাদার সরকার (Well managed and more proffessional Gevernment),

২। বেসরকারী সংগঠন এবং ব্যক্তি খাতের সাথে অংশীদারিত্ব (Partnership with NGO's and the Private Sector),

৩। নারীর অগ্রাধিকার (Priority for Women),

৪। সম্পদের অগ্রাধিকার (Mobilization of Resources) এবং

Dhaka University Institutional Repository

৫। প্রযুক্তির ব্যবহার (Uses of Technology) ।

উক্ত কমিটি মানব সম্পদ উন্নয়ন কৌশলসমূহকে বাস্তবায়নের জন্য দলগত ধারণা (Mission Approach) প্রস্তাব রাখে।

O ইউএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ঃ-

মানব সম্পদ উন্নয়নের গুরুত্বকে অনুধাবন করে ইউএনডিপি প্রতি বছর মানব উন্নয়ণ প্রতিবেদন (Human Development Report - HDR) প্রকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। নিঃসন্দেহে ইউএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন 'উন্নয়ন দর্শন' সম্পর্কিত সংজ্ঞাকে আরো পুষ্ট করেছে। ১৯৯০ সাল থেকে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) প্রতি বছর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশ করে চলেছে। প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৯১) একটি সহজ, সরল কিন্তু সুদূর প্রসারী ঘোষণা নিয়ে উপস্থাপিত হয়। সে ঘোষণায় বলা হয়, "মানুষই হচ্ছে একটি জাতির প্রকৃত সম্পদ। উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো দীর্ঘ, স্বাস্থ্যকর এবং সৃজনশীল জীবন উপভোগের লক্ষ্যে জনগণের জন্য একটি কর্মক্ষম পরিবেশ গড়ে তোলা। . . . মানব উন্নয়ন হচ্ছে জনগণের কাম্য নির্বাচনের পরিসীমা বিস্তৃতি ঘটানোর একটি প্রক্রিয়া।" এই রিপোর্টে মানব উন্নয়ন সক্ষমতা গঠনে ও তার ব্যবহারের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

১৯৯১ সালে UNDP-র দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, এতে মানব উন্নয়ন ধারায় একটি প্রয়োজনীয় বিষয়কে চিহ্নিত করে বলা হয় যে, "Development of the people, for the people and by the people," উন্নয়নে অর্থের চেয়েও রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবকে চিহ্নিত করা হয় এবং এতে জাতীয় বাজেট ও আন্তর্জাতিক সাহায্যকে অন্তভূক্ত করে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়।

১৯৯২ সালের প্রতিবেদনে বিশ্ব বাজার ব্যবহারের ও মানুষের ভবিষ্যত বিষয় আলোচিত হয়। এতে বলা হয়, "Markets may be impressive economically or technically. But they are of little value if they do not serve human development. Markets are the means Human Development is the end." [৩৮]

উক্ত প্রতিবেদনে টেকসই উন্নয়নের জন্য মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্কের আলোচনা করা হয়। এবং বৈশ্বিক তথ্যের ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন বিশ্লেষণ এই প্রতিবেদনে আলোচিত হয়। তার সারাংশ নিম্নে আলোচনা করা হলো -

অর্থনৈতিক বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের জীবনমান উন্নত করতে পারে না, কেননা। "Groeth on its own is not sufficient – it has to be translated into improvements in people lives,

Dhaka University Institutional Repository

Economic growth is not the need of human development. It is one important means... people contribute to growth and groeth contributes to human well being." P-12.

বিশ্ব বাজারে ধনী ও দরিদ্র দেশের অসম অংশীদারের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণ করে। যদি উন্নয়নশীল দেশগুলো এখানে সম-মর্যাদায় অংশগ্রহণ করে তা' তাদের মানব পুঁজি ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অধিক বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়বে। এভাবে সেইসব দেশে উন্নয়ন আসতে পারে।

দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের নীতিসমূহকে প্রভাবিত করা প্রয়োজন।

টেকসই মানব উন্নয়নের নিশ্চিতকরণে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে শিল্প উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের একটি নতুন বৈশ্বিক চুক্তি প্রণয়নের সুযোগ রয়েছে।
মানব উন্নয়ন কোন বিশেষ খাতে (Sector) সীমাবদ্ধ নয়। সামাজিক বা অর্থনৈতিক দিকেও তা' দৃশ্যায়িত নয়। এটি মানব সক্ষমতা উন্নয়নের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়।

যেখানে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ এবং উৎপাদন ও উন্নয়নে কাজ করে তার সক্ষমতার ব্যবহার করতে পারে। [UNDP 1992, P-12]

মানব উন্নয়ন ধারণা সমস্ত কর্মসূচী সংশ্লিষ্ট (Concern of All Activities)- যেমন উৎপাদন পদ্ধতি হতে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, নীতি প্রণয়ন, জনগণ এবং তাদের মঙ্গল কামনা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং এর বন্টন, মৌলিক চাহিদা ও উচ্ছাকাংখা পূরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। "Human Development as a concept is comprehensive, But it is guided by a simple idea – people always come first." UNDP 1992, P-13.

১৯৯৩ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে মানব উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণের ভূমিকার গুরুত্বকে তুলে ধরে। প্রতিবেদনে গণকেন্দ্রিক ৫টি স্তম্ভকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন -

১। মানব নিরাপত্তার নতুন ধারণা (New Concepts of Human Security),

২। টেকসই মানব উন্নয়নের নতুন মডেল (New Concepts of Sustainable Huamn Development),

৩। রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে অংশীদারিত্ব (New Partnerships between States and Markets),

৪। জাতীয় ও বৈশ্বিক সরকারের জন্য নতুন নকশা (New Pattern of National and Global Government) এবং

৫। আন্তর্জাতিক সহযোগীতায় নতুন ধরণ (New forms of International Co-operation)।

১৯৯৪ সালের রিপোর্টের মূল বিষয় ছিলো মানুষের নিরাপত্তা। ইউএনডিপি লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

করেছে যে, বিশ্ব শান্তি কখনো আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মানষের জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া না যায়।মানুষের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় যথা - প্রাথমিক শিক্ষা, অশিক্ষা দূর করা, সকলের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা, পুষ্টিহীনতা দূর করা, পরিবার পরিকল্পনা, নিরাপদ পানীয়, পয়োঃনিষ্কাশন এবং সকলের জন্য ঋণকে বৈশ্বিকভাবে বৃহৎ পরিসরে উক্ত প্রতিবেদনে প্রস্তাব করা হয়।

৩.৪ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাত্রা ঃ-

জগতের সকল সত্ত্বাই যেহেতু পরিবর্তনশীল সেহেতু পরিবর্তনের প্রকৃতি নিয়ে মানুষের চিন্তার শেষ নেই। পরিবর্তন কি ভালোর দিকে না মন্দের দিকে, উন্নতির দিকে নাকি অবোনতির দিকে হচ্ছে, এটি নির্ণয়ের একটি মাপকাঠির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বস্তুতঃ এই মাপকাঠি নির্ণয়ের মাধ্যমে মানুষ দু'টি সমস্যার সমাধান করে থাকে। প্রথমতঃ পরিবর্তনের প্রকৃতি বা গুণ নির্ণয় (অর্থাৎ এটা আদৌ উন্নয়ন না অনুন্নয়ন তা' নির্ধারণ), দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তণের ফলে উন্নয়নের মাত্রা বা পরিমান কতোটুকু হলো তা' নির্ধারণ। দ্বিতীয়টিও জরুরী কারণ একাধিক উন্নয়ন সম্ভাবনার মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয় ছাড়া বাস্তবে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কিন্তু মানব সমাজে এখনো উন্নয়নের গুণবাচক ও পরিমানবাচক মানদন্ডটি নিয়ে কোন ঐকমত্যের সৃষ্টি হয়নি। তাই উন্নয়নের সংজ্ঞা কাল-পাত্র ভেদে একেকজনের কাছে একেক রকম হয়ে গেছে। উন্নয়নকে তাই একটি নৈতিক প্রত্যয় (Normative Concept) হিসেবে মেনে নিয়ে অনেকেই এর যে বিষয়ীগত সংজ্ঞা দিয়েছেন তা' হচ্ছে 'কাম্য পরিবর্তনই হচ্ছে উন্নয়ন'। এই অর্থে 'মানব উন্নয়ন' হচ্ছে 'মানব নির্ধারিত মানবের কাম্য পরিবর্তন'।[*৩৯]

মানুষের কাম্য নির্বাচনী সুযোগের সংখ্যা অসীম এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। কিন্তু উন্নয়নের সকল স্তরে মানুষের এসব সুযোগের মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ৩টি হচ্ছে,

১। একটি দীর্ঘ, সুস্থ্য জীবন উপভোগ,

২। জ্ঞানার্জন এবং

৩। একটি সুন্দর জীবন ধারার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদসমূহের প্রবেশাধীকার।

এর বাইরেও একাধিক সুযোগ রয়েছে যা বহু মানুষের কাছে অত্যন্ত মূলবান। এসব সুযোগ একগুচ্ছ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা থেকে শুরু করে সৃষ্টিশীলতা, উৎপাদনশীলতা, ব্যক্তিগত আত্মসম্মান ও সুনিশ্চিত মানবাধিকার পর্যন্ত বিস্তৃত।[*৪০] এসকল সুযোগ সমূহকে এক করলে মানব উন্নয়নের দু'টো দিক পাওয়া যায়, যেমন-

১। মানুষের সক্ষমতা গঠন এবং

২। তাদের অর্জিত সক্ষমতার ব্যবহার।

মানব সক্ষমতা ঃ

মানব সক্ষমতা বলতে উন্নত স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতাকে বুঝানো হয়। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে, "The completecies also may include with any field; agriculture, industry, science, technology, management, various proffessions (like, medicine, law,

Dhaka University Institutional Repository

engineering and teaching), policies, public, administration, home science, cooking, labour, life communication research and tourism." [৪১] সামর্থকে দল, ব্যক্তি অথবা জাতীয়ভাবে উন্নয়ন করা যেতে পারে। এইসব সক্ষমতা গঠনের মাধ্যমে জনগণ তাদের নিজেদের এবং অন্যের জীবনে সার্থক ভূমিকা রাখতে পারে এবং পছন্দের মাত্রাকে উন্নীত করতে পারে। এইসব পছন্ত থেকে মানুষ তার প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং আরো বৃহৎ পরিসরে তার কল্যাণের জন্য, তার জীবন-যাপন পদ্ধতির উন্নতির জন্য আরো আয়ামদায়ক সুযোগ-সুবিধাকে ব্যবহার করতে পারে। Parmindre Khare -এর মতে, "HRD if taken as total development measn optimam utilization of existing human capabilities – intellectual, technological, entrepreneurial and even moral and creation of new ones."

অর্জিত সক্ষমতার ব্যবহার ঃ-

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল যে, মানুষ ঘটনা তৈরী করে। কিন্তু যখন সে শারীরিকভাবে সুস্থ্য না থাকে তবে সে কোন কাজ বা ঘটনা তৈরী করতে পারে না। শারীরিকভাবে সুস্থ্য বলতে বোঝানো হয়, সুন্দর স্বাস্থ্য যাকে নিরোগ বলা হয়। খাদ্য, পুষ্টি ও রোগ থেকে মুক্তি ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের প্রয়োজন এবং খাদ্যের জন্য আয় করা জরুরী – এ কারণে উন্নত স্বাস্থ্য, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির উপর জোড় দেয়ার কথা বলা হয়।অপরদিকে শিক্ষা ও সামাজিকরণের মাধ্যমে জ্ঞানের উন্নতি ঘটে থাকে। সামাজিক উন্নতি সমাজে বসবাসকারী সমস্যদের জীবন-যাপন পদ্ধতির উন্নতিকরণের উপর নির্ভর করে এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন, জনগণের মতামাতের স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ এবং জীবন-যাপনের জন্য সযোগ-সুবিধাসৃষ্টির মাধ্যমে তাদের বেঁচে থাকাকে সুনিশ্চিত করে। নৈতিক এবং আধ্যাতিক শিক্ষা মানুষকে শান্তি ও শৃংখলা এনে দেয়।

৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার ঃ-

উন্নয়ন চিন্তাবিদ ও তাত্ত্বিকেরা মানুষের সক্ষমতা, মঙ্গল আকাংখার দিক নির্দেশনাকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করার জন্য মানব উন্নয়নের সার্বিক ধারণাকে আরো স্পষ্টীকরণ ও বেগবান করেছেন। অমর্ত্য সেন উন্নয়নকে মানুষের ইতিবাচক স্বাধীনতার (Positive Freedoms) সম্প্রসারিত রূপকে বুঝিয়েছেন। তিনি এর মাধ্যমে ব্যক্তির সক্ষমতা ও স্বত্ত্বাধিকারকে নির্দেশ করেছেন। ব্যক্তির সক্ষমতা হলো জীবনধারণে তার পছন্দপূরণ বা দ্রব্যের ও কর্মের উপর তার স্বত্ত্বাধিকার। এ স্বত্ত্বাধিকার ব্যক্তির জীবনমানকে উন্নত করে। [৪২] Harry Frankfurt মানব জীবনে উন্নয়নের জন্য তার উচ্চ ধাপের আকাংখার জন্য প্রেরণা সৃষ্টির কথা বলেছেন। মানব জাতির আছে ইচ্ছাক্তি যা দ্বারা যে পশুর থেকে পৃথক, এটাই হলো তার দ্বিতীয় ধাপের আকাংখা। এ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা সে তার নির্বাচনী প্রান্তকে বাড়ায়। [৪৩]

এভাবে তাত্ত্বিকদের তত্ত্বের প্রভাবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য UNDP- র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ও বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন দ্বারা উন্নয়নে সামাজিক

Dhaka University Institutional Repository

নির্দেশককে প্রাধান্য দেয়া শুরু হয়। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের সাম্প্রতিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়। এর মাধ্যমে মানব উন্নয়ন নির্দেশক (Human Development Index - HDI) উদ্ভাবিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নিম্মোক্ত ৩টি মূল লক্ষ্যকে পরিমাপ ও বিশ্লেষণ করে প্রকৃত উন্নয়ন পরিমাপক একটি স্কেলে বিভিন্ন দেশের মানব উন্নয়ন অবস্থান নির্দেশ করে। যেমন-

১. আয়ু;
২. স্বাক্ষরতা;
৩. আয়।

উন্নয়নের উল্লেখিত তিনটি লক্ষ্যকে নিম্মোক্তভাবে পরিমাপ করা হয়।

সারণী - ৩.১ মানব উন্নয়নের মূল সূচক

মানব উন্নয়ন নির্দেশক	পরিমাপক
প্রত্যাশিত আয়ু	জন্মের সময় জীবন প্রত্যাশা।
জ্ঞান ও স্বাক্ষরতা	বয়স্ক স্বাক্ষরতা ও স্কুলে অধ্যয়ন সময়ের গড়।
আয়	মাথাপিছু মোট ও আভ্যন্তরীন উৎপাদন।

উল্লেখিত সারণীতে নির্দেশিত সূচক মানব উন্নয়নের মূল সূচক ধরে, এর পাশাপাশি যে সকল বিষয়ের পরিসংখ্যান শুরু য়েছে তা' হলো, জেন্ডার ভিত্তিক উন্নয়ন সূচক, জেন্ডার ক্ষমতায়ন, মনিব উন্নয়নের চিত্র, মানব উন্নয়নের ধারা, উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধান, নগর-গ্রাম ব্যবধান, নারীর ক্ষমতা, নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ।এছাড়াও রয়েছে শিশুর টিকে থাকা এবং উন্নয়ন চিত্র, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষায় ভারসাম্যহীনতা, যোগাযোগচিত্র কর্মসংস্থান, সম্পদ, দারিদ্র ও সামাজিক বিনিয়োগ, সামরিক ব্যয় ও সম্পদ প্রবাহে ভারসাম্যহীনতা, নগরায়নের বিকাশ, জনমিতি চিত্র, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যালেন্স সীট, শক্তি ভোগ, জাতীয় আয়ের হিসাব, সহিংসতা ও অপরাধ প্রভৃতি।[*৪৪] সকল উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশসমূহের জন্য এই সকল সূচকের ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে উন্নয়নকে নির্দেশ করা হয়। সারণী - ৩.২ এ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সূচকসমূহ উল্ল্যেখ করা হলো :-

সারণী - ৩.২ ইউএনডিপি-এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের নির্দেশকসমূহ -

প্রত্যাশিত আয়ু এবং স্বাস্থ্য

১. বাৎসরিক প্রত্যাশিত আয়ু,
২. গর্ভবতীর হার,
৩. জন্মহার,

Dhaka University Institutional Repository

৪. মৃত্যুহার,

৫. মোট জনসংখ্যা,

৬. জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধি হার,

৭. শহরের জনসংখ্যা (মোট শতকরা হার),

৮. শহরের জনসংখ্যার বাৎসরিক বৃদ্ধি হার,

৯. নির্ভরতার অনুপাত,

১০. গর্ভনিরোধক দ্রব্যের ব্যপ্তির অনুপাত,

১১. শিশু মৃত্যুহার,

১২. জন্মকালীন মাতৃমৃত্যু হার,

১৩. পাঁচ বছর নীচে শিশুমৃত্যু হার,

১৪. এক বছরের শিশু টিকা প্রদানের শতকরা হার,

১৫. স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণের শতকরা হার,

১৬. নিরাপদ পানীয়ের সুযোগ (%),

১৭. পয়ো:নিস্কাশনের সুবিধা (%),

১৮. জন্মকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবা,

১৯. ডাক্তার প্রতি জনসংখ্যা,

২০. নার্স প্রতি জনসংখ্যা,

২১. জন্মকালীন শিশু নিম্ন ওজন (%),

২২. দৈনিক ক্যালোরী গ্রহণের সুবিধা (প্রয়োজনের শতকরা হার),

২৩. খাদ্য আমদানীর নির্ভরতার অনুপাত।

শিক্ষা এবং যোগাযোগ

২৪. বয়স্ক স্বাক্ষরতা (%১৫+),

২৫. Mean Years of Schooling (%২৫+)

২৬. বৈজ্ঞানিক / প্রকৌশলী (প্রতি ১০০০)

২৭. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্তির অনুপাত,

২৮. প্রাথমিক বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়ার অনুপাত,

২৯. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভর্তির অনুপাত,

৩০. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির অনুপাত (একসঙ্গে),

৩১. Secondary Technical as % of Secondary.

৩২. উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির অনুপাত,

৩৩. প্রতি হাজারে রেডিও সুবিধা,

৩৪. প্রতি হাজারে টেলিভিশন সুবিধা।

Dhaka University Institutional Repository

আয়

৩৫. জনশক্তি (জনসংখ্যার শতকরা),

৩৬.কৃষিতে জনশক্তি (%),

৩৭. শিল্পে জনশক্তি (%),

৩৮. দারিদ্র সীমার নীচে জনগণ (%),

৩৯. Lowest 40% Households (% Share of Income)

৪০. Lowest 20% (%Share of Income)

৪১. Top 20% Lowest 20% (Ratio)

৪২. GDP per Capita (PPP $)

৪৩. বার্ষিক বৃদ্ধির অনুপাত,

৪৪. বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির অনুপাত,

৪৫. মোট বৈদেশিক ঋণ (ইউ.এস.ডলার - মিলিয়ন),

৪৬. জি.এন.পি-তে মোট বৈদেশিক ঋণের শতকরা হার,

৪৭. মোট সামাজিক বিনিয়োগে বৈদেশিক ঋণের শতকরা হার,

৪৮. জিএনপি-তে মোট ঋণের শতকরা হার,

৪৯. রপ্তনীতে শতকরা ঋণের হার,

৫০. বাণিজ্য নীতি (১৯৮০ = ১০০),

৫১. বর্তমান উদ্বৃত্ত হিসাব,

৫২. শিক্ষাখাতে ব্যয়িত জিএনপি-র শতকরা হার,

৫৩. স্বাস্থ্যখাতে ব্যয়িত জিএনপি-র শতকরা হার,

৫৪. সেনাবাহিনীখাতে ব্যয়িত জিএনপি-র শতকরা হার,

৫৫. সেনাবাহিনীর সাথে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত জিএনপি-র শতকরা হারের অনুপাত।

বৈষম্য (100 = Parity)

নারী - পুরুষ

৫৬. প্রত্যাশিত আয়ু,

৫৭. স্বাক্ষরতা,

৫৮. বিদ্যালয়ের ভর্তির বয়স,

৫৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি,

৬০. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি,

৬১. উচ্চ শিক্ষায় ভর্তি,

৬২.জনশক্তি,

৬৩. সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম - শহর

৬৪. স্বাস্থ্য সুবিধা,

৬৫. পানীয় সুবিধা,

৬৬. পয়ো:নিষ্কাশনের সুবিধা।

যেহেতু মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া এবং এর প্রয়োজনীয়তা শেষ হবার নয়। সেহেতু প্রাথমিকভাবে মানব উন্নয়নের উল্লেখিত সূচকসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিটি দেশের সরকার, সমাজ অথবা গোষ্ঠীর উপর দায়িত্ব পড়ে সূচক সমূহের অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা। সমাজের প্রতিটি মানুষের নিকট উন্নয়নের ন্যূনতম পর্যায়কে পৌঁছে দেয়ার নিশ্চয়তা দেবার দায়িত্ব জাতীয় সরকার ও আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের। এলক্ষ্যে স্বাস্থ্য সম্মতভাবে জীবন ধারণ এবং বেঁচে থাকার জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণ লক্ষ্য হতে পারে। এজন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পুষ্টি, নিরাপদ পানীয়, নিরাপদ পয়োঃনিষ্কাশন ও অন্যান্য স্বাস্থগত সুবিধাদি যা মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক দিক নির্দেশ করে। এর সাথে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচী, প্রাথমিক শিক্ষা, আয়, চাকুরী দান প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে অগ্রাধিকার পেতে পারে। নিদেন পক্ষে এই দ্রুত পরিবর্তিত সমাজে টিকে থাকার জন্য একটি শিক্ষিত জনসমাজ গড়ে তোলা ভীষণভাবেই প্রয়োজন আর এর জন্য প্রয়োজন মৌলিক শিক্ষা যা দক্ষ আয়কর প্রজন্ম গড়ে তুলবে। প্রতিটি মানুষের নিকট মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগসমূহের বিস্তার ঘটানোর দায়িত্ব সে দেশের সরকারের। এই সকল প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে জাতীয় সরকারের নীতি ও কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এর পরে যে, বিষয়ের প্রতি প্রধান্য দেয়া দরকার তা' হলো, মানব সক্ষমতা গঠন এবং তার ব্যবহার (এ বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে)। অর্জিত মানব সক্ষমতার ব্যবহার এ কারনে গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন যে, বাজার ব্যবস্থার বৈশ্বিকরণের সাথে সাথে, জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী হিসেবে পণ্যদ্রব্যের মতো উচ্চ মূল্য পাচ্ছে।[৪৫] জ্ঞান মানব সক্ষমতা গঠনের একটি দিক। এই জ্ঞান তার শিক্ষার উপর নির্ভর করে। যদি একজন সক্ষম মানুষ অর্থাৎ জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন মানুষ তার সক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকাশ ঘটাতে না পারে তাহলে উচ্চমূল্যে বিক্রি হতে পারে। তাই প্রাথমিকভাবে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি সক্ষমতা ব্যবহারের একটি দিক হতে পারে। এছাড়াও রয়েছে সামাজিক, রাজনৈতিক স্বাধীনতা। এভাবে ক্রমান্বয়ে মৌলিক প্রয়োজনপূরণ থেকে শুরু করে ব্যক্তির পছন্দের মাত্রার বিস্তার ঘটানো সুযোগ করে দেয়ার মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘঠতে পারে। এক্ষেত্রে Maslow -এর চাহিদা সোপান (Need Hierarchy) তত্ত্বের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করা যায়, যা নিম্নে ছকের মাধ্যমে আলোচিত হলো।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৩.৩ ঃ Maslow - র প্রয়োজন তত্ত্ব

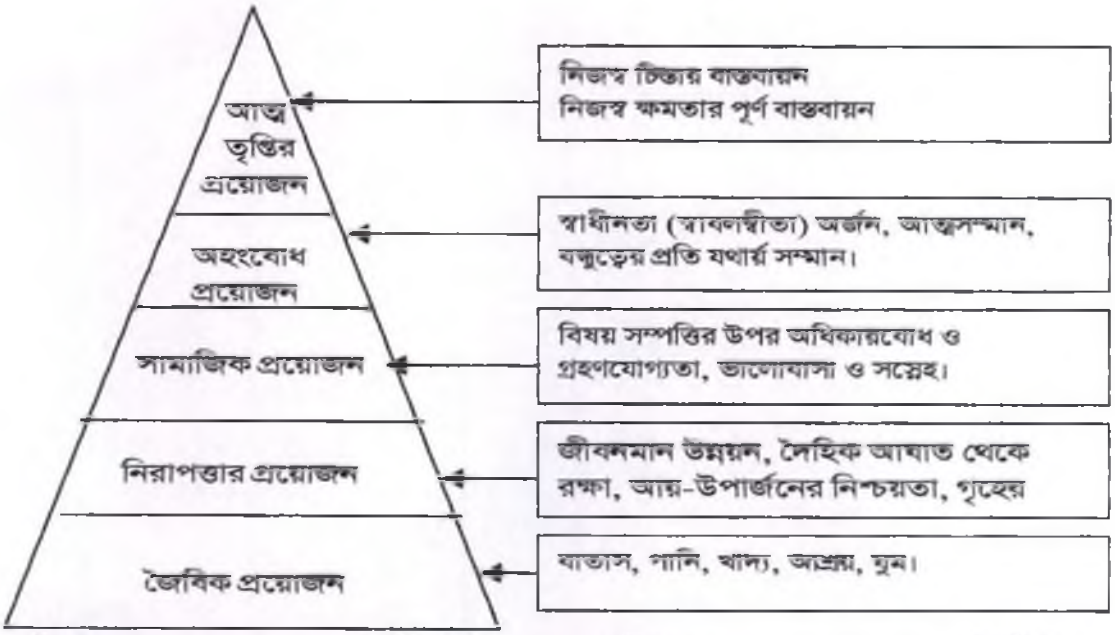

উৎস ঃ মো: কামরুল হাসান কর্তৃক লিখিত - 'মানব উন্নয়ন ধারণার বিকাশ' থেকে সংগৃহীত। সমাজ নিরীক্ষণ/৬৭. সবিকে, পৃ:- ৩৩.

Maslow - র প্রয়োজন তত্ত্বে জীবন মান উন্নয়ন বা () ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। মানব উন্নয়নের দিগন্তকে উপলব্ধী করার জন্য তাঁর এ তত্ত্ব অনেকখানি সহায়ক এবং মানব উন্নয়ন ধারণার দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনমান উন্নয়নের চেয়ে আরো ব্যাপক এবং এক একটি মানবের অফুরন্ত ক্ষমতার পূর্ণ বাস্তবায়নের একটি দীর্ঘ পদক্ষেপ যা এখনো অত্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় রয়েছে। উল্লেখিত ছকে দেখানো হয়েছে যে, মানুষের জীবনে ৫টি প্রয়োজন যা জৈবিক ও মৌলিক প্রয়োজন যথা বাতাস, পানি, খাদ্য, আশ্রয়, বস্ত্র, ঘুম পূরণের পরই অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের প্রশ্ন দেখা দেয়। এবং পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে নিরাপত্তামূলক প্রয়োজন যা জীবন মানকে উন্নত করে। সামাজিক প্রয়োজন যা সম্পত্তির উপর অধিকারবোধ ঐালবাসা, অহংবোধ যা আত্ম সম্মান, স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে এবং সর্বপরি আত্মতৃপ্তি যা নিজস্ব চিন্তা বা ক্ষমতার পূর্ণ বাস্তবায়নের ইচ্ছাকে প্রসারিত করে। এভাবে একক মানুষের ক্ষমতা / সক্ষমতা গঠন করার সুযোগ সৃষ্টি করে সেই ক্ষমতা / সক্ষমতা ব্যবহারের পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৯ Special Contribution -এ Ten Years of Human Developemnt প্রসঙ্গে বলা হয় যে, "Human Development emphasized the need to put people – their needs, their aspirations and their capabilities – at the center of the development effort. And the need to assert the unacceptability of any biases or discrimination, whether by class, gender, race, nationality, religion, community or generation."

Dhaka University Institutional Repository

৩.৬ মানব সম্পদ উন্নয়ন ঃ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

যে কোন ধরণের উন্নয়নকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে রাজনীতির ভূমিকায় পৃয়োজন।কেননা, প্রথমতঃ কোন্ উন্নয়ন নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে – এ প্রশ্নটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। এ প্রশ্নের সাথে মতাদর্শিক সম্পর্ক রয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক। এবং এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রয়েছে রাষ্ট্র, সরকার, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ এবং রাজনৈতিক দল। এই প্রতিষ্ঠানগুলো কিভাবে পরিচালিত হবে তা নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক মতাদর্শ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই রাজনৈতিক মতাদর্শ উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে প্রাধ্যান্য বিস্তার করে যেখানে গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, নারীবাদ, সমতা রয়েছে মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদ/স্বৈরতন্ত্র, পুরুষতন্ত্র বর্তমান বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো –

সারণী – ৩.৪ ঃ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক মতাদর্শ

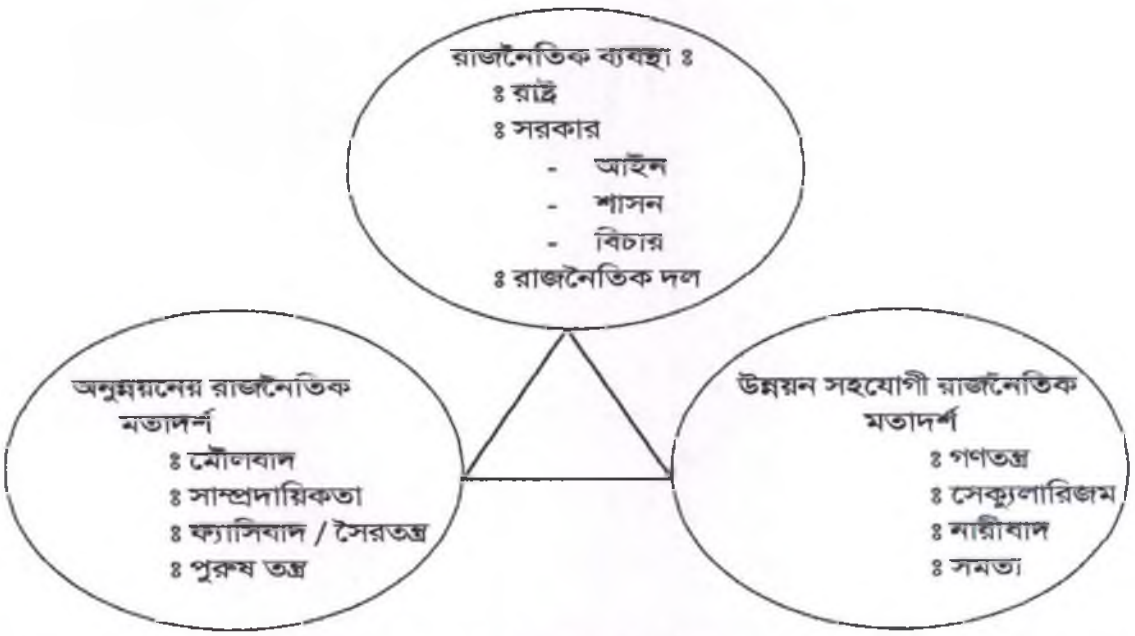

উৎস ঃ চৌধুরী এজাজুল হক, 'অনুন্নয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতি', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫ম বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, পৃ : ২৪.

এ প্রেক্ষাপটে মানব সম্পদ উন্নয়ন সত্যিকারভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকা দরকার যেখানে উন্নয়ন সহযোগী রাজনৈতিক মতাদর্শ বর্তমান। মানব সম্পদ উন্নয়নের তথা মানবিক উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা (সারণী – ২.৩) বিকশিত করতে চাইলে প্রয়োজন,

১। বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষের মুক্তি
২। ইতিবাচক মূল্যবোধের বিকাশ
৩। প্রচেতনীকরণ
৪। ক্ষমতায়ন। এসববিষয়ের বিশ্লেষণে বলা যেতে পারে যে, মৌলিক চাহিদা পূরণ দ্বারা মানুষ বিচ্ছিন্নতা থেকে মুক্তি পেতে পারে। একজন ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষ অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যেজীবন নির্বাহ করে, সেখানে তার জীবন ও স্বপ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। জন্ম থেকেই যখন সে টিকে থাকা, জীবন নির্বাহ করার চাহিদা পূরণের সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন তার মাঝে জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

থাকা, জীবন নির্বাহ করার চাহিদা পূরণের সংগ্রামে লিপ্ত হয় তখন তার মাঝে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সত্ত্বাগুলো বিকশিত হয়না। এই বাস্তবতা তাকে নিরানন্দ, হতাশ, অনুভূতিহীন, যান্ত্রিক মানুষে পরিণত করে। সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সারণী - ৩.৫ ঃ- মানবিক উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা

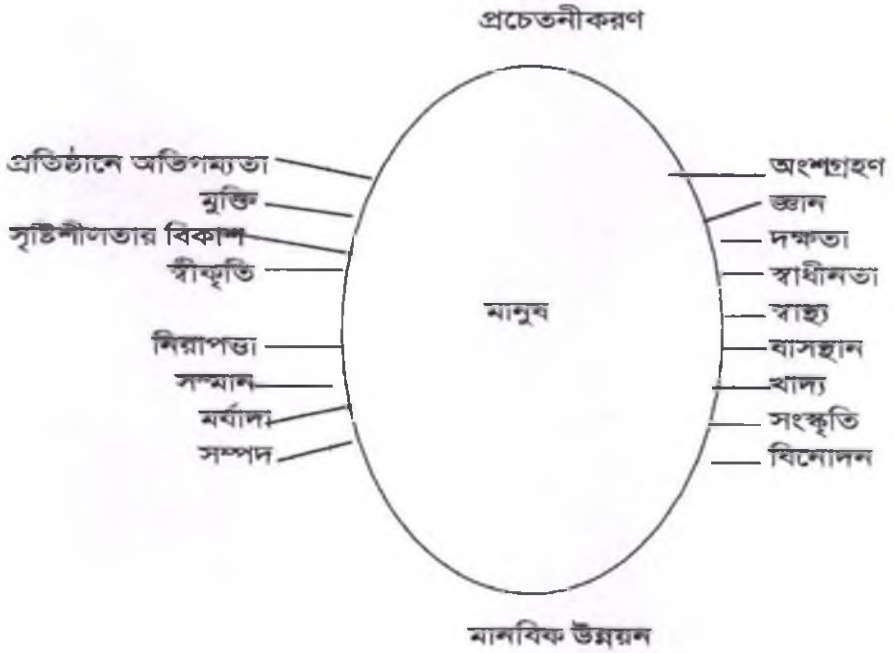

উৎস ঃ চৌধুরী এজাজুল হক, 'মানবিক উন্নয়ন', 'উন্নয়ন পদক্ষেপ', ৪র্থ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, পৃ: ১৯.

ইতিবাচক মূল্যবোধের বিকাশ বলতে বুঝায়, যে মূল্যবোধ সমাজের পরিবর্তনকে ধারণ করে, মানুষের উন্নত জীবন ও বিকাশকে স্বাগত জানায়। এ প্রসঙ্গে মূল্যবোধ হলো যা সমাজ, প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি জীবনে মানুষের কাজকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ আমররা যা গ্রহণ করি (Acceptance), সম্পর্ক স্থাপন করি (Affilition) এবং প্রতিফলন ঘটে (Action) তাই হচ্ছে মূল্যবোধ। **প্রচেতনীকরন** বলতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব অনুধাবন করার শিক্ষা এবং বাস্তবতার বিরাজমান নিপীড়ণকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উদ্দোগ গ্রহণকে বুঝায়। এবং **ক্ষমতায়ন** হলো - জীবন নির্বাহের পাশাপাশি কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজ সম্পর্কিত সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারার নিজ অবস্থা। এই ক্ষমতায়নের রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক - সামাজিক - সাংস্কৃতিক দিক বর্তমান।

উন্নয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছাড়িয়ে যে মানব সম্পদ উন্নয়নের কথা বলা হয় সেই উন্নয়নের কার্যকারীতা বা প্রাতিষ্ঠানিকরণের জন্য প্রয়োজন উন্নয়ন সহায়ক রাজনৈতিক মতাদর্শের। গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, নারীবাদ, সমতা প্রতিটি মতাদর্শই মানুষকে কেন্দ্রে রেখেই পরিচালিত হয় যা মানবিক উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা অর্জনের সহায়ক। অপরদিকে

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, ফ্যাসিবাদ, পুরুষতন্ত্র এর কোন মতাদর্শই মানুষের সমতার কথা বলেনা এর শব্দগত ব্যবহারই বৈষম্যকে চিহ্নিত করে।

তাই যে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল অনুন্নয়নের রাজনৈতিক মতাদর্শ লালন করে সেখানে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি হলেও কখনোই মানুষের সমতা - মানুষের উন্নয়ন অর্জিত হতে পারে না। রাষ্ট্রে অনুন্নয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতি লালিত হলে সেখানে আবশ্যকীয়ভাবে,

- ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পুতুষ্ঠত হবে,
- সাম্প্রদায়িক বৈষম্য সৃষ্টি ও লালন করবে,
- স্বৈরতান্ত্রিক / ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা কায়েম করবে,
- নারী-পুরুষের বৈষম্য সৃষ্টিকারী কাঠামো নির্মাণ করবে।

সুতরাং মানবিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এমন রাজনৈতিক ব্যভস্থা যেখানে রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দল উন্নয়নে গণতন্ত্র, সেক্যুলারিজম, নারীবাদ, সমতার নীতি গ্রহণ ও চর্চ্চা করে।

পরিশেষে আলোচনা করা যেতে পারে যে, 'Human development is the process of enlarging people's choice – not just choice among different detergents, television channels or car models but the choices that are created by expanding human capabilities and functioning – what people do and can do in their lives.'[৬৭] উন্নয়নের প্রতি স্তরে মানব উন্নয়নের জন্য জীবনের বিভিন্ন পছন্দের ক্ষেত্রে এমন কিছু সামর্থ/সক্ষমতার প্রয়োজন ডা সহজলভ্য নয়, যেমন - দীর্ঘ সুস্থ্য জীবন, জ্ঞানার্জন এবং কিছু সম্পদ যার দ্বারা একটি মান সম্পন্ন জীবন যাপন করা যায় যা মানব উন্নয়ন সূচকে প্রতিফলিত। এর বাইরেও রয়েছে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, উৎপাদন ও সৃষ্টিশীলতার সুযোগ, আত্মসম্মআন, মানবাধিকার প্রভৃতি যা অতিরিক্ত পছন্দ হিসেবে মানুষের দ্বারা মূল্যায়িত হয় এবং এই পছন্দের মাত্রা সময়ভেদে পরিবর্তিত হয় কিন্তু মৌলিক চাহিদাপূরণ সবসময় প্রয়োজনীয়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি, নিরাপদ পানীয় সরবরাহ, ভাল চিকিৎসা সুবিধা, শিক্ষা সুবিধা, যোগাযোগ, আশ্রয়, নিয়মিত নিয়োগ, জীবনের নিরাপত্তা, সন্তোষজনক চাকুরী প্রভৃতি সাধারণ অর্থে মানব উন্নয়নকে নিশ্চিত করে এবং মানুষকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে যখন - ভাল নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, চাকুরী জীবনের পছন্দের স্বাধীনতা, চলাফেরা ও কথা বলার স্বাধীনতা, হতাশা-নির্যাতন-শোষণ থেকে মুক্তি, হয়রাণী ও স্বেচ্ছাচারী গ্রেপ্তার থেকে নিরাপত্তা, একটি সন্তোষজনক পারিবারিক জীবন, যথেষ্ট পরিমানে অবসর সময় ও সন্তোষজনক অবসর সময়ের ব্যবহার, সুশীল সমাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রভৃতির সুবিধা প্রদান করা হয় তখন মানব সম্পদ উন্নয়ন ঘটেছে বলে ধরা যেতে পারে মানুষ উন্নয়নের বিষয়সমূহকে মানুষের অধিকার বলা যায় এবং মানব সক্ষমতার বিষয়কে মানসিক অবস্থা ধরা যেতে পারে। এবং মানুষের সক্ষমতা গঠনের জন্য তার অধিকার নিশ্চয়তার সাথে সাথে

Dhaka University Institutional Repository

তার সক্ষমতা পূরণও আবশ্যকীয় এবং কোন পরিকল্পনাবিদ এ সবকিছু অর্জনের নিশ্চয়তা দিতে পারে না কিন্তু এ সকল পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন কার্যকরী নীতি বা কৌশলের, যে নীতি/কৌশল যেকোন সক্ষমতা বা তার ব্যবহারের সুযোগ তৈরী করে দিতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

*১ আনু মোহম্মদ; 'বাজেট ঃ পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন' হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ: ১০৫.

*২ মোস্তফা হাসান ও মো: আবুল হোসেন; পৃ: ১১৯.

*৩ শাহীন রহমান, 'মানব উন্নয়নের চলচ্চিত্র '৯৫' উন্নয়ন পদক্ষেপ ৪র্থ সংখ্যা; পৃ: ৬২.

*৪ প্রাগুক্ত

*৫ সৈয়দ শওকতুজ্জামান; উন্নয়ন ও পরিকল্পনা; উন্নয়ন সিরিজ, শাহানা পাবলিশার্স ; বাংলাবাজার; ১৯৯৭,পৃ:১.

*৬ সৈয়দ শওকতুজ্জামান; প্রাগুক্ত; পৃ: ৮.

*৭ প্রাগুক্ত; পৃ: ৯.

*৮ এম, খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬.

*৯ সৈয়দ শওকতুজ্জামান; প্রাগুক্ত, পৃ: ১০.

*১০ এম, খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬.

*১১ অমর্ত্য সেন, 'জীবন যাত্রার মান ও অর্থনীতি', আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা ৯, পৃ: ৭১.

*১২ সৈয়দ শওকতুজ্জামান; প্রাগুক্ত; পৃ: ১২.

*১৩ এম, খোরশেদ আলম; প্রাগুক্ত; পৃ: ৬৭.

*১৪ জাতি সংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী; 'মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন - ১৯৯২' (বাংলা অনুবাদ), জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, মার্চ ট্ট ১৯৯২; পৃ: ১৫.

*১৫ মনির তালুকদার; 'মানব সম্পদ উন্নয়ন', উন্নয়ন পদক্ষেপ; ১৪ সংখ্যা, ১৯৯৮, পৃ: ৫৬.

*১৬ T.V. RAO " Human Resource Development: Experience, Interventions, Strategies" SAGE Pub, New Delhi, Page: 24.

*১৭ T.V. RAO, OPF, Cit, P-24.

*১৮ মোঃ কামরুল হাসান, 'মানব উন্নয়ন ধারণার বিকাশ' সমাজ নিরীক্ষণ (৬), পৃ: - ৩৬.

*১৯ T.V. RAO, OP, Cit, P-26.

*২০ R. Jayagopal, "Human Resource Development: Conceptual Analysis and Stratigies." Sterling Publication Pvt Lyd, New Delhi,'92.

*২১ Kaur, Parminder, "Human Resource Development for Rural Development", Anmol Publications, New Delhi, 1996.

*২২ প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭.

*২৩ T.V. RAO, "Human Resource Development : Experiences, Interventions, Strategies." SAGE Publication, New Delhi, Page – 24.

*২৪ T.V. RAO, Opt, Cit, P-

*২৫ R. Jayagopal, "Human Resource Development : Conceptual, Analysis and Strategies" Starling Publication. Pvt. Ltd. New Delhi,'90. আর উক্ত বইতে মানব সম্পদ উন্নয়নকে আন্তঃশাস্ত্রীয় আলোচনার মধ্যে সীমিত থেকে ইন্ডিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বিষদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

*২৬ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 31.

*২৭ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 31.

*২৮ R. JAYAGOPAL, Opt. Cit. P-91.

*২৯ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 33.

*৩০ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 32.

*৩১ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 35.

*৩২ Kaur Perminder, "Human Resource Development and Rural Development", Opt. Cit. P-47.

*৩৩ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 42-47.

*৩৪ UNCDP - The United Nations Committee for Development Planning.

*৩৫ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 42-43.

*৩৬ World Conference on Education for all, 1990, P-7.

*৩৭ UNDP, 1992, P-1.

*৩৮ এম. এম. আকাশ, 'বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫ম বর্ষ, ১৫ সংখ্যা, পৃ:৭.

*৩৯ শাহীন রহমান, 'মানুষের উন্নয়ন, উন্নয়ন পদক্ষেপ', ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃ:- ১৬.

*৪০ T.V. RAO, Opt, Cit, P- 25.

*৪১ মো:কামরুল হাসান,'মানব উন্নয়ন ধারণার বিশ্লেষণ' ঃ সমাজ নিরীক্ষণ ৬৭সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী৯৮,সনিকে,পৃ:৩৪.

*৪২ পূর্বক্ত।

*৪৩ বিশদভাবে জানার জন্য T.V.ROA রচিত "Human Resource Development : Concept and Background" গ্রন্থ দেখা যেতে পারে। পৃ:- ৩০.

*৪৪ এজাজুল হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ২১.

*৪৫ Paul Streen, 'Ten years of Human Development – Special Contributions', Human Development Report, 1999.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী

৪.১ বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় প্রান্তিকতা

৪.২ নারী ও রাজনীতি

৪.৩ নারী ও আইন

৪.৪ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ঃ নারী ও পুরুষের বৈষম্য

৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী ঃ প্রান্তিকতা

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী

তৃতীয় অধ্যায়ে উন্নয়নধারায় মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে এবং সেটা সামগ্রিক অর্থে মানব সম্পদ উন্নয়ন অর্থাৎ মানুষের উন্নয়ন পৃথকভাবে পুরুষ বা নারীকে চিহ্নিত করে নয়। এই অর্থে মানুষের উন্নয়নের কথা যখন বলা হয় তখন নারী-পুরুষ উভয়কেই বুঝানো হয়। তার গড় আয়ু, প্রত্যাশিত জীবন, মৌলিক চাহিদাপূরণ, চাকুরীর সুযোগ, গঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণ তথা তার বুদ্ধির চর্চা-সক্ষমতার ব্যবহার প্রভৃতি সমান প্রাপ্তির কথা বুঝানো হয়। কিন্তু যেহেতু সমাজ বিকাশের বিবর্তন ধারায় নারীর অবস্থান পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে অর্থাৎ নারী অন্তর্মুখী, নারীর কাজ গৃহাভ্যন্তরে - তার দায়িত্ব পিতা-স্বামী-সন্তান তথা পরিবারমুখী তার পরিচয় সে নিজে নয়। এবং সর্বপরি উন্নয়ন বিচারে সাধারণভাবে নারীকে এবং নারীর কাজকে বিচার্যবিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। ফলতঃ উন্নয়নকে যেমন শুধুমাত্র অর্থনীতিকে সীমিত রাখা হত তেমনি মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণায় নারীকে অন্তর্ভূক্ত করা হতো না। এর প্রমাণ আমরা দেখি UNDP - এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯০ থেকে শুরু হলেও ১৯৯৪ পর্যন্ত নারী উন্নয়নের কোন সূচক সংযুক্ত ছিল না। তবে ১৯৯৫ সাল থেকে নারীর অবস্থান নির্ণয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদনে GDI (Gender Related Development Program) এবং GEM (Gender Empowerment Measure) সূচক দু'টি সংযুক্ত করা হয় এবং তখন থেকেই উন্নয়নে পুরুষের পাশাপাশি নারীর উন্নয়ন পরিমাপ করা শুরু হয়। কেননা, 'মানব উন্নয়ন' বলতে মুষ্টিমেয় মানুষের উন্নতি, আর অপরসব মানুষের দুর্গতি হতে পারে না। সবচেয়ে বেশী মানুষের জন্য চাই সুস্থ্য জীবন ধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ, যেখানে মৌলিক চাহিদা পূরণই শুধু নয় এর সাথে থাকবে তার সক্ষমতা গঠন - যা সে করতে পারে তাকে তাই করে দেয়ার সুযোগ এবং সেই সক্ষমতার ব্যবহার। সেই অর্থে মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারায় একজন পুরুষের সাথে একজন নারীর প্রসঙ্গও চলে আসে। কারণ পুরুষ ও নারীর জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে তাকে বজায় রেখে উন্নয়নে নারী প্রবেশ অস্পষ্ট থেকে যাবে। সমাজ বিকাশ ও জাতীয় উন্নয়ন বাঁধাগ্রস্ত হবে। সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়নে যে সক্ষমতা গঠন ও তার ব্যবহারের কথা বলা হয় সেখানে নারীর অবস্থান নির্ণয় জরুরী। এই প্রেক্ষিতে এই অধ্যায়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে নারীর অবস্থান ও অবদান আলোচিত হলো।

৪.১ বাংলাদেশ ঃ বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থায় নারী অধঃস্তনতা ঃ-

বাংলাদেশের সমগ্র মানব সম্পদের অর্ধেক নারী। কিন্তু জাতীয় আয়, উৎপাদন, শ্রমশক্তি ইত্যাদি অর্থনৈতিক তত্ত্বে নারীর অবদান ও ভূমিকা সম্পর্কে প্রচলিত অর্থনীতি এতোদিন ছিলো আশ্চর্যজনকভাবে নিরব। শুধুমাত্র অর্থনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিকভাবেও নারীদের অবদানের কথা উহ্যই ছিলো। উপরন্তু নারী

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে অত্যাচার, নির্যাতন আর বৈষম্য রয়েছে তা সার্বিক উন্নয়নকে করে বাঁধাগ্রস্থ্য। ক্রমশ বিশ্ব জুড়ে নারীর ক্রমতর্ধমান অবদান ও ভূমিকা গার্হস্থ্য কর্মকান্ড ও গৃহশ্রমের লুকায়িত অর্থনীতিকে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়েছে যে, কি করে জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই লুকায়িত অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে।

অলোচনার এই পর্বে নারী-পুরুষের বৈষম্যগত অবস্থান চিহ্নিত করা প্রয়োজন। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, বৈষম্য বিরাজ করছে বলেই নারী উন্নয়নকে চিহ্নিত এবং প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে। তাই নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী-পুরুষভেদে যে বৈষম্য রয়েছে তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

নারী অধঃস্তনতা ঃ পিতৃতন্ত্র

নারী মানুষ হিসেবেই জন্ম নেয়। কিন্তু বর্তমান পুরুষতন্ত্র তাকে একটু একটু করে শুধুমাত্র নারীতে রূপান্তর করে।[১] সমাজ বিবর্তনের সাথে সাথে নারীর অবস্থানেরও পরিবর্তন হতে শুরু করে। ক্রমান্বয়ে আদিম সাম্যবাদী অবস্থা থেকে অসম ঘটন এবং ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে ওঠে, যেখানে পুরুষেরা ক্ষমতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হতে থাকে আর নারীরা হতে থাকে অধঃস্তন। আর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকায় নারীরা শাসিত হচ্ছে পুরুষ কর্তৃক। পরিবার, সরকার, সেনাবাহিনী, অর্থনীতি সর্বত্রই পুরুষেরাই ক্ষমতার অধিকারী। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গণমাধ্যম ও সমাজে পুরুষরাই অগ্রাধিকার ভোগ করে। নাগরিক ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে পুরুষরাই আইন প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ এই পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা জঘণ্যভাবে অক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। বিভিন্ন নারীবাদী তাত্বিকরা নানাভাবে এই পিতৃতন্ত্র বা পুরুষতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রখ্যাত নারীবাদী মনস্তাত্বিক জুলিয়েট মিচেলের মতে, পিতৃতন্ত্র এমন একটি সম্পর্কিত ব্যবস্থা যেখানে নারী পুরুষের হাতে বিনিময়ের দ্রব্য মাত্র। মিচেল মনে করেন, এই ব্যবস্থায় পিতার এক ধরণের প্রতীকী ক্ষমতা থাকে, যে প্রতীকী ক্ষমতাই নারীর হীনমন্যতার জন্য দায়ী। অপর নারীবাদী তাত্বিক সিলভিয়া ওয়ালবির ব্যাখ্যায় পিতৃতন্ত্র সামাচিক কাঠামো আর রাজনীতির এমন এক ব্যবস্থা যেখানে নারীকে নিয়ন্ত্রণ এবং শোষণ করে পুরুষ। (Silvia – Theorising Patriarchy)। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্বামী, পতি, মালিক ইত্যাদি প্রতিটি শব্দ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের দ্যোতক হিসেবে বিরাজমান। তা'ছাড়াও নারী-পিতা-স্বামী-ছেলের প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে নির্ভরতা প্রমান করে পুরুষরাই সমাজের প্রধান ব্যক্তি, মহিলা তাদের অধিনস্থ।[২]

ব্যবহারিক জীবনে আমরা নানাভাবে পিতৃতন্ত্রের প্রকাশ দেখতে পাই। 'পুত্র সন্তানের আকাংখা, খাদ্য বন্টনে মেয়েদের প্রতি বৈষম্য, মেয়েদের উপর কেবল পারিবারিক দায়-দায়িত্ব চাপানো, মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ প্রদানে অনীহা, নারী নির্যাতন, মেয়েদের পছন্দ-অপছন্ত নিয়ন্ত্রণ করা, কর্মক্ষেত্রে সম্মান ও শ্লীণতাহানী, নারীর যৌন অধিকারহীনতা, গর্ভধারণ ও

Dhaka University Institutional Repository

সন্তান জন্মদান নারীর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে উপেক্ষা করা' ইত্যাদি হলো ব্যবহারিক জীবনে পিতৃতন্ত্রের রূপ।[৩]

সামাজিক মর্যাদা:

পিতৃতন্ত্রই নির্ধারণ করে সমাজ নারীর মর্যাদা, নারীরা কন্যা-জায়া-জননী রূপে প্রতিভাত। এর বাইরে তার আর কোন সামাজিক পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। বাংলাদেশের মহিলাদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং জরিনা রহমান খান দু'টি কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন। একটি হচ্ছে পিতৃতন্ত্র এবং অপরটি হচ্ছে সামাজিক অসমতা। প্রথমটি ক্রিয়াশীল অধ:স্তন ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে প্রথমটি আবার তৈরী করেছে পুরুষের মর্যাদাবোধ এবং পারিবারিক পদস্তরবোধ। দ্বিতীয়টি ক্রিয়াশীলতা নারীদেরকে করে তুলেছে সমাজের ক্ষেত্রে প্রান্তিক অবস্থান (Marginalized)। এই দু'টি কাঠামোর পরস্পর প্রবীষ্ঠতা বাংলাদেশে বর্তমান মূহুর্তে নারীদের গৃহাভিমুখী (Domesticated) করে তুলেছে।[৪] তাহমিন আখতারের মতে, বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক মর্যাদার স্বল্পতার কারণ হলো -

১। বিবাহ প্রথা,

২। বৈবাহিক সম্পর্ক,

৩। মাতৃত্ব।

আর এই উপাদানগুলি চালু রাখে রাষ্ট্রীয় আইন, সামাজিক রীতিনীতি, পারিবারিক নিয়ম, ব্যক্তিক সম্পর্ক যা নারী নির্যাতনে ভূমিকা রাখে।[৫] ব্রাক প্রকাশনা থেকে নারী নির্যাতনের উপর একটি গবেশণা পরিচালিত হয়, যেখানে যৌতুক, ধর্ষণ, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ প্রভৃতির মাধ্যমে নারী নির্যাতনের একটি হিসাব করা হয় যেখানে সামাজিক সম্পর্কই নির্যাতনের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরের পৃষ্ঠায় চিত্রটি তুলে ধরা হলো। [সারণী- ৪.১] সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে দেনমোহর, তালাক, খোরপোষ, সন্তানের অভিভাবকত্ব স্ববিশেষ ভূমিকা রাখে। দেনমোহর মুসলিম বিবাহ আইনে একটি আবশ্যকীয় শর্ত কিন্তু সবক্ষেত্রে তা পালন হয় না। তালাক শুধুমাত্র পুরুষরাই দিতে পারবে নারীরা নয়। উপরন্তু একজন পুরুষের একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান রয়েছে। বিশেষ ক্ষেত্রে তালাকের পর খোরপোষ বা ভরণপোষণ ঠিকভাবে পালিত হয় না। আর সন্তানের অভিভাবকত্ব পিতার দ্বারা নির্ধারিত। যদিও বর্তমানে সন্তানের পরিচয়ের ক্ষেত্রে মায়ের নাম সংযোজনের বিধান রাখা হয়েছে, কিন্তু তা নামমাত্র।

বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে আয়েশা নোমান তার Status of woman and fertility in Bangladesh গ্রন্থে বলেন - - From birth to death, from infancy to old age a female goes without consideration in all aspects of life with in or outside the family.[৬]

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র - ৪.১ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী নির্যাতন

VIOLENCE

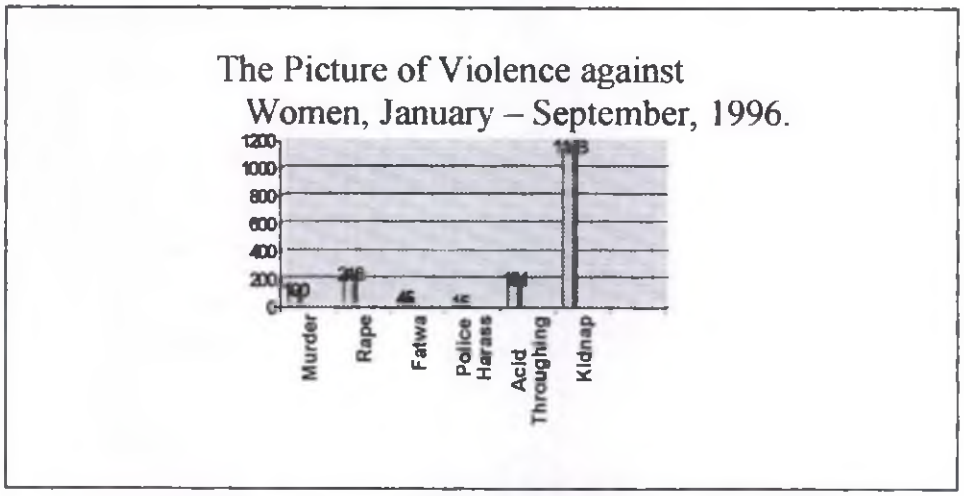

The picture of Violence against women 1995

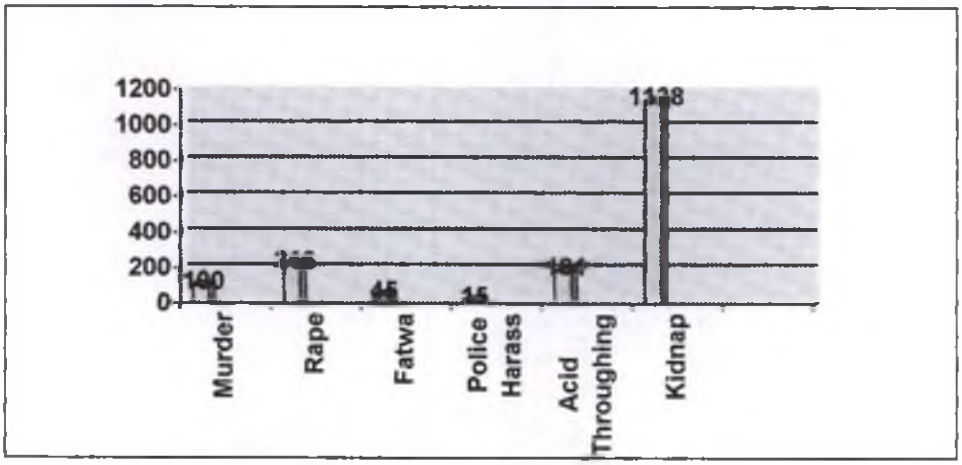

Distribution of Victim of family by gender, 1982-88
Out of a total 722 incidents, the reason is not reported in 192 case.

Type	Murder		Beating		Rape		Acid		Others		Total	
	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
Family Quarrel	136	47	11	1	-	-	14	2	2	1	163	51
Property	12	53	2	8	-	-	-	-	1	1	15	62
Dowry	86	2	8	-	-	-	-	-	-	-	94	2
Love	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12	2
Spouse's Affair	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1
Sexual	2	1	1	-	10	-	-	-	-	-	13	1
Destitution	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Others	62	24	3	1	-	-	1	-	3	-	69	25
Total	326	131	25	10	10	0	15	2	6	2	382	145

উৎস : ব্র্যাক প্রকাশনা থেকে সংগৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক অবস্থা ও কর্মসংস্থান

নারীরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। মোট শ্রমশক্তির ৪৮% এবং জাতীয় আয়ে নারীর অবদান ৩০ ভাগ। নারীরা পৃথিবীর মোট কাজের দুই-তৃতীয়াংশ সম্পাদন করে এবং পুরুষের চাইতে প্রায় ১৫ গুণ সাংসারিক কাজের বোঝা বহন করে। কিন্তু মোট সম্পদের একশ' ভাগের মাত্র এক ভাগ হলো নারীরা এবং আয়ের দশ ভাগের মাত্র একভাগ লাভ করে। যেহেতু নারীর সাংসারিক কাজকে উৎপাদনমূলক বা অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না -তাই প্রতি বছর বিশ্ব অর্থনীতি থেকে নারীর এই অদৃশ্য অবদান (Invisible Contribution) স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়। অর্থাৎ তা' পরিমাপ করা হয় না।[৭]

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, প্রতি বছর লিঙ্গ বৈষম্যের দরুণ দ: এশিয়ায় ৭৪ মিলিয়ন নারী হারিয়ে যায়। যারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবহেলার দুর্ভাগ্যজনক শিকার - যারা আজো বেঁচে থাকতে পারতো।[৮]

বাংলাদেশে এখনও নারীর কর্মকান্ড মূল্যায়িত হয়নি। নারীর গৃহ শ্রম অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপহীন রয়ে গেছে। গৃহকর্মের এই স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ স্বরূপ নারীকে বেকার এবং নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। দেশের ১০ থেকে ৬৪ বছর বংস্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার ৯৫ শতাংশকে 'গৃহবধু' বা 'ঘরণী' নামে আখ্যায়িত করে এদের রাষ্ট্রের মোট শ্রমশক্তি থেকে বহিনকার করা হয়েছে। এমনকি ১৯৮৯-৯৫ সময়কালে শ্রমশক্তি জরিপে ১০ বছরের উর্দ্ধে সকল নারীর ৭৭% গৃহবধু এবং অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে গৃহশ্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হিসেবে অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি স্বীকৃতি লাভ করে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) প্রভৃতি বৈশ্বিক সংস্থা কর্তৃক উৎসাহিত করা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত এধরণের কোন উদ্দোগ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি এখনো বাংলাদেশে জাতীয় আয় নিরোসনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ প্রস্তাবিত সর্বশেষ সংশোধিত জাতীয় হিসেব পদ্ধতির (SNA'93) বদলে পুরোনো আমলের লিঙ্গ অসচেতন (Gender Blind) পদ্ধতিই অনুসরণ করা হচ্ছে।[৯]

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান পুরুষের বহু নীচে। শ্রমশক্তি হিসেবে নারীর প্রকৃত মূল্যায়ন কলনও হয়নি। কেননা, নারীর গৃহাভ্যন্তরীণ পারিশ্রমিকবিহীন অদৃশ্য শ্রম জাতীয় উৎপাদনে কলনও প্রতিফলিত হয়নি। যদিও ইদানিং নারীর গতানুগতিক অর্থনৈতিক অবস্থান তেকে ধীরে হলেও ক্রমশঃ উত্তরণ ঘটছে শ্রমশক্তির বিকাশ। জনসংখ্যায় নারী পুরুষের অর্ধেক হলেও অসামরিক শ্রমশক্তিতে নারীর চেয়ে ১১.১ মিলিয়ন পুরুষ বেশী। পুরুষের চেয়ে নারী বেকারের সংখ্যা প্রায় ২০ লাখ বেশী। অন্যান্য শ্রমশক্তি যেমন- গৃহকর্মে নারী এবং শিশুর অংশগ্রহণ লক্ষ্যনীয়। সামগ্রিকভাবে বিগত কয়েক বছরে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ১০.৪% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৯.২% হয়েছে। বার্ষিক হিসেবে এই বৃদ্ধি প্রায় ৫% দাঁড়িয়েছে।[১০] যদিও এই বৃদ্ধি মোট নারী শ্রমশক্তির তুলনায় কিছু

Dhaka University Institutional Repository

নয়। উপরন্তু নারীরা যে পরিমান বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমদান করে তারও কোন উল্লেখ জাতীয় আয়ে প্রতিফলিত হয় না। নারীকে কেবলই দেখানো হয় পারিবারিক সাহায্যকারী হিসেবে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় সারণী -৪.২ ও সারণী - ৪.৩ এর মাধ্যমে মোট শ্রমশক্তিতে নারীর অবস্থান এবং অদৃশ্য শ্রম দেখানো হলো -

সারণী - ৪.২ ঃ নারী শ্রমশক্তির সংখ্যা ও শতকরা ভাগ (১৯৮৫-৯১)

বছর ও উৎস	মোট সংখ্যা	নারী সংখ্যা	মোট এর শতকরা ভাগ সি.এল.এফ.
১৯৮৫-৮৬ এল.এফ.এস.	৩০.৯	৩.২	১০.৪
১৯৮৯ - এল.এফ.এস.	৫০.৭	২১.০	৪১.৪
১৯৯০-৯১ এল.এফ.এস.	৫১.২	২০.১	৩৯.৩

উৎস ঃ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ৯৫, বি.বি.এস; এল.এল.এস, ১৯৯৫.

সারণী - ৪.৩ ঃ কর্মস্থলে পদমর্যাদা অনুযায়ী নারী-পুরুষের শতকরা ভাগ

(শতকরা ভাগ)

কর্মসংস্থান পরিস্থিতি	বাংলাদেশ			নাগরিক			গ্রামীণ		
	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী	নারী-পুরুষ উভয়	পুরুষ	নারী
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০
স্ব-কর্মসংস্থান	৩৯.৭	৪৩.৫	২২.৩	৩৬.৯	৪১.৭	১৯.০	৪০.৫	৪৩.৯	২৩.৫
নিয়োগকারী	০.৪	০.৪	০.৪	০.৮	০.৯	০.৩	০.২	০.২	০.৪
কর্মচারী	১৬.৮	১৫.০	২৫.৩	৩৯.২	৩৪.৮	৫৫.৬	১০.৫	৯.৭	১৪.৫
অবৈতনিক পারিবারিক সাহায্যকারী	১৮.৯	১৫.৬	৩৩.৯	৯.৬	৭.৮	১৬.২	২১.৫	১৭.৭	৪০.৩
দিন মজুর	২৪.২	২৫.৫	১৮.০	১৩.৫	১৪.৮	৮.৮	২৭.২	২৮.৪	২১.৩

উৎস ঃ পরিসংখ্যান পকেট বুক, ৯৫, বি.বি.এস; এল.এল.এস, ১৯৯৫-৯৬.

উক্ত দু'টি সারণীতে কর্মে নিযুক্ত মহিলার শতকরা হার দেখানো হয়েছে। যেখানে মোট শ্রমশক্তির তুলনায় কর্মে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা কম। এবং দ্বিতীয় সারণীতে বাংলাদেশের নারী সমাজের অদৃশ্য শ্রম অথবা বিনা পারিশ্রমিকের শ্রমদানের মৌলিক বিষয়টি প্রতীয়মান ও প্রমাণিত হয়।

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মধ্যে স্পষ্ট বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। মোট জনশক্তির মধ্যে যে গুটিকয়েক মহিলায় সরাসরি উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত তাতেও সময়, শ্রম, মজুরীতে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে তা' স্পষ্ট, যেমন - ১৯৯১ সালের পরিসংখ্যানে বেসামরিক ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রমজীবী মনুষের ৯.০৪ শতাংশ মহিলা। এদের মধ্যে শিল্পে নিয়োজিত ১ শতাংশ, পেটেভাতে গৃহে শহরে ৪.৯ শতাংশ, গ্রামে ৩০ শতাংশ, সরকারী প্রশাসনে ২ শতাংশ, গার্মেন্টিস শিল্পে শতকরা ৮০ ভাগ। তুলনায় এক্ষেত্রে বেতন ও মজুরী ভীষণ কম। চাকুরী স্থায়ীকরণেও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

মহিলাদের শ্রমশক্তিতে উপস্থিতির হার সম্পর্কে World Bank যে সমীক্ষা করেছে আগামী ২০০০ সাল নাগাদ তা' নিম্নে উপস্থাপিত হলো:-

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.৪ ঃ ২০০০ সাল পর্যন্ত গ্রামীন ও শহর এলাকায় নারীদের শ্রমশক্তি

বছর	গ্রাম	শহর	মোট হাজারে	উপকল্প অংশগ্রহণ
১৯৮০	২১৯৮	৩১২	৩২৩০	১১.০
১৯৮৫	৪০০৯	৪০৬	৪৫০৬	১৩.৫
১৯৯০	৫৫৮৫	৮৪৯	৬৪৩৪	১৬.৬
১৯৯৫	৭৬৪৪	১০২৯	৮৯৭৩	২০.৪
২০০০	১০১৪১	২০৬১	১২২০২	২৫.০

Source World Bank Bangladesh, Selected Issues in Rural Employment, March 1993. Table 1.8, P-110.

সারণীতে দেখানো হয়েছে ১৯৮০ সালে যেখানে নারীদের মোট শ্রমশক্তি ১১% ছিলো সেখানে ১৯৯৫ সালে ২০.৪%-এ উন্নীত হয়েছে। World Bank আরো উল্লেখ করেছে যে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১৯৮০ সালে ৩.২ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০০ সাল নাগাদ ১২.২ মিলিয়নে পৌঁছবে।"[১১] মজুরীগত বৈষম্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই সময় এবং শ্রমে নিযুক্তি থেকেও পুরুষের তুলনায় নারীরা কম মজুরী পেয়ে থাকে। নিম্নে সারণীর মাঝে তা' দেখানো হলো -

সারণী - ৪.৫ ঃ মজুরী বৈষম্য:-

সাপ্তাহিক গড় আয় (টাকায়)	কৃষি শ্রমিক		কৃষি বহিঃভূত শ্রমিক	
	পুরুষ (%)	মহিলা (%)	পুরুষ (%)	মহিলা (%)
৫০ টাকার নীচে	৪৯.৭	৬৩.৫	১০.৮	৩১.৩
৫১ - ১০০	৪৩.৩	৩৬.৫	৩৫.৫	৬২.৫
১০১ - ১৫০	৬.১	-	২২.০	-
১৫১ - ২০০	২.১	-	১০.০	৬.৩
২০১ - তদুর্ধ	০.৬	-	২১.৬	-

Source, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistical Year Book of Bangladesh, 1982.

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, ৫০ টাকার নীচে কৃষিতে নিয়োজিত ও কৃষি বহিঃভূত শ্রমে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৬৩.৫ এবং ৩১.৩ যেখানে পুরুষরা ৪৭.৯ এবং ১০.৮। এবং ২০০ টাকার উপরে কোন মহিলাই আয় করে না কিন্তু কর্ম সময় পুরুষদের সমান এবং কখনো বেশী।

শিক্ষায় নারী ঃ-

ব্যক্তিত্বের বিকাশ, দায়িত্ববোধ, অধিকার সংরক্ষণ, নাগরিক চেতনাবোধ তৈরীতে শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েদের গৃহস্থালী কাজের প্রতি যতোটা উৎসাহিত করা হয় তার থেকে বেশী ব্যক্তিত্ব, দায়িত্ববোধ, অধিকার, নাগরিকত্ব প্রভৃতি বিষয়ে নিরুৎসাহিত করা হয়। মেয়েদের শিক্ষা বলতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত বোঝানো হয় যেখানে সংসার ধর্ম বুঝতে যতটুকু প্রয়োজন। একারণে পুরুষরা যতটা শিক্ষিত হচ্ছে সে তুলনায় নারীরা হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে দেখানো হয় -

* মেয়েরা মেয়ে বলে অর্থনৈতিকভাবে মুল্যায়ন করা হয় না। কেননা এখানে আমাদের দেশে পুরুষরাই পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে দেখাশুনা করে এবং পুরুষদের

Dhaka University Institutional Repository

উপর নির্ভর করে থাকে। ফলে পুরুষরাই অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব পালন করে বলে তাদেরই শিক্ষায় উৎসাহিত করে যাতে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অন্যদিকে মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে বাইরে গিয়ে জীবিকা অর্জন করবে, পরিবারের দেখাশুনা করবে এখন পর্যন্ত এ ধারণা গড়ে ওঠেনি।

* শিক্ষার্জনের সুযোগ আসে দারিদ্র মোচনের পর। বাংলাদেশে যেখানে ৯০% জন দারিদ্র সীমার নীচে, ৬০% চরম দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে, সেখানে সামাজিকীকরণের ফলে মেয়ের শিক্ষা থেকে পিছিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

সারণী - ৪.৬

পুরুষ-নারীর কাজ ও আয়ের একটি বৈষম্যমূলক চিত্র।

নারীরা গৃহকাজের বাইরেও পুরুষদের তুলনায় দ্বিগুণ কাজ করে আয় করে পুরুষদের একদশমাংশ।

উৎস: চন্দন সরকার, 'নারী ও পরিবেশ, প্রেক্ষিত বাংলাদেশ', বিচিত্রা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯২।

* বাংলাদেশ একটি মুসলিম প্রধান দেশ ফলে ধর্মীয়ভাবে মেয়েরা পর্দা মেনে চলে। ছেলেমেয়ে একই সাথে শিক্ষাগ্রহণ করবে এটা অনেক অভিভাবকই মেনে নিতে পারে না। তাই বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের খুব কমই ঘরের বাইরে যেতে দেয়া হয়।

* Motherhood is the most desirable role of women. নারীরা মেয়ের ভূমিকা পালন করে। এরূপ ধারণা মেয়েদের শিক্ষিত হতে বাঁধা দেয়। কেননা মায়ের ভূমিকা যা

Dhaka University Institutional Repository

সংসারের অধিকাংশ কাজ সম্পন্ন করাকে বুঝানো হয় সেখানে শিক্ষার খুবই বেশী প্রয়োজন নেই। এরূপ ধারণা কারণে শিক্ষা থেকে মেয়েরা পিছিয়ে আছে। এভাবে দেখা যায় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার - মানবিক, নাগরিক ও জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে নারী বৈষম্যের স্বীকার।"[১২]

একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নারীর পশ্চাৎপদতার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীর অনগ্রসরতা। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ শিক্ষা ক্ষেত্রে যে আটটি উদ্দেশ্যের উল্লেখ রয়েছে তার একটি হলো 'শিক্ষার সম্ভাব্য প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী সমাজের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।' তবুও দেখা যায় যে, সাধারণ শিক্ষাসহ কারিগরী ও বিশেষ শিক্ষাক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষের সাথে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। নিম্নে সারণী - ৪.৭ এর মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলোঃ-

সারণী - ৪.৭ ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার (১৫ বছরের উর্দ্ধে) ঃ

বছর	জাতীয়			গ্রাম			শহর		
	উভয়	পুরুষ	নারী	উভয়	পুরুষ	নারী	উভয়	পুরুষ	নারী
১৯৭৪	২৫.৮	৩৭.২	১৩.২	-	-	-	-	-	-
১৯৮১	২৯.২	৩৭.৭	১৮.৮	২৫.৪	৩৫.৪	১৫.৩	৪৮.১	৫৮.০	৩৪.১
১৯৮৭	৩৩.৮	৪৪.০	২২.৯	২৯.৫	৩৯.৬	১৮.৭	৬১.৫	৭১.৬	৫০.৫
১৯৯০	৩৬.৯	৪৫.৫	২৪.২	৩০.৭	৩৯.৩	২০.৩	৬২.৫	৭০.০	৫০.০
১৯৯১	৩৫.৩	৪৪.৩	২৫.৮	৩০.১	৩৮.৭	২১.৫	৫৪.৪	৬২.৬	৪৪.০
১৯৯২	৩৯.৭	৪৬.৮	২৫.০	৩৩.৭	৪০.২	২৩.১	৬২.৬	৭০.০	৫১.৯
১৯৯৩	৩৯.৭	৪৮.১	৩৩.৯	৩৬.৫	৪১.৯	৩০.৬	৬২.৮	৭০.৮	৫২.১

উৎস ঃ রিপোর্ট অন স্যাম্পল ভাইটাল রেজিস্ট্রেশন ইন বাংলাদেশ ১৯৮১-১৯৯৩; বি.বি.এস.

গত এক দশকে (১৯৮১-১৯৯১) গ্রামে নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বাক্ষরতার হারের পার্থক্য বেড়েছে। ১৯৮১ সালে যে পার্থক্য ছিল প্রায় ২০%, ১৯৯১-তে এসে এ পার্থক্য হয়েছে প্রায় ২২%। অর্থাৎ নারী স্বাক্ষরতার হার গত এক দশকে গ্রামে বাড়লেও পুরুষের তুলনায় কম বেড়েছে। শহরের মধ্যে এই পার্থক্যের হার কিছুটা কম। তুলনামূলক স্বাক্ষরতার হারকে এভাবে দেখানো যেতে পারে।

সারণী - ৪.৮ ঃ লিঙ্গ ও বাসস্থান অনুযায়ী স্বাক্ষরতার তুলনামূলক হার ঃ-
১৫ বছর ও অধিক বয়সের ব্যক্তির জন্য

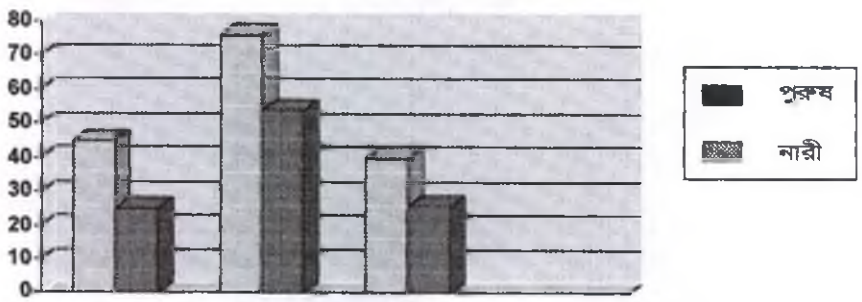

উৎস ঃ 'নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান', উইমেন ফর উইমেন, পৃ: - ৩৮.

Dhaka University Institutional Repository

সকল বয়সে শহরে – গ্রামে উভয়ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাক্ষরতার হারের ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে যে, উন্নয়নের একটি বিরাট উপাদান শিক্ষা থেকে নারী তুলনামূলকভাবে অধিক বঞ্চিত, শুধুমাত্র স্বাক্ষরতার হারে যে তারতম্য তাই দিয়ে অনুন্নয়নকে বিশ্লেষণ সম্ভব নয় বরং উচ্চ শিক্ষায় নারীর অবস্থান লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কেননা, উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে তারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় অবস্থান নিতে সক্ষম হবে যা সমাজে কাংখিত পরিবর্তন আনয়নে সক্ষম।

সারণী – ৪.৯ ঃ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নারী ও পুরুষের শতকরা হার

শিক্ষার বিভিন্ন স্তর	১৯৮১		১৯৮৫		১৯৯১	
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী
১ম-৫ম শ্রেণী	৫৮.৯	৭৫.০	৫৬.৭	৭১.৭	৫৩.০	৬৫.৮
৬ষ্ঠ-৯ম শ্রেণী	২৫.৮	১৯.৮	২৫.৪	২১.৪	২৬.৯	২৪.৬
এসএসসি এইচএসসি	১২.৪	৪.৫	১৪.৯	৬.১	১৬.০	৮.২
ডিগ্রী ও তদুর্ধ	২.৯	০.৭	৩.০	০.৮	৪.১	১.২

উৎস ঃ 'নারী ও উন্নয়নঃ প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান', উইমেন ফর উইমেন, পৃ: - ৪১.

দেখা যাচ্ছে যে, ডিগ্রী ও উচ্চ পর্যায়ে নারীর শিক্ষাগ্রহণের হার ক্রমশঃ বাড়লেও বৃদ্ধির হার অত্যন্ত কম। উপরন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক-শিক্ষিকার তুলনায় দেখা যায় যে, যে হারে ছেলেদের বিদ্যালয় আছে তার থেকে অনেক কম মেয়েদের বিদ্যালয় এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার তুলনায় এখনো অনেক বেশী। নিম্নে সারণী ৪.৯.২ এ উল্লেখিত।

সারণী – ৪.১০ ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষক – শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (১৯৮১-১৯৯১)

বছর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা			ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (হাজার)		
	ছেলে	মেয়ে	মোট	শিক্ষক	শিক্ষিকা	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
১৯৮১	৪২০৩৪	৪১৩	৪২৪৪৭	১৫৮৮২১	১৫৬২৬	১৭৪৪৪৭	৫০৫৯	৩২০১	৮২৬০
১৯৮২	৪২২৭০	৪১৩	৪২৬৮৩	১৫৮৮৩০	১৭০৪১	১৭৫৮৭১	৫২৩৭	৩৪১৯	৮৬৫৬
১৯৮৩	৪২৬৪০	৫৭৯	৪৩২১৯	১৫৮০২৮	২০৫৬১	১৭৮৫৮৯	৫৩৫৮	৩৫৯৭	৮৯৫৫
১৯৮৪	২৪৯৬৬	৪৯৯	৪৩৪৬৫	১৫৯৩৭১	২৩৮০২	১৮৩১৭৩	৫৭২৫	৩৯১৮	৯৬৪৩
১৯৮৫	৪৩২৪৮	৩৪০	৪৩৫৮৮	১৫৯৮৫২	২৩৭৮৬	১৮৩৬৩৮	৬০০২	৪০৮০	১০০৮২
১৯৮৬	৪৩৪১৭	২৯৫	৪৩৭১২	১৫৯৩১৭	২৫৩৫১	১৮৪৬৬৮	৬২০১	৪৫৭৫	১০৭৭৬
১৯৮৭	৪৩৬৬৫	৩২৭	৪৩৯৯২	১৫৮১৮৬	৩০১৮৩	১৮৮৩৬৯	৬৩৭৮	৪৮৮৫	১১২৬৩
১৯৮৮	৪৩৮৩১	৩৭১	৪৪২০২	১৫৬৪৮৪	৩২৭০৭	১৮৯১৯১	৬৭২৯	৫০২৬	১১৭৫৫
১৯৮৯	৪৫০৪৯	২৯০	৪৫৩৩৯	১৫৭৫১৩	৩৫৩০৩	১৯২৮১৬	৬৫৯৭	৫১৭৭	১১৭৪৪
১৯৯০	৪৫৪৮০	৩০৩	৪৫৭৮৩	১৬০১৮৩	৩৯৮৭৩	২০০০৫৬	৬৯১২	৫৪৩৩	১২৩৪৫
১৯৯১	৪৭৫৬১	৮৫৮	৪৮১৪৬	১৬১৪২৯	৪১৪১৮	২০২৮৪৭	৭১১১	৫৯২৪	১৩০৩৫

১) যে হারে প্রাথমিক বিদ্যালয় বাড়ছে সে হারে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে না।

২) গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৃদ্ধির হার শিক্ষা বৃদ্ধি হারের তুলনায় বেশী হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষিকার তুলনায় এখনও অনেক বেশী।

৩) ছাত্রী বৃদ্ধির হার ছাত্র বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশী তবে শিক্ষিকা এবং ছাত্রী সংখ্যার অনুপাত গত দশ বছরে ক্রমশঃ কমছে, বর্তমানে এই অনুপাত ১ঃ৪৩।

। উৎস : নারী ও উন্নয়ন প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইম্যান ফর উইম্যান।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও নারী ঃ-

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ অপুষ্টি ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার এবং তুলনামূলকভাবে নারীদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিভিন্ন কারণে আরও শোচনীয়। লিঙ্গ বৈষম্য এক্ষেত্রে সমভাবে বিদ্যমান। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এবং পুরুষ ক্রমশঃ সংসারে উপার্জনের একমাত্র অথবা প্রধান অবলম্বন হওয়াতে রোগের চিকিৎসায় তারাই প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রচলিত অনেক কুসংস্কারজনিত গোড়ামীর জন্য এবং অর্থ বিবেচনায় নারীর অসুস্থতা অগ্রাধিকার পায় না। গ্রামের নারীরা প্রধানতঃ হোমিওপ্যাথ, কবিরাজী, পানি পড়া, ঝাড়ফুক, দোয়া, তাবিজ নির্ভর - অর্থাৎ স্বল্প ব্যয়ে চিকিৎসার নামে যা চলে তাই পান। নারীরা তুলনামূলকভাবে কম শিক্ষিত হওয়ার ফলে নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কম সচেতন থাকে। গরীব পরিবারগুলোতে মেয়ে সন্তান জন্মের পর থেকেই তার প্রতি অন্যান্য অনেক বৈষম্যের মত খাবারের ক্ষেত্রেও বৈষম্য করা হয়ে থাকে। ফলে পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক বৃদ্ধি এদেশে কম। দারিদ্র এবং অস্বচ্ছল পরিবারের গর্ভবতী নারীরা অপুষ্টি এবং রক্তহীনতায় ভোগে। ফলে পরিনামে তারা রুগ্ন শিশু জন্ম দেয়। প্রসবকালীন জটিলতায় প্রসূতির মৃত্যু সংখ্যাও এদেশে অত্যন্ত বেশী। প্রসূতি মৃত্যুর আরো একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে অশিক্ষিত ধাত্রি বা দাই। শিশু মৃত্যুর হারও বাংলাদেশে, বিশ্বে সর্বোচ্চ। সারণী - ১০ ও সারণী - ১১ এর মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুষ্টি ও খাদ্য গ্রহণের তারতম্য দেখানো হলো ঃ-

সারণী - ৪.১১ : পুরুষ ও নারীর মধ্যে পুষ্টি গ্রহণের তারতম্য

বিষয়	পুরুষ	নারী
দৈনিক ক্যালোরী গ্রহণ (১৯৮১)	১৯২৭	১৫৯৯
দৈনিক প্রোটিন গ্রহণ (১৯৮১)	৪১.৭ (গ্রাম)	৩২.৭ (গ্রাম)
শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি (১৯৮৫)	৫.০%	১৪.০%

উৎস ঃ খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, পৃ: ১১১.

সারণী - ৪.১২ : পরিবারে নারী ও পুরুষের খাদ্য গ্রহণের ব্যবধান

পরিবারের খাদ্য সংস্থান	পুরুষ (%)	নারী (%)	মোট (%)
খাদ্য ঘাটতি	১৯.৬	২২.০	২১.০
মাঝে মাঝে খাদ্য ঘাটতি	৪৯.৭	৪৯.৩	৪৯.৫
খাদ্য আছে	২০.১	১৮.৯	১৯.৫
খাদ্য উদ্বৃত্ত	১০.৬	৯.৮	১০.২

উৎস ঃ খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, পৃ: ১১১.

৪.২ নারী ও রাজনীতি

সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ একটি বহুল আলোচিত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। রাজনীতির জগৎ পুরুষের একক নিয়ন্ত্রণে। রাজনীতিতে নারীরা 'Minority is participation' উন্নত ও উন্নয়নশীল সকল সমাজে এটি সত্য। বাংলাদেশের নারী সমাজ সর্বত্রই

Dhaka University Institutional Repository

তুলনামূলকভাবে অধঃস্তন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের অবস্থান প্রান্তিক। সমাজে বিদ্যমান সার্বিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে অধঃস্তনতায় আবদ্ধ নারীর বৈষম্যমূলক অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা রাজনীতির স্রোতে সন্নিবেশিত হয়নি। রাজনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই নারীর সমস্যা বিবর্জিত। কিন্তু যেহেতু ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে মহিলারা অর্ধেক, সেজন্য রাজনীতি চর্চায় নারী বিষয়টি এসে পড়ে।"[১৩]

বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৬-৩৯ ধারা, নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম, নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার পালন করেছে।

৬৬-১২২ ধারা, জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে সংবিধান নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য করেনি।

৬৫ নং ধারায় সংবিধান জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষিত আসনের বিধান করেছে এবং সংবিধান জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বিবৃত করেছে।

এতোসব অধিকার আইন থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন প্রায় মহিলা বিবর্জিত। স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান এক্ষেত্রে ব্যাপক সংহঠিত ও সুসংহত নয়। এর কারণ - হিসেবে বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর উল্লেখ করেন - (ক) সম্পত্তি, (খ) জনবল, (গ) সম্পদের তৈরীকরণ, (ঘ) যুক্ততা, (ঙ) বাগ্মিতা, (চ) নারী।

এসব উপাদন সমষ্টির সমন্বয়ে গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো তৈরী হয়। এই গ্রামীন কাঠামোর রাজনীতিতে ব্যক্তি হিসেবে পুরুষ এবং সম্পত্তিবানেরা প্রবল। এ জন্য ব্যক্তি হিসেবে একজন নারী এবং শ্রেণী হিসেবে শ্রেণীর কাঠামোতে নারী অধঃস্তন। শুধু তাই নয়, নারীরা কোন কোন সময় নিজেরাই রাজনীতির বিষয়।"[১৪] তাছাড়া শিক্ষার অনগ্রসরতা, সম্পদের অভাব, রাজনৈতিক দলের দৃষ্টিভঙ্গী নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মস্ত বাঁধা। বিশেষতঃ শিক্ষার বৈষম্য ও অনগ্রসরতা নারীর নিজেদের বিকাশের পক্ষে অনুপযুক্ত।

এরপরও, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে নারীর অবস্থান অনেককেই বিস্মিত করতে পারে। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি অনন্য দৃষ্টান্ত, এতে কোন সন্দেহ নেই। কেননা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী এবং সাধারণ সম্পাদিকা সকলেই নারী। এসব তথ্য থেকে অনেকেই বলতে পারেন, এদেশের রাজনীতি নারীর নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু দৃশ্যমান এই অবস্থানের পেছনে রয়েছে প্রচন্ড নারী শূণ্যতা। দেশের রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা এবং নীতি নির্ধারণী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নারীর অবস্থান লক্ষ্য করি, তা'হলে তা প্রমানিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্বের কাঠামো পুরুষের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। '৮০-র দশকের সময়কালে দু'টি মধ্য স্রোতধারা রাজনৈতিক দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ স্বল্প সংখ্যায় হলেও নারী নেতৃত্বের পর্যায়ে অবস্থান লাভ করে এবং ক্ষমতাচ্যুত হবার পর আন্দোলনের মাধ্যমে বি.এন.পি.-র নেতৃত্বের সারিগুলোতে কয়েকজন নারীর অবস্থান ঘটে। ফলে, রাজনীতিতে দলীয় পর্যায়ে নারীর অবস্থান কিছুটা হলেও অগ্রগতি ঘটে। উপরন্তু এদেশের রাজনীতিতে যেসব নারীরা এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তারা এসেছেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সম্পূর্ণ নিজেস্ব চেষ্টা ও যোগ্যতায় তারা রাজনীতিতে আসেননি। কেননা, "রাজনীতির অঙ্গনে দু'টি বৃহৎ দলে দুইজন নারী নেতৃত্বের ভূমিকা রয়েছে।'৮০-এর দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের পর্যায়ে তাদের আগমন ঘটেছে প্রয়াত পুরুষের প্রতীকরূপে - কোন যোগ্য পুরুষ রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী বা উত্তরসুরীর অভাবে বা অনুপস্থিতিতে।"[১৫] পরপৃষ্ঠার সারণীগুলোর মাধ্যমে নেতৃত্বের পর্যায়ে নারীর অবস্থানকে তুলে ধরা হলো -

সারণী - ৪.১৩[১৬] রাজনীতিতে নারীঃ দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়ে (১৯৮১)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (শেখ হাসিনা)	সভাপতি ও সম্পাদক মন্ডলী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য	২৩ ২৭	৪ ০
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ	কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি	১১৫	৩
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	জাতীয় কাউন্সিল কমিটি জাতীয় কার্যকরী কমিটি	১১ ১১৪	১ ১৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	কেন্দ্রীয় কমিটি	৫৯	১
ইউ.পি.পি.	নির্বাহী কমিটি	২৪	০

সারণী - ৪.১৪[১৭] রাজনীতিতে নারী ঃ দলীয় নেতৃত্বের পর্যায় (১৯৮৭)

দলের নাম	দলীয় নেতৃত্বের পর্যায়	মোট সংখ্যা	নারীদের অবস্থান
জাতীয় পার্টি	সভাপতি ও সম্পাদকমন্ডলী	৫২	৩
আওয়ামী লীগ	সভাপতি ও সম্পাদকমন্ডলী	৩১	৬
ওয়ার্কার্স পার্টি	পলিট ব্যুরো কেন্দ্রীয় কমিটি	৮ ৩০	০ ১
জাসদ (ইনু)	সভাপতি ও সম্পাদকমন্ডলী	১৯	১
মুসলীম লীগ	নির্বাহী কমিটি	১৮	১

জাতীয় পর্যায় ও মন্ত্রীসভায় নারীঃ

জাতীয় সংসদে ও মন্ত্রী সভায় উপস্থিতি নারীর রাজনৈতিক ও জনপ্রতিনিধিত্বশীল অস্তিত্বে মাপকাঠি হিসেবে ধরা যেতে পারে। বাংলাদেশের আইনসভা বা জাতীয় সংসদ প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ আসন এবং মহিলাদের জন্য ৩০টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করে। এবং ১৯৭৩ সাল থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য মহিলাদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে নির্বাচনী বছরসমূহে মহিলা প্রার্থীদের শতকরা হার দেখানো হলোঃ-

সারণী - ৪.১৫ :- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের জন্য নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের শতকরা হার (১৯৭৩-৯১)

নির্বাচনী বছর	নারী প্রার্থীদের শতকরা হার
১৯৭৩	০.৩%
১৯৭৯	০.৯%
১৯৮৬	১.৩%
১৯৮৮	১.৭%
১৯৯১	১.৫%
১৯৯৬	২.৩%

উৎস ঃ সাপ্তাহিক অনন্যা, সংখ্যা-১, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৯৭.

লক্ষ্য করা যায় যে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীরা অধিক সংখ্যায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। তবে ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনে একজন নারীও বিজয়ী হননি। ১৯৭৯ সালেও সাধারণ আসনে নারীরা বিজয়ী হতে পারেননি। উপনির্বাচন ১৯৭৯-তে দু'জন মহিলা প্রার্থী জয়ী হন। ১৯৮৬ সালে শেখ হাসিনা তিনটি আসনে জয়ী হন। ফলে দু'টি আসনে আবার উপনির্বাচন হয় এবং নারী প্রার্থীরাই এ আসন দু'টি লাভ করেন ১৯৮৬-তে। ১৯৮৮-তে সংরক্ষিত আসনের ধারাটি অকার্যকর ছিল। ১৯৯১-এ নারী প্রার্থীরা ৮টি সাধারণ আসনে সফল হন যার মধ্যে ৫টি আসনই বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে যায়। পরে ৪টি আসনের উপনির্বাচনে বি.এন.পি. পুরুষ প্রার্থী দেয়, কিন্তু আওয়ামী লীগ ১টি আসনে মহিলা প্রার্থী দেয়। মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারেননি। কাজেই চারটি আসনে বি.এন.পি.-র চারজন পুরুষ প্রার্থী বিজয়ী হন। পরপৃষ্ঠার সারণী - ৪.১৬ এর মাধ্যমে বিজয়ী মহিলা সদস্যদের শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণী - ৪.১৬ ঃ জতীয় সংসদে বিজয়ী নারী সদস্যদের শতকরা হার

১	২	৩	৪	৫
নির্বাচনের বছর	সাধারণ আসনে বিজয়ী নারীদের সংখ্যা	সাধারণ আসনে বিজয়ী নারীদের শতকরা হার	নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন	নারীদের শতকরা হার সর্বমোট আসনের প্রেক্ষিতে
১৯৭৩	০	০	১৫	৪.৮
১৯৭৯ (ক)	০	০	৩০	৯.০
১৯৭৯ (খ)	০+২	০.৭	৩০	৯.৭
১৯৮৬ (ক)	৫	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৬ (খ)	৩+২	১.৭	৩০	১০.৬
১৯৮৮	৪	১.৩	-	-
১৯৯১ (ক)	৮	২.৭	৩০	১১.৫
১৯৯১ (খ)	৪+১	১.৭	৩০	১০.৬

উৎস : ৬ ঃ নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইড বুক ফর প্লানারস, (খসড়া রিপোর্ট), ১৯৯৪।
ক. সাধারণ নির্বাচন।
খ. শূণ্য আসনে উপ-সাধারণ নির্বাচন।

মোট আসনের সাথে নারী সদস্যদের তুলনা করলে দেখা যায়, নারীরা রাজনীতি শুধুমাত্র পিছিয়ে নেই। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতেও তাদের সংখ্যা নগন্য। জামায়াতে ইসলামীর কমিটিতে নারী সদস্য নেয়াই হয় না। সারণী ৪.১৭-তে বিষয়টি লক্ষ্যনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.১৭ ঃ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্থায়ী ও নির্বাহী কমিটিতে নারী সদস্যের সংখ্যা

রাজনৈতিক দল	রাজনৈতিক দলের কমিটিসমূহ	মোট সদস্য	নারী সদস্য
বি.এন.পি.	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্যনির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়েতে ইসলামী	ওজলিশ-ই-শুরা	১৪১	-
	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি ; মজলিশ-ই-আমেলা	২৪	-

উৎস :- খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন, পৃ:- ১৩৬.

এছাড়াও মন্ত্রীসভায় নারীদের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নেই বললেই চলে। বিষয়টি সারণী - ৪.১৮-তে দেখানো হলোঃ-

সারণী - ৪.১৮ ঃ বাংলাদেশের বিভিন্ন সময়ে নারীমন্ত্রীর সংখ্যা ও শতকরা হার ঃ

প্রশাসন	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	মহিলা মন্ত্রীর সংখ্যা	তকরা হার
শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭২-৭৫	৫০	২	৪
জিয়াউর রহমান ১৯৭৯-৮২	১০১	৬	৬
হুসাইন মো: এরশাদ ১৯৮২-৯০	১৩৩	৪	৩
খালেদা জিয়া ১৯৯১-৯৬	৩৯	৩	৫

উৎস :- নাজমা চৌধুরী, উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট, এ গাইপ বুক ফর প্লানরেস (খসড়া রিপোর্ট) ১৯৯৪.

সুতরাং পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনীতি ও প্রশাসনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী অনুপস্থিতির হার খুবই বেশী। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে সমাজে একজন নারী রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করেছে সে সমাজেরই অধিকাংশ মহিলারা খুবই হীন অবস্থার মুখোমুখি। রাজনৈতিক কাঠামো সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন বিধায় প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণের বিমুখতা দেশের উন্নয়নকে খর্বিত করে। অবশ্য রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের কিছু বাঁধা আছে যা নিম্নে আলোচিত হলো:-

রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ:

বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগতভাবে দেখা যাচ্ছে যে, রাজনৈতিক অঙ্গনে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রান্তিক। এটা সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। তবে, বাংলাদেশে মহিলাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার পিছনে কতোকগুলো নিয়ামক বিদ্যমান। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকারম্যাক বলেছেন যে, মহিলারা তিনটি কারণে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে না -

১। সামাজিক বিভিন্নতা।

Dhaka University Institutional Repository

২। কম শিক্ষিত।

৩। হীনমন্যতা বা সনাতনী মনোভাব।

নারীকে গৃহস্থালীর পরিধির মধ্যে আবদ্ধ রাখা আর পুরুষের রয়েছে বিশাল বিচারণভূমি। সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় মহিলারা অধস্তন ভূমিকা পালন করে থাকে। সমাজ নির্মাণে, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যে প্রতিটি ব্যক্তির জন্য দরকার সেটি মহিলাদের ক্ষেত্রে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় না। সামাজিকরণ প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ মহিলাদের নেই বললেই চলে। তাছাড়া রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় সচেতনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ। রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান, রাজনীতি বিষয়ে উৎসাহ ও রাজনৈতিক কর্মক্ষতা। এর জন্য প্রয়োজন রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের, কিন্তু বাংলাদেশের নারী সমাজে অংশগ্রহণ, পদক্ষেপ, গৃহকেন্দ্রিক কর্মজগতে বেষ্টিত পরিমন্ডলে, সেখানে নারী কতটুকু রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হতে পারে সেটিও বিবেচ্য।

রাজনীতির সাথে অর্থনৈতিক অবস্থার একটি কার্যকরী সংযোগ রয়েছে বিশেষ করে নিজের দেশের প্রেক্ষাপটে। কিন্তু নিম্ন অর্থনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন নারী সমাজ যারা অর্থনৈতিকভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল তাদের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে জড়িত হবার সুযোগ থাকে না।"[১৮] কর্মসংস্থানগত অবস্থার ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত হতাশা ব্যঞ্জক। ফলে নারীর নিজস্ব আয় ও সম্পদের উৎস সীমিত।

শিক্ষা মানুষকে পারিপার্শ্বিক, বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা, অধিকার ও দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সৃষ্টিতে সহায়ক যা রাজনৈতিক অংশগ্রহণে অনুপ্রেরণা যোগায়। এদিক থেকে মহিলাদের শিক্ষাগত পশ্চাৎপদতা রাজনীতিতে নিরুৎসাহিত করে।

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মহিলারা তাদের সীমাবদ্ধ এলাকা থেকে বাইরে আসতে পারে না। সমাজ নারীর উপর কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে থাকে যা তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, ত্যাগী, ধর্যশীলা প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করে। ফলে রাজনীতির মত একটি ব্যাপক ও জটিল প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অনুপস্থিতির হার এত ব্যাপক।

৪.৩ নারী ও আইন ঃ

আইনের চোখে সমতা একটি মৌলিক মানবাধিকার হলেও এখনো তা সার্বজনীন বাস্তবতায় রূপ লাভ করেনি। সবত্রই ।এখনো নারীরা তাদের হীন অবস্থার কারণে আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারে না। আইনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাই জাতীয়ভাবে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রচলিত আইনের সংস্কার, নতুন আইন প্রনয়ণ, নারী নির্যাতন বিরোধী বিশেষ বিধান ইত্যাদি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ণ্যূনতম কাংখিত মাত্রায় অবস্থার উন্নতির পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে জেন্ডার সমস্যা স্বীকৃত হলেও বৈষম্য দূরীকরণের বাস্তব পদক্ষেপ না গ্রহণ করার দরুণ তা কাগুজে

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণায় পর্যবেশিত গয়েছে। এক্ষেত্রে নারীর স্বপক্ষে আইন এবং আইনের পক্ষপাতদুষ্টতার দরুণ নির্যাতনের ব্যাপকতা আলোচিত হলো।

বাংলাদেশের সংবিধান জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকারের বিষয়টি ব্যক্ত করেছে। বিশেষ করে সংবিধানে ২৮(১), ২৮(২) ও ২৮(৩) ধারায়। জীবনের বহুক্ষেত্রে যেমন পারিবারিক বিষয়বস্তু, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, দেন মোহর, ভরণ পোষণ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ও পরিচর্যা ইত্যাদি বহু বিষয়ে ব্যক্তিগত আইন কার্যকর রয়েছে। একই উত্তরাধিকারের প্রশ্নটিও ধর্মীয় বা ব্যক্তিগত আইনের কার্যকারীতার অন্তর্ভুক্ত। নারীর স্বপক্ষে আইনসমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ-

বিবাহ বিষয়ক আইন :-

বাল্য বিবাহ রোধে ১৯২৯ (সংশোধন অধ্যাদেশ নং ৩৮/১৯৮৪ দ্বারা সংশোধিত) এর ধারা অনুয়ায়ী ধর্মীয় বন্ধন বিবাহের পূর্বে পুরুষের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং নারীর বয়স ১৮ বছর হতে হবে। অন্যথায় আইনের ৪,৫ ও ৬ ধারা অনুযায়ী একমাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ (রোজিষ্ট্রেশন) আইন ১৯৭৪ নং ৫ (২) ধারায় নিকা রেজিষ্ট্রেশনের দ্বারা রেজিষ্ট্রিকৃত হতে হবে। বিবাহ রেজিষ্ট্রি না করিলে তা' আইনত দন্ডনীয় হবে। এই আইন ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ বিনাশ্রম কারাদন্ড অথবা অনুর্ধ পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত জারমান। বা উভয়ই হতে পারে এবং ইহার উল্লেখ কাবিন নামায় থাকিবে।[১৯] আরও অন্যান্য বিষয় রয়েছে যা নিম্নরূপ:-

- কাবিন নামায় দেন মোহরের উল্লেখ ছাড়া বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না।
- স্বামী স্ত্রীকে দেমমোহরের টাকা দিতে বাধ্য থাকিবে।
- অনাদায়ে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ অনুযায়ী স্ত্রী দেমমোহরের টাকা আদায়ের জন্য মামলা করিতে পারিবেন।
- স্বামী আইনতঃ স্ত্রীকে ভরণ-পোষণ দিতে বাধ্য।
- স্ত্রীর সহিত বসবাসরত সন্তানের ভরণ-পোষণ দিতেও স্বামী আইনগতভাবে বাধ্য।
- অন্যধায় ভরণ-পোষণের জন্য স্ত্রী পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারবেন।
- বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অনুমতির প্রয়োজন রয়েছে।
- দাম্পত্য অধিকার পুণরুদ্ধারের জন্য স্বামী পারিবারিক আদালতে মামলা করতে পারবেন।

উপরোক্ত বিষয়ক আইন ছাড়াও নারীদের স্বপক্ষের আইন রয়েছে যা বৈষম্য নিরোসনের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। যেমন -

Dhaka University Institutional Repository

১। উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার।

২। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০।

৩। নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ, ১৯৮৩।

৪। পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫।

কিন্তু বিদ্যমান সামাজিক মূল্যবোধ ও প্রেক্ষিতের কারণে এই আইনগুলোর প্রায়োগিক সীমাবদ্ধতার দরুণ তা' কার্যকরী করা যায়নি। যেমন, ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ বহুবিবাহের প্রথাটি রহিত করতে পারেনি। একইভাবে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০, নারী নির্যাতন আইন ১৯৮৩, পারিবারিক আদালত আইন ১৯৮৫ এদর কোনটাই নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে নারী-পুরুষের অবস্থায় বৈষম্য দূরীকরণে সমর্থ হয়নি। উপরন্তু নারীর ক্ষমতায়নের জন্য সম্পত্তির উত্তরাধিকারের যথাযথ আইনানুগ প্রয়োগ ও তার বৈষম্যমূলক বিধানটির প্রশ্নে অনেক আলোচনা হলেও এ ব্যাপারে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষ হতে উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কারের কোন উদ্যোগ বা সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি যা কোন কোন মুসলিম দেশে সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও নারী নির্যাতনের বহুমাত্রিক নারী-পুরুষ বৈষম্যকে একটি করে (নিম্নে সারণী - ৪.১৯-তে উল্লেখিত) এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই সমুদয় নির্যাতনের বিচার হয়না, পুলিশ কেস হিসেবেও রেকর্ড হয়না।

নারীর স্বপক্ষে উল্লেখিত আইন থাকা সত্ত্বেও তথ্যদি ও পরিসংখ্যান দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারী নির্যাতনে মাত্রা বেড়েই চলেছে। বিধিদ্ধ আইন এবং সামাজিক আইন উভয়ই আইনের মাধ্যমে জেন্ডার পক্ষপাতিত্ব প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে। তা চাড়াও আইনী কাঠামোর বাইরে যতোগুলো সুপ্রতিষ্ঠ ও সুদৃঢ় সামাজিক প্রক্রিয়ায় বা সনদ এমন

সারণী - ৪.১৯[*২০] :- নির্যাতনে নারী-পুরুষ বৈষম্য ঃ

মাস	আত্মহত্যা		যৌতুক		ধর্ষণ		অপহৃত		এসিড আক্রান্ত		কাজের মেয়ে		প্রতারিত (নির্যাতন সম্পর্কিত)		নির্যাতন সম্পর্কিত অন্যান্য অস্বাভাবিক মৃত্যু	
১৯৯৩	ম	উ	ক	খ	গ	ঘ	ম	পু	ও	পু	গ	ঘ	পু	ম	পু	ম
জুলাই	২৮	২৯	১৫	১	১১	৪০ +	১	১৯	০	৫	১	০	০	০	০	২০
আগষ্ট	১৭	৩৫	৫	১	১০	২৯	২	৪	১	৩	১	১	০	৭	০	২৩
সেপ্টে:	০৭	৩৪	২	৩	৮	২২ +	১২	৪	০	৩	০	১	০	০	০	৩২
মোট	৬২	৯৮	২২	৫	২৯	৯১ +	১৬	২৮	১	১১	২	২	০	১ ০	০	৭৬

ক. হত্যা; গ. ধর্ষিতা;
খ. নির্যাতন; ঘ. ধর্ষক ছেলে; ।

উৎস ঃ [*২০] খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, উইমেন ফর উইমেন; পৃ: ১৬৬।

আইনগত অধিকার বা শক্তি অর্জন করে যা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতিষ্ঠিত আইনকেও বাতিল বা অকার্যকর করে তোলে। যেমন -বাংলাদেশের আইনে ছেলে ও মেয়ের বিয়ের ণ্যূনতম বয়স যথাক্রমে ১৮ ও ২১ বৎসর হলেও দেশের প্রচলিত লোকাচার অনুযায়ী অধিকাংশ মেয়ের বিয়ে হয় গড়ে ১৫ বছর বয়সে।[*২১]

Dhaka University Institutional Repository

আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত আইন বিভিন্ন দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিধান দ্বারা কোনঠাসা হয়ে নারীর প্রতি বৈষম্য আরোপ করে থাকে। যেমন - সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত নারীর পূর্ণ মানবাধিকার মুসলিম শরীয়া আইনে সংকুচিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ধর্মী অনুশাসন অনুযায়ী নারীর বিবাহ, তালাক, প্রজনণ, অভিভাবকত্ব ইত্যাদির অধিকার হরণ করা বিশেষভাবে উল্ল্যেখযোগ্য।

আইনের বাস্তব প্রয়োগগত পদক্ষেপ সংযুক্তির ব্যর্থতা নারীর প্রতি বৈষম্যকে প্রভাবিত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কর্মসংস্থান সুযোগ আইনে নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমতার নীতি থাকলেও দেখা গেছে যে, বিভিন্নক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি একেবারে প্রান্তিক। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী গেজেটেড পদে নারীর কোঠা ১০% সংরক্ষিত হলেও তা যথারীতি প্রতিপালিত হচ্ছে না।[*২২] আইন মেনে চলার সদিচ্ছার বিষয়টি এখানে সম্পূর্ণ নিয়োগ কর্তার মর্জির উপর নির্ভর করে।

এছাড়াও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতার দরুণ অনেক সময় নারীর আইনগত অধিকার যে আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে তা উপলব্ধি ও চর্চ্চা করতে তাদের অক্ষম করে তোলে। তাই অধিকাংশ নারীরা তাদের দারিদ্র, শিক্ষা ও নিজ অধিকার সম্বন্ধে ধারণার অভাবে এবং সংগঠিত হতে না পারার জন্য তাই আইনগত অধিকার দাবী করতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণকারী অনেক প্রগতিশীল আইন গ্রহণ করা হলেও অধিকাংশ নারীর সাংসারিক দায়-দায়িত্ব ও কাজের বোঝা তাদের এসব আইনের সুযোগ গ্রহণে বাঁধা সৃষ্টি করে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে উন্নয়ন ও মর্যাদা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রায় সকল ক্ষেত্রের সুচকেই নারীর অবস্থান পশ্চাৎপদ, পুরুষের বহু নীচে যা নারী-পুরুষের অবস্থানগত বৈষম্যকে চিহ্নিত করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের সংস্কারের মাধ্যমে এই বৈষম্যকে দূর কারার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য অথবা নারী-পুরুষের সমতা আনয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বলে শোনা যায়। কিন্তু মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন বিশ্লেষণে তা' প্রমানিত হয় না।নিম্নে মানব সম্পদ উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী নারী-পুরুষের অবস্থানগত বিদ্যমান বৈষম্য আলোচিত হলোঃ-

৪.৩ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ঃ নারী ও পুরুষের বৈষম্যমূলক অবস্থান :-

উল্ল্যেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশে নারীর অবস্থান সমাজ, সংস্কৃতি, আইন, ধর্ম, ঐতিহ্য কর্তৃক নির্ধারিত। সমাজে নারীর অবস্থান পুরুষের পরিপূরক হিসেবে। সমাজে তাদের স্থান তাদের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্য এবং তার সীমাবদ্ধতা দ্বারা নির্ধারিত বলে ধরা হয়। তাই এখনো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনণ অধিকার সুযোগ বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া এক জনগোষ্ঠী, অথচ, "Women play a key role in development both

Dhaka University Institutional Repository

in the contact of the family and in society at large, including its economy and social system." [২৩] উন্নয়নে নারী ভূমিকা বিশ্লেষণের পূর্বে বাংলাদেশে মানব উন্নয়ণ প্রতিবেদনে নারী ও পুরুষের অসমতা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

"নারী ও উন্নয়ন - প্রাথমিক পরিসংখ্যান" - গ্রন্থে নারীর প্রতি বিরাজমান বৈষম্যের কিছু চিত্র একত্রীকরণ করে উল্লেখ করে, যেমন-

- জন্মলগ্ন থেকে মেয়ে শিশু পরিবারের বৈষম্যের স্বীকার হয়।
- শিশু অবস্থা থেকেই একটি মেয়ে ক্যালোরী ও পুষ্টি কম পায়, যদি পরিবারে সম্পদের সংকট থাকে।
- গর্ভকালীন সময়ে নারীর যে পরিমান ক্যালোরী ও পুষ্টি পাবার কথা তা' তিনি পান না।
- নারীরা এযুগের বহির্বিশ্বের কর্মকান্ড থেকে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন।
- নারী শিক্ষার গুরুত্ব কম দেয়া হয় বলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিক হারে তাদের পাশ কাটিয়ে যায়।
- বাংলাদেশে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী।
- নারী অপেক্ষা পুরুষের গড় আয়ু বেশী।
- বিধবার সংখ্যা বহু কিন্তু বিপত্নীক কম।
- সাম্প্রতিক কালে নারী পরিচালিত বা Female handled household -এর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার নিশ্চিত করা হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ নেই বললেই চলে।
- রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে নারী নেই বললেই চলে।

এই যে অসমতা, নারীর পশ্চাৎপদ, অবহেলিত এবং শোষিত অবস্থার বহিপ্রর্কাশ।

নিম্নে সারণী - ৪.২০ এর মাধমে বাংলাদেশে নারী পুরুষের স্বাক্ষরতা, সাম্পাহিক মজুরী, পাবলিক সার্ভিসে বৈষম্য চিত্রিত হলোঃ-

সারণী - ৪.২০ :- স্বাক্ষরতা, মজুরী, চাকুরীতে নারী পুরুষ বৈষম্য

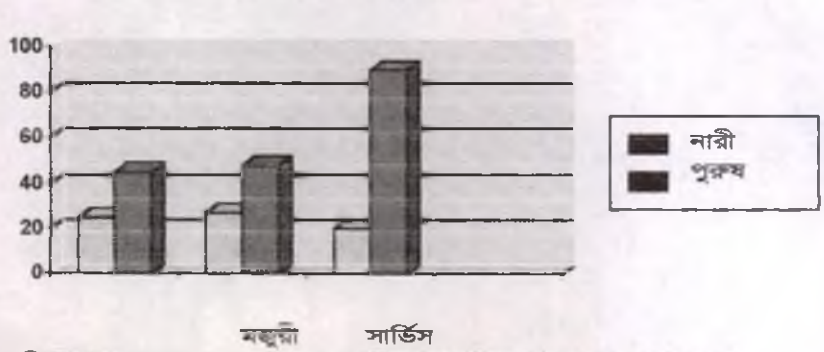

উৎস ঃ - নারী উন্নয়ন - প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান; শিরোনাম চিত্র, উইমেন ফর উইমেন।

Dhaka University Institutional Repository

উপরোক্ত চিত্রে লক্ষ্যনীয় যে, উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধানতম দিকসমূহ যথা:- শিক্ষা, মজুরী ও কর্মে এই তিনটি বিষয়ে নারী ও পুরুষের স্পষ্ট বিভাজন রয়েছে যা উন্নয়নের প্রধান বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সাধারণ চিত্র ছাড়াও মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন-এর সূচকসমূহ আলোচনা ও বিশ্লেষণ এই বিভাজন বা বৈষম্য আরো প্রকট হবে। নিম্নে ইউএনডিপি-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এর আলোকে উন্নয়নের দিক সমূহ বিশ্লেষিত হলো।

প্রথমেই সামগ্রিক বিচারে বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন আলোচিত হলো ঃ-

উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানব সম্পদ উন্নয়ন চলমান এবং সীমাহীন একটি প্রক্রিয়া। সমাজ ও সরকারের অবস্থান এবং 'কি আছে আর কি নেই' এর উপর নির্ভর করে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং অগ্রাধিকার। জাতীয় সরকার এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহ সকল সমাজের সকল মানুষকে উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার নিশ্চয়তার কথা বলা হয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সেসব বিষয়ের প্রতি প্রথমেই নজর দেয়া প্রয়োজন তা'হলো -

১। মানব সক্ষমতা গঠনের লক্ষ্যে প্রথমেই মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা বিধান, যার ভোগের মাধ্যমে সুস্থ্য জীবন-যাপন করতে পারে। আর সেগুলি হলো - খাদ্য ও পুষ্টি, পানীয় ও পয়ো:নিস্কাশন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধা; যেগুলো মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক প্রধান স্তর।

২। শিক্ষা কর্মসূচী, যেমন - প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা এবং তদুপরি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

৩। উপার্জনক্ষম প্রজন্ম গঠন কর্মসূচী যার দ্বারা দারিদ্র নিরসন সম্ভব।

মানব সম্পদ উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নের প্রধান স্তর যথা:- খাদ্য, পুষ্টি, পানীয়, পয়ো:নিস্কাশন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সুবিধার নিশ্চয়তাই পরবর্তী স্তর অর্থাৎ ব্যক্তি তার ব্যক্তিক উন্নয়নের জন্য অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করতে পারে। কেননা, মৌলিক চাহিদার অপূর্ণতা অন্যান্য চাহিদাকে ম্লান করে দেয়। এপ্রসঙ্গে অমর্ত্য সেন এর বক্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, "নিরাশার চাপে মানসিক প্রতিক্রিয়া অনেক সময়ই রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে আপোষ করে। আর সেই আপোষে থাকে ব্যর্থতার বোধ। নিরাপত্তাবোধ নেই যে ভাগচাষীর, ভূমি নেই যে শোষিত কৃষি শ্রমিকের, সাধ্যের অতিরিক্ত কর্মভারে নতজানু যে গৃহভৃত্য অথবা পরাধীন গৃহবধূ, তারা সবাই নিজের নিজের দুর্ভাগ্যের মোকাবেলা নিজেরা করে। ... কারণ তাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন বেঁচে থাকা, জিইয়ে রাখা ঘটনাবিহীন জীবনকে।"[২৮] সুতরাং জীবনকে ঘটনাবহুল হয়তে প্রথমেই মৌলিক চাহিদা পূরণ আবশ্যকীয় শর্ত। তাছাড়াও রয়েছে, শিক্ষা কর্মসূচী অর্থাৎ শুধুমাত্র স্বাক্ষরতা নয় একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরী করা যার ধারা জীবনমান

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নের পছন্দ-অপছন্দ নির্ধারিত হতে পারে। কেননা, "Education provides a base on which we have to build up the super structure of our manpower. There is a Chinese saying that if we are wish to plan for a year, sow seeds; if we wish to plan for a decade, plant trees and if we wish to plan for life time, educate men."[২৪] এবং উপার্জনক্ষম প্রজন্ম গঠন কর্মসূচী যার দ্বারা দারিদ্র নিরোসন সম্ভব অর্থাৎ আয়-উপার্জন করতে সক্ষম এবং তার জন্য কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি - এই উভয় বিষয়ই দারিদ্র নিরোসন করতে সক্ষম। কেননা, আমরা জানি উপার্জনকারীর উপস্থিতি কর্মের সুযোগকে বুঝায় না। সুতরাং কর্মের সুযোগ ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জনকারী তার নিজের এবং পরিবারের দায়িত্ব বহন করে একটি জীবন মান তৈরী করতে সক্ষম। তাই উক্ত বিষয়গুলোকে মানব উন্নয়নের পথে প্রাথমিক এবং প্রধানতম স্তর হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে। এবং উপরোক্ত বিষয়গুলোকে জনগণের মধ্যে পৌছে দেয়াই জাতীয় সরকারের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই সকল প্রয়োজনপূরণের লক্ষ্যে জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা এবং কর্মসূচী প্রণয়ন করা উচিত বলে T. V. RAO মনে করেন। তিনি আরো বলেন যে, ' The poor do not have a voice and therefore those responsible for administering them got away and continue to get away, taking a major cut from what is meant for the poor, the hungry, the illiterate, the sick and the voiceless.'[২৫]

মানব সম্পদ উন্নয়নের উল্লেখিত লক্ষ্যসমূহের ভিত্তিতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি আলোচনা করতে যাই, তবে দেখা যাবে যে, বিশ্বে মানব উন্নয়ন সূচকের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১৪৬তম। এই অবস্থান মানুষের মৌলিক অধিকার ও সক্ষমতাপূরণের নিরীক্ষা করা হয়েছে। এই মৌলিক অধিকার এবং সক্ষমতা বলতে UNDP মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করে যে, মানব উন্নয়ন হচ্ছে জনগণের সুযোগের পরিধি প্রসারের প্রক্রিয়া। যে সুযোগগুলোকে ক্রিটিকাল বা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে নির্বাচন করা হয় সেগুলো ছিলো একটি দীর্ঘ সুস্থ্য জীবন-যাপনের সুযোগ, কাজ ও আয়ের এমন সুযোগ যার ফলে একটি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য জীবন-যাত্রার মান অর্জন করা সম্ভব হয়। বস্তুত: এই নিরীখে আয়ু, শিক্ষা ও ন্যূনতম আয় এগুলোই হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার ও মৌলিক সক্ষমতা।[২৬]

একটি দীর্ঘ, সুস্থ্য জীবন-যাপনের জন্য যে মৌলিক অধিকার এবং মৌলিক সক্ষমতাকে ধরা হয় অর্থাৎ আয়ু, শিক্ষা ও ন্যূনতম আয়ের নিরীখে তালিকা - ৪.২২ এর সূচকসমূহের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূচকসমূহ মোটেই বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘ সুস্থ্য জীবনকে প্রাতিষ্ঠিত করে না। উল্লেখিত ৩টি বিষয়ের নিরীখে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.২১ ঃ মানব উন্নয়ন সূচকে তুলনামূলক চিত্র (বিভিন্ন দেশ)

দেশ	জন্মের সময় গড় প্রত্যাশিত আয়ু (১৯৯৫ বছরে)	প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার হার	মাথাপিছু আয় ডলারে (GNP) ১৯৯৫
বাংলাদেশ	৫৮.৭	৪২.৬	২৭০ পৃ-*২৩
ব্রাজিল	৬৬.৬	৮৩.৩	৫৯২৮
ভিয়েতনাম	৬৬.৪	৯৩.৭	২৪০
আমেরিকা	৭৬.৪	৯৯.০	২৬৯৭৭
কিউবা	৭৫.৭	৯৫.৭	৩১০০
শ্রীলংকা	৭২.৫	৯০.২	৭০০
দক্ষিণ কোরিয়া	৭১.৭	৯৮.০	৯৭০০

উৎস : মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৮, পৃ-২৩, ১২৮-১২৯, ১৮৪-১৮৫.

উপরোক্ত তালিকাতে আয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য - এই তিনটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনামূলক বিরাজমান চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের পরিস্থিতি মোটেই সুখকর নয়।

এছাড়াও মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ১৯৯৮ তে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়সূচক এবং মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমরাশিমান ব্যবধান দেখিয়ে (সারণী - ৪.২২) সিদ্ধান্ত টানা হয় যে প্রবৃদ্ধি অনুযায়ী সমাজের দরিদ্রতম অংশগুলির উপকার হয়নি এবং নিম্ন মাত্রার স্বাস্থ্যগত ও শিক্ষাগত অর্জনই সারা দেশের মানব উন্নয়ন সূচককে নিম্ন স্তরে দাবিয়ে রেখেছে।[*২৭]

সারণী - ৪.২২[*২৮] মাথাপিছু আয় ও মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমরাশিমান ব্যবধান

পরিমাপের বছর (তথ্য বছর)	তুলনীয় দেশের সংখ্যা	মাথাপিছু আয় সূচকের ক্রমরাশিমান	মানব উন্নয়ন সূচকের ক্রমরাশিমান	ব্যবধান (৩-৪)
১৯৯০ (১৯৮৭)	১৩০	১২৪	১০৭	(+) ১৭
১৯৯১ (১৯৮৮)	১৬০	১৫৫	১৩৬	(+) ১৯
১৯৯২ (১৯৮৯)	১৬০	১৫০	১৩৫	(+) ১৫
১৯৯৩ (১৯৯০)	১৭৩	১৫৯	১৪৭	(+) ১২
১৯৯৪ (১৯৯১)	১৭৩	১৫৯	১৪৬	(+) ১৩
১৯৯৫ (১৯৯২)	১৭৪	১৪১	১৪৬	(-) ৫
১৯৯৬ (১৯৯৩)	১৭৪	১৪০	১৪৩	(-) ৩
১৯৯৭ (১৯৯৪)	১৭৫	১৪৪	১৪৪	০

উৎস : ইউ.এন.ডি.পি. ১৯৯৮, পৃ:-১২.

এতে স্পষ্ট হয়েছে যে, সম্প্রতি (অর্থাৎ ১৯৯০ থেকে ১৯৯৪ পর্যন্ত) আমরা মাথাপিছু গড় আয় এবং গড় মানব উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের অবস্থান সারা বিশ্বে যথাক্রমে ১৫৯ ও ১৪৭-মত ধাপ থেকে ১৪৪-মত ধাপে আসতে সক্ষম হয়েছি। অর্থাৎ মাধাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে যেখানে আমরা ১০ধাপ অগ্রসর হয়েছি সেখানে মানব উন্নয়নের ধারা চালু থাকলে আমরা হয়তো আয়ো প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে থাকবো কি তা ইপ্সিত চরিত্রের হবে না। এর কারণ হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়, "বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সম অনুপাতে মানব উন্নয়নে পরিণত করা সম্ভব নয়।" এম, এম. আকাশের মতে, বাংলাদেশের কাঠামোগত বৈষম্য ঐতিহাসিকভাবে তিনটি ক্ষেত্রে বিরাজমান, যথা -

Dhaka University Institutional Repository

১। আয় বা সম্পদ বন্টনে বৈষম্য,

২। শহর ও গ্রামের মধ্যে আঞ্চলিক অবস্থানজনিত বৈষম্য,

৩। নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য।

তাঁর পরামর্শ মতে, এমন উন্নয়ন কৌশল আমাদের গ্রহণ করতে হবে যাতে অর্থনৈতিক উন্নতি ক্রমবর্ধমান হারে মানব উন্নয়নে পরিনত হয় এবং এই মানব উন্নয়নের সুফল যাতে আরো বেশী করে বঞ্চিত গ্রামবাসী, নারী সমাজ এবং নিম্ন আয়ের জনগণের দিকে ধাবিত হয়।"[২৯]

সারণী- ৪.২৩ এর মাধ্যমে লক্ষ্যনীয় যে, বাংলাদেশে মানব উন্নয়নের অগ্রগতি ও বঞ্চনার ক্ষেত্রে বছর অনুযায়ী খুব বেশী অগ্রগতি হয়নি এবং বঞ্চনার হার খুব বেশী কমেনি। ১৯৬৫ সালে যেখানে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৫ বছর সেখানে ১৯৯০-তে এসে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৮ বছর হয়েছে। আবার শিশু মৃত্যু ১৯৯০ সালে ৫বছর বয়স হবার আগেই প্রায় ৮,৮০,০০০ জন, মোট জনসংখ্যার ৮২% প্রতিদিন ১৫০০ কিলোক্যালোরীর কম ক্যালোরী ভোগ করে। ১৯৯৩ সালে ৮কোটি ৪০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিরক্ষর ছিল। ১৯৯০ সালে ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ লোক দারিদ্র সীমার নীচে ছিল।

সুতরাং এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর পশ্চাৎপদতা সার্বিক উন্নয়নকে ব্যহত করেছে, এখানেও নারীর পশ্চাৎপদতাও অন্তর্ভুক্ত এবং ব্যাপকতর।

৪.৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী ঃ প্রান্তিকতা :-

প্রতি বছর প্রকাশিত ইউ,এন,ডি,পি. (UNDP) - এর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report) আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন বিতর্ক ও জাতীয় নীতি প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে শুধু মানব উন্নয়নের একটি যুতসই সংজ্ঞাই উপস্থাপন করা হয়নি বরং এই মানব উন্নয়নকে পরিমাপ করার জন্য কিছু নির্দেশিকাও নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সব নির্দেশিকার মাঝে ১৯৯৫ সালে নারীদের অবস্থান পরিমাপের জন্য দু'টি নতুন সূচক যথা,

১। লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচক (Gender Related Development Index - GDI)

২। লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়ন সূচক (Gender Empowerment Measure GEM) সংযোজন করা হয়। ১৯৯৫ সালের প্রতিবেদনের মূল সুর হলো 'মানব উন্নয়নকে অবশ্যই কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিনত করতে হবে।' যদি উন্নযনের অর্থ হয় সকল মানুষের জন্য সুযোগ-সুবিধার বিস্তৃতি, তবে নারীরা এই সব সুযোগের বাইরে থাকলে গোটা উন্নয়ন প্রক্রিয়া মুখ থুবড়ে পড়বে। লিঙ্গ সমতা আনার লক্ষ্যে প্রতিবেদনের ঘোষণা করা হয়েছে যে, 'মানব উন্নয়ন নারী-পুরুষের সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। তা না হলে এর উন্নয়ন হবে বাঁধাগ্রস্থ।'

Dhaka University Institutional Repository

সারণী - ৪.২৩

ইউ.এন.ডি.পি.-র প্রতিবেদন ঃ এক নজরে

মানব উন্নয়নের হিসাব - নিকাশপত্র : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

অগ্রগতি

প্রত্যাশিত আয়ু	
১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ এই বছরে বাংলাদেশের গড় প্রত্যাশিত আয়ু ৪৫ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫১.৮ বছর হয়েছে।	১৯৯০ সালে ৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই প্রায় ৮,৮০,০০০ জন শিশু মৃত্যু বরণ করেছে।
স্বাস্থ্য	
১৯৮৫-৮৭ সময়কালে মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশের স্বাস্থ্য সুবিধার প্রবেশাধিকার ছিল। ১৯৯০ সালে ৮০ শতাংশ গ্রামীন পানীয় জলের জন্য নলকূপ ব্যবহার করেছে। ১৯৮০ সালের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচীর আওতায় মোট শিশুর সংখ্যা ১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ শতাংশ হয়েছে।	১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার ৬৩.৪ শতাংশের স্বাস্থ্য সুবিধায় প্রবেশাধিকার ছিলো না এবং মাত্র ১২ শতাংশ গ্রামীন জনগণ সকল প্রকারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নলকূপের জল ব্যবহার করেছে। ১৯৮৫-৯০ সময়কালে মাত্র ৬০ লক্ষ লোকের পয়:সুবিধায় প্রবেশাধিকার ছিলো।
খাদ্য ও	
১৯৮৫ থেকে ১৯৮৬ সালের মধ্যে জনপ্রতি মাথাপিছু দৈনিক ক্যালোরী ১৮৯৯ কিলো ক্যালোরী থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৩০ কিলো ক্যালোরী হয়েছে।	মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ প্রতিদিন ১৫০০ কিলো ক্যালোরীর কম ক্যালোরী ভোগ করে।
শিক্ষা	
১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ সলের মধ্যে বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার ২৯ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২ শতাংশ হয়েছে।	১৯৯০ সালে ৮ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক লোক নিরক্ষর ছিলো।
চাকুরী	
১৯৮৫-৯০ সময়কালের মধ্যে প্রায় ৩৯ লক্ষ ৩০ হাজার মিলিয়ন মনুষ্য - বছরের সমপরিমান কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।	পুরুষদের মধ্যে ১৯৮৫ সালে অবেকারত্বের হার ছিলো ২২ শতাংশ ও মহিলাদের মধ্যে ছিলো ৪৪ শতাংশ।
আয়	
মাথাপিছু জাতীয় আয় ১৯৮৫ সালে ছিলো ১৫০ মার্কিন ডলার এবং ১৯৯০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৭০ মার্কিন ডলার হয়েছে।	১৯৯০ সালে ৯ কোটি ৯৪ লক্ষ লোক দারিদ্র সীমার নীচে ছিলো।
শিশু	
১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যে প্রতি হাজারে জীবন্ত জন্মে শিশু মৃত্যু হার ১৮৫ থেকে কমে গিয়ে ১১৬ হয়েছে। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ সময়কালে শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্ন্তভূক্তির হার ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭৮ শতাংশ হয়েছে।	১৯৯০ সালে ৫ বছর বয়সের নীচে প্রায় ১কোটি ৩৫লক্ষ মিলিয়ন শিশু পুষ্টিহীনতার শিকার হয়েছে। ১৯৯০ সালে অপুষ্টি ৬০ শতাংশ শিশুমৃত্যুর কারণ। ১৯৯০ সালে প্রায় ২ কোটি ১৩লক্ষ শিশু প্রাথমিক বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল না।
নারী	
পুরুষদের তুলনায় নারীদের প্রাথমিক শিক্ষায় অর্ন্তভূক্তি হার শতকরা হিসেবে ১৯৬০ সালের ৩৯ শতাংশ থেকে ১৯৯০ সালে ৮৭ শতাংশ হয়েছে। প্রতি হাজার জীবন্ত শিশুর প্রসবকালে মাতৃমৃত্যুর হার ১৯৮০-৮৭ থেকে ১৯৮৭-৯০ সময়কালে ৬ থেকে কমে গিয়ে ৫.৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে।	১৯৮৭-৮৮ সময়কালে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীদের অন্তর্ভূক্তির হার হার পুরুষদের তুলনায় সংশ্লিষ্ট হারের ৪০ শতাংশ ছিলো। ১৯৮০ সালে গড়ে নারীদের মজুরী হার পুরুষদের মজুরী হারের
গ্রামীন ও নাগরিক	
স্বাস্থ্য খাতে মোট ব্যয়ে গ্রামীন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের অংশ ১৯৭৮ সালে ১০ শতাংশ থেকে ১৯৮৮ সলে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৭ সালের মধ্যে নগর এলাকায় শুল মৃত্যুহারের শতাংশ হিসেবে গ্রামীন এলাকায় শুল মৃত্যুহার ১৮৭ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে ১৫৫ শতাংশ হয়েছে।	১৯৮৮ সালে গ্রামীন এলাকায় প্রত্যাশিত আয়ু ছিলো ৫৫.৪ বছর সেখানে নগর এলাকায় এর মান ছিলো ৬০.৯ বছর। ১৯৯০ সালে গ্রামের ২০ শতাংশ লোকের বিশুদ্ধ জল সরবরাহে প্রবেশাধিকার ছিল। নগরের ক্ষেত্রে এই হার হচ্ছে ৩৬ শতাংশ। ১৯৮৬ তে গ্রামীন ৮২ শতাংশ লোক চরম পুষ্টিহীনতার শিকার হয়েছে। নগর এলাকায় এই হার ৬.৯ শতাংশ।

Dhaka University Institutional Repository

নিম্নে সারণী - ৪.২৪ এর মাধ্যমে মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের আলোকে নারী-পুরুষে বৈষম্য দেখানো হলোঃ-

সারণী - ৪.২৪

বিষয়	নারী	পুরুষ
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু (বছর ১৯৯২)	৫৫.৯	৫৬.৮
প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার (১৯৯২)	৮৬.০	৯০.০
বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার (% ১৯৯১)	১৮.৬	৪৪.৩
ভর্তির হার (% ১৯৯১)		
প্রাইমারী	৬১.৪	৭৭.৭
মাধ্যমিক	১৫.০	৩২.০
মাধ্যমিকোত্তর	১২.২	২৩.০

উৎস ঃ- মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৪, ইউএনডিপি।

সারণী - ৪.২৫

সূচক (১৯৯৫)	নারী	পুরুষ
প্রত্যাশিত আয়ু	৫৮	৫৮.৯
বয়স্ক স্বাক্ষরতা	৩৪.২	৫০.৫
আলিকাভুক্তির অনুপাত	৩৪	৪৫
শিক্ষাগত অর্জন	৩৪.১৩	৪৮.৬৭
আয়		
সাপ্তাহিক আয় (টাকা)	৪০৫	৮৩৪
শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার	৫০.৬	৭৮.৩

উৎস ঃ- মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, ১৯৯৮, ইউএনডিপি, পৃ:- ৪৮।

এভাবে দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজ জীবনের প্রতিটি স্তরে অসম অবস্থানে বিরাজ করছে। অথচ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অবদান বিশ্লেষণ করলে তার ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না।

উন্নয়নলে নারীর অদৃশ্য অবদান

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক ধারণা সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এধরণের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্কের অধঃস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নিরূপিত সম্পর্কের কারণে নারী হয় বঞ্চিত, নিগৃহীত ও শোষিত। সমাজ নারী চরিত্রে কিছু বিশেষ ভাবমূর্তি আরোপ করে তাকে নির্ভরশীল, পরমুখাপেক্ষী, সংসারে ক্লান্তিহীন শ্রমদানকারী, ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিপূর্ণ চরিত্রে চিত্রিত করে। গৃহস্থালী ক্রিয়াকর্মে, গ্রামীন কৃষি অর্থনীতিতে, উৎপাদনশীলতায় নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। এভাবে ব্যয়িত শ্রম সরাসরি অর্থে রূপান্তরিত হয় না বলেই সাধারনতঃ নারীর শ্রমদানের স্বীকৃত আসে না। নতুন প্রজন্মের জন্মদান ও লালনের মধ্য দিয়ে নারী যে ভূমিকা পালন করে, তারও যথাযথ স্বীকৃতি নেই। বরঞ্চ তার এই অবদান শক্তিতে রূপান্তরিত না হয়ে দুর্বলতায় পর্যবসিত হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে, বিশেষতঃ গ্রামীন অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৩০]

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমশঃ বিশ্বজুড়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষত অর্থনীতিতে নারীর ক্রমবর্ধমান অবদান ও ভূমিকা এই গার্হস্থ্য কর্মকান্ড বা গৃহশ্রমের লুক্কায়িত অর্থনীতি (Hidden Economy)-কে সামনে নিয়ে এসে দেখিয়েছে যে কি করে জনসংখ্যার বিরাট অংশ এই লুক্কায়িত অর্থনীতির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের সংশোধিত জাতীয় আয়ের পরিমাপ (System of National Account - SNA) সমাজে নারীর অদৃশ্য অবদানের (Invisible Contribution) বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলেছে। এই হিসেবে দেখা গেছে যে, পরিবারেই তৈরী হয় পরিবারেই ভোগ হয় এরকম জিনিসের বাজার দাম অনুযায়ী সারা দুনিয়ায় মোট ১৬ ট্রিলিয়ন (১৬ লক্ষ কোটি) ডলার মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ১১ ট্রিলিয়ন (১১ লক্ষ কোটি) ডলার উৎপাদন করে নারীরা, যার জন্য তারা আলাদা কোন দাম পায় না। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মেয়েরা সংসারে যে কাজ করে তার দাম দিতে হলে এবং তা সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করলে সমস্ত পৃথিবীর মোট উৎপাদনের পরিমান ২০ থেকে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।[৩১]

নারীর গৃহশ্রম

বাংলাদেশে এখনো নারীর গার্হস্থ্য কর্মকান্ড মূল্যায়িত হয়নি। নারীর গৃহশ্রম অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপবিহীন রয়ে গেছে। ১৯৮৯-৯৫ সময়কালের শ্রমশক্তি জরিপে ১০ বছরের উর্দ্ধে সকল নারীর ৭৭% কে গৃহবধু এবং অর্থনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয়রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অন্যদিকে গৃহশ্রমের মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় আয়ের হিসেবে অন্তর্ভুক্তি বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে স্বীকৃতি লাভ করে জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) প্রভৃতি বৈশ্বিক সংস্থা কর্তৃক উৎসাহিত করা হলেও বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত এধরণের কোন বন্দোবস্ত গ্রহণ করা হয়নি। একটি গবেষণার তথ্যে জানা গেছে যে, আত্মপোষণশীল খাতে গৃহবধুরাদে পরিবারের সকলে গড়ে বছরে ১০০ দিন ব্যয় করে থাকে, পক্ষান্তরে গৃহবধুরা এর ক্ষেত্রে ব্যয় করে ২০০ দিন।

আত্মপোষণশীল খাতে ব্যয়িত মোট বার্ষিক সময়	-	৬৯০০০ মিলিয়ন ঘন্টা।
পুরুষ কর্তৃক ব্যয়িত সময়	-	২৫০০০ মিলি. ঘন্টা।
নারী কর্তৃক ব্যয়িত সময়	-	৪৪০০০ মিলি. ঘন্টা।

(তথ্যসূত্র ঃ- শামীম হামিদ; নারীদের গৃহস্থালী কর্মকান্ড এবং জিডিপি হিসাব - বিআইডিএস।)

এ হিসেব থেকে দেখা যায় যে, বার্ষিক হিসেবে আত্মপোষণশীল কাজের ৬৪ শতাংশ অবদান নারীর এবং ৩৬ শতাংশ অবদান পুরুষের। জাতীয় পর্যায়ে পুরুষের মজুরী নারীর চাইতে বেশী ধরলে আত্মপোষণশীল খাতের মোট আয়ের ৬৫ শতাংশ আসে পুরুষের থেকে, নারীর ২৮ শতাংশ এবং ছেলে-মেয়েদের ৭ শতাংশ। কিন্তু নারী-পুরুষের সম-মজুরীর হার ধরলে নারীর অবদান এক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায় ৪৮ শতাংশে এবং পুরুষের অবদান দাঁড়ায় ৪৭ শতাংশে।[৩২]

Dhaka University Institutional Repository

কৃষিতে নারী

গবেষণায় দেখা গেছে যে, গ্রামীন নারীরা কৃষি উৎপাদন ও নানাঅর্থনৈতিক কর্মকান্ডে স্বীকৃতিহীনভাবে অবদান রেখে চলেছে। বর্তমানে কৃষি শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ ৫৪.৪ শতাংশে উন্নীত হলেও নারীরা এখনো কৃষি শ্রমিকরূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি। সকল কৃষিকাজ ছাড়াও নারীরা চাষাবাদ ও শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়াও অধিকাংশ নারীরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদন ও বাজারের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা কর্মকান্ডে জড়িত থাকে। তারা জাল ও মাদুর বোনে, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরী করে, মুড়ি, পিঠা ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী তৈরী করে এবং আয় উপার্জনের সঙ্গে সংযুক্ত নানা কমংকান্ডে নিয়োজিত হয়। অবশ্য এগুলো এখনো গৃহকর্মরূপে বিবেচিত হয়। উইমেন ফর উইমেন প্রকাশিত খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য দ্বারা সম্পাদিত 'নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গীক পরিসংখ্যান' - গ্রন্থে কৃষি ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিয়োজিত নারী বিষয় বিশ্লেষণে, কৃষি শ্রমশক্তিতে নারীর সম্পৃক্ততায় যে পরিসংখ্যান তুলে ধরে (সারণী-৪.২৬) সেটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

১। কৃষিকাজে মহিলা জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকলেও অর্থনৈতিকভাবে এদের কর্মের মূল্যায়ন হয় না।

সারণী - ৪.২৬ কৃষি শ্রমশক্তিতে নারীর সম্পৃক্ততা (১৯৮৯)

কৃষি সম্পর্কিত কর্মতৎপরতা কৃষিজ উৎপাদন (প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা)	প্রাসঙ্গিক পেশা	অতিরিক্ত পেশা
নিজস্ব খামারে কর্মরত	১৭.৮	৪.৮
গৃহের কৃষিকাজে	৪.৭	৩.১
গরু-ছাগল পালন	৪.২	১.১
মজুরীভিত্তিক কৃষিকাজ	১২.৩	৩.১
মৎস চাষ	০.৭	-
মোট	**৩৯.৬**	**১২.১**
প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পৃক্ততা		
ধান ঝাঁনা	৩.০	৩.৩
খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ	০১.	-
মোট	**৩.১**	**৩.৩**
মোট সমসম্পৃক্ততা	**৪২.৬**	**১৫.৪**
খামার বহির্ভূত কর্মসংস্থান	১১.৮	৫.৬
মোট শ্রমশক্তির সম্পৃক্ততার হার	৫৪.৪	২১.০

২। বাংলাদেশে এখনো মহিলাদের কর্মে অংশগ্রহণকে খুব কমই হিসেবের মধ্যে আনা হয়। তথাপি কৃষি শ্রমশক্তিতে সম্পৃক্ততায় নারীর অংশগ্রহণ ৫৪.৪%, প্রাথমিক ও অন্যান্য পেশায় নারীর সম্পৃক্ততা ২১.০%।

৩। খামার বহির্ভূত কৃষি শ্রমশক্তিতেও নারীর সম্পৃক্ততা লক্ষ্যনীয়।

১৯৮৩-৮৪ অর্থবছরে বিবিএস সূত্র মতে, বাংলাদেশে হাঁস, মুরগী উৎপন্ন হয় ৭৯,৩৬৮ হাজার; উৎপাদিত ডিমের সংখ্যা ৩৫৬১২০ হাজার। মোট ছাগল-ভেড়া ১২৬৮

Dhaka University Institutional Repository

হাজার। এই বিপুল হাঁস, মুরগী, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি হিসেবে সরকারী পরিসংখ্যানে স্থান পেলেও এসবের উৎপাদনকারী হিসেবে নারীদের অবদান স্বীকৃত হয়নি।[৩৩]

কুঠির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পে নারী ঃ-

বিআইডিএস ১৯৮১ সালের গবেষণা জরিপে দেখিয়েছে যে, জরিপকৃত মোট ২১২৭৬ হাজার জনসংখ্যার মধ্যে ১০ বছর উর্দ্ধে বয়েসী ২১১৩ হাজার জন কুঠির শিল্পে নিয়োজিত ৩৩% নারী। এছাড়াও এই সমীক্ষায় বিভিন্ন শিল্পে নারীদের অংশগ্রহণের চিত্র অনুযায়ী মোট শ্রমিকের মধ্যে,

# ঘানি শিল্পে	-	৪২.৫%।
# ধান ভানা	-	৫৬.০%।
# মাদুর শিল্পে	-	৬২.৮%।
# বাঁশ ও বেত শিল্পে	-	৪৯.০%।
# ছোবড়া শিল্পে	-	৬৪.৩%।
# তাঁত বোনায়	-	৩৭.৬%।
# মৃৎ শিল্পে	-	৪৭.৯% নারী নিয়োজিত।

আবার বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প সংস্থার (বিসিক) এক জরীপে অতি প্রাচীনকাল থেকে ধান ভানার জন্য 'ঢেঁকি' ব্যাপকভাবে প্রচলিত হলেও তার উল্লেখ নেই।[৩৪] ফলে মিলে ধান ভানার মূল্য জাতীয় আয়ে অন্তর্ভূক্ত হলেও দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী এক বৃহৎ অংশ অর্থাৎ গ্রামীন নারীরা ঢেঁকিতে ধান ভানার দ্বারা যে মূল্য সংযোজন করে তা জাতীয় আয়ের বাইরেই থেকে যায়। এক্ষেত্রে নারীরা উৎপাদনশীল শ্রমশক্তিরূপে বিবেচিত হয় না।

449613

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঘরে বাইরে নারী পুণ:উৎপাদন ও উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ করলেও তার অদৃশ্যমানতার জন্য অবমূল্যায়িত হচ্ছে। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদান যথাযথভাবে প্রতিফলিত হলে নারী শ্রমকে দৃশ্যমান করে তুলবে। ফলে অন্যদিকে নারীদের গৃহকর্মের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন প্রচলিত জাতীয় আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে গুণগতভাবে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর অবদানকে তুলে ধরবে। গৃহস্থালী কর্মকান্ডে নিয়োজিত লক্ষ কোটি নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে রাষ্ট্রকে অধিক মনোযোগী করে তুলবে। সর্বপরি তা কেবল পুরুষ অবদানি স্বীকৃত 'অর্ধেক অর্থনীতি'-কে সমগ্র জাতির অর্থনীতিতে পরিনত করবে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে ও নারীঃ-

অর্ধেক মানব সম্পদ, মজুদ শ্রমবাহিনী এবং নাগরিক হিসেবে নারী দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় থেকে যদি দূরে থাকে তবে কাংখিত উন্নয়ন কোন ক্রমেই

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সম্ভব নয়।[৩৫] কিন্তু সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের নারী সমাজ সর্বত্রই তুলনামূলকভাবে অধঃস্তন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার সর্বত্রই নারী বৈষম্যের স্বীকার।

নারী তখনই উন্নয়নের অংশ গণ্য হতে পারবে, যখন তাকে মানব সম্পদরূপে দেখা হবে এবং তার উন্নয়নে জাতীয়ভাবে নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কঠোর হবে। কিন্তু বিদ্যমান নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কাঠামো বজায় রেখে নারীর উন্নয়ন সম্ভব নয়। বৈষম্য দূরীকরণে বৈষম্যের নিরোসন দরকার। সাধারণত: বৈষম্যের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় কাজ করে -

- প্রথমতঃ নারী ও পুরুষের মধ্যে ভিন্নতা -
  - দৈনন্দিন কাজ ও ভূমিকার ক্ষেত্রে,
  - দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে,
  - অবকাশ ও বিনোদনের ক্ষেত্রে।
- দ্বিতীয়তঃ পুরুষদের তুলনায় নারীর সীমিত অধিকার -
  - সম্পদের ক্ষেত্রে - যেমন জমি, অর্থ, ধন, প্রশিক্ষণ, জ্ঞান ও তথ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে,
  - পছন্দের ক্ষেত্রে - যেমন জীবন ও জীবিকা নির্ধারণ, বিয়ে ও সন্তান ধারণ এবং লালন-পালন ইত্যাদির ক্ষেত্রে,
  - সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে - যেমন মতামত প্রদান ও নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।[৩৬]

এসকল ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরোসনে সমতা আনয়ন করে নারীকে মানব সম্পদ হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ করতে হবে। এছাড়াও বস্তুগত সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ ও আদর্শিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরী করে দেয়ার মতো নারী-পুরুষ উভয়েই একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে জীবন-যাপনে সক্রিয় হয়। এসকল বিষয়ের উপর শুধুমাত্র পুরুষের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

কিন্তু এসব বিষয়ের পূর্বে অর্থাৎ যা মানুষকে সক্ষম, সামর্থশীল করে গড়ে তোলে তার পূর্বে মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজন পড়ে। এই মৌলিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। সাম্প্রতিক মানব উন্নয়ন ভাবনায় এই সকল পার্থক্য নিরোসনের লক্ষ্যে উন্নয়নে নারী-পুরুষের সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা উচ্চারিত হয়েছে। আর নারী-পুরুষের সম উন্নয়ন অধিকার সমুন্নত রাখার বিষয়টি পরিকল্পনাবিদ, নীতি নির্ধারকদের কোন বদান্যতা নয় বরং প্রতিটি সমাজের অগ্রগতির জন্য অপরিহার্যরূপে দেখাতে হবে। সেজন্য জাতিসংঘসহ নানা বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আজ বিভিন্ন দেশের উন্নয়নকে পরিমাপের জন্য নির্দেশক (Indicator) যেমন -

Dhaka University Institutional Repository

- প্রত্যাশিত গড় আয়ু।
- বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার।
- স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তির পরিধি।
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুযোগ প্রাপ্তিতে পরিমান এবং
- লিঙ্গান্তর সূচক অন্তর্ভূক্তি প্রভৃতি সূচকের তুলনামূলক ব্যবহার হচ্ছে যার

দ্বারা কতোটা প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলো এবং জনগণের জন্য পরিসেবা প্রাপ্তির পরিধি কতটুকু প্রসারিত হলো কেবল তা দিয়েই নয়, সেই সঙ্গে সেই দেশের নারী উন্নয়ন কতোটুকু ঘটেছে সেই নিরীখেও প্রতিটি দেশের উন্নয়নকে বিচার করা হচ্ছে।

পরিশেষে, লিঙ্গ সূচকের অন্তর্ভূক্তি প্রমাণ করে উন্নয়নে নারীর বিযুক্তি অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতিতে একক্ষভাবে পুরুষ নয় নারীকেও তার অবস্থা ও অবস্থানের পরিবর্তনের মাধ্যমে সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে। তা'না হ'লে গাড়ীর একটি চাকা ছোট হলে যেমন বেশী দূর যাওয়া যায় না, তেমনি নারী বৈষম্যতার মাঝে রেখে উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছানো যাবে না। উপরান্ত নারী উন্নয়ন শুধুমাত্র নারীর দারিদ্র বিমোচন, আয় উপার্জনে সক্ষম করে তোলা, জীবন যাত্রার মান উন্নয়নই নয় বরং সেই সঙ্গে নারীর মুক্তি এবং ক্ষমতায়নের বিষয়টিকেও ধারণ করতে হবে। যা মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে, লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন ও লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতায়ন সূচক দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। সমাজ-অর্থনীতিতে নারীর অবদান মূল্যায়ন পূর্বক উন্নয়নের মূল ধারায় আনয়নে মানব উন্নয়ন নির্দেশিত প্রতিটি সূচকের নিরীখে নারীর অধ:স্তন অবস্থার নিরসন করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার অধিকার নিশ্চিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। মানব সম্পদ হিসেবে তার সক্ষমতা গঠন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

*১ প্রবীর ঘোষ, 'যুক্তিবাদীদের চোখে নারী মুক্তি' দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ:- ১২১.

*২ তাসলিমা আখতার; 'মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'', বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ:- ৩.

*৩ শাহীন রহমান; 'জেন্ডার প্রসঙ্গ, ষ্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট' ডিসেম্বর ১৯৯৮, লালমাটিয়া, ঢাকা, পৃ:- ৮৮.

*৪ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং জরিনা রহমান খান, 'বাংলাদেশের নারী নির্যাতন', ১৯৮৭, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢা.বি. পৃ:- ২.

*৫ তাহমিনা আখতার,প্রাগুপ্ত, পৃ:- ৪.

*৬ Ayesa Noman, "Status of woman and fertility in Bangladesh", University Press Limited, 1984. P- 5.

*৭ জাতিসংঘ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন'৯৫-৯৬.

*৮ অমর্ত্য সেন, 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

*৯ শাহীন রহমান - প্রাগুপ্ত, পৃ:- ১০.

Dhaka University Institutional Repository

*১০ 'নারী ও উন্নয়ন' - প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিত, উইমেন ফর উইমেন, পৃ: ৭৪.

*১১ তাহমিনা আখতার অনুদিত তালিকার বিশ্লেষণ। *১২ নাজমা চৌধুরী, 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণঃ প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা' উইমেন ফর উইমেন, ঢাকা, পৃ:- ১৭।

*১৩ তাহমিনা আকতার, প্রাগুক্ত, পৃ:- ২৯।

*১৪ বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'গ্রামীন রাজনীতি ও নারী সমাজ', সমাজ নিরীক্ষণ, সংখ্যা ২০, ১৯৮৬, মনিকে, ঢাকা।

*১৫ Najma Chowdhury, "Women Politics in Bangladesh" in situation of women in Bangladesh, Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 1985, P- 2041.

*১৬ ফেরদৌস হোসেন, 'বাংলাদেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান'। বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, বি.আই.ডি.এস. ৫ম খন্ড, পৃ:- ১৬১.

*১৮ তাহমিনা আখতার, 'মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট', বাংলা একাডেমী, পৃ:- ৩৪.

*১৯ খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, নারী ও উন্নয়ন, প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান, পৃ: ১৪৮।

*২০ শাহীন রহমান, 'জেন্ডার প্রসঙ্গ' উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৮, পৃ: ৪৬.

*২১ খাদিজা খাতুন ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১.

*২২ T. V. RAO, Opt. Sit. P.-231.

*২৩ অমর্ত্য সেন, 'জীবনযাত্রা ও অর্থনীতি', আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৫; পৃ: ১০৫.

*২৪ Kawr, Parminder, "Human Resource Development for Rural Development", Anmol Pub. Delhi, 1996, P-238.

*২৫ T.V. RAO, Opt. Cit. P – 29.

*২৬ এম. এম. আকাশ, প্রাগুক্ত; পৃ: ১২.

*২৭ ইউ.এন.ডি.পি. ১৯৯৮, পৃ:- ১৩.

*২৮ এম. এম. আকাশ, 'বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন , উন্নয়ন পদক্ষেপ, ৫ম বর্ষ, ১৫ সংখ্যায় অনুদিত পরিসংখ্যান।

*২৯ এম. এম . আকাশ, প্রাগুক্ত।

*৩০ ড: নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, 'উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা - টাস্কফোর্স প্রতিবেদন', জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ:- ৪৫.

*৩১ শাহীন রহমান, 'জেন্ডার প্রসঙ্গ', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৬, পৃ: ২৬.

*৩২ শাহীন রহমান, 'জেন্ডার প্রসঙ্গ', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৬, পৃ: ৩৩.

*৩৩ শাহীন রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩.

*৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩.

*৩৫ সৈয়দা রওশন কাদির, 'স্থানীয় পর্যায়ে মহিলাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া : সমস্যা সম্ভাবনা', 'নারী ও রাজনীতি'সম্পাদনায় শমজ চৌধুরী, হামিদা আখতার বেগম, মাহমুদা ইসলাম, নাজমুন্নেসা মাহতাব, উইমেন ফর উলমন, ঢাকা, পৃ:- ১.

*৩৬ শাহীন রহমান, 'জেন্ডার প্রসঙ্গ', উন্নয়ন প্রদক্ষেপ, ১৯৯৮, পৃ:- ১০৭.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী

৫.১ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন

৫.২ পরিকল্পনার আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন

৫.৩ পরিকল্পনা ও নারী

৫.৪ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী কর্মসূচী

৫.৫ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে সম্পদ বরাদ্দ

৫.৬ পরিকল্পনাধীন কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও নারী

কোন দেশের জতীয় পরিকল্পনা সে দেশের রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক ও সামাজিক লক্ষ্যসমূহের অর্জনের নীতি ও ওকৌশল প্রয়োগের একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এ নীতি ও কৌশলগুলো সুষ্ঠভাবে প্রয়োগের জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা থাকে। বাংলাদেশে এরূপ সংস্থার নাম 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন'। ৪স্তর বিশিষ্ট (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে) বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার মধ্যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সবচেয়ে বেশী দৃশ্যমান এবং কার্যকর মাধ্যম। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা, উন্নয়ন কৌশল, নীতিমালো, কর্মসূচী ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৫টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হয়েছে এবং হচ্ছে।

যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক লক্ষ্যঅর্জনের জন্য উন্নয়ন নীতিমালা প্রনীত হয়, তার সবটুকুই মানুষকে কেন্দ্র করে। যদ্যত উন্নয়নের রয়েছে বহুমুখী দিক, যার একটি হলো মাথাপিছু আয় অন্যটি হলো সমৃদ্ধ জীবন ও স্বাস্থ্য। দারিদ্র বিমোচন ও মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণ - এ দু'টিও উল্লেখযোগ্য।[*১] এই লক্ষ্যে মানবীয় চাহিদাপূরণ তথা মানব সম্পদ উন্নয়ন, উন্নয়নের একটি আলোচ্য বিষয় হিসেবে বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতিমালায় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণের গুরুত্ব বহন করে।

এই অধ্যায়ে বিগত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে মানব সম্পদ উন্নয়নে নারীকে যেভাবে দেখা হয়েছে, তার উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপসমূহ ও কৌশল, দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনার বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য মানব সম্পদ, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নারী উন্নয়ন কোন পৃথক বিষয় নয়। মানব উন্নয়ন সূচক (ইউ.এন.ডি.পি.-র সূচক) অর্থাৎ মানবীয় চাহিদা পূরণই মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ এবং নারী সেই মানুষেরই এক অংশ।

৫.১ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কের আলোচনার একটি সেমিনারে বলা হয়েছে, "Analysis of human resources development (HRD) in a country such as Bangladesh involves aspects of health, population, education, employment, income distribution, poverty alleviation, issues of different special groups (e.g. Women, Youth, Children, Ethnic minorities), institution building."[*২] বিগত ৫টি পরিকল্পনাতে ৫মটি ছাড়া বাকি ৪টিতেই মানব সম্পদ উন্নয়নকে জনশক্তি পরিকল্পনা (Manpower Planning) এবং চাকুরী নিয়োগ (Employment) সংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বিগত পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ (মানব সম্পদ সম্পর্কিত বিষয়) আলোচনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টি উল্লেখ করা নেই। তবে ১)চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি, ২) আয়ের বন্টন এবং ৩) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ বিষয়গুলো অন্যান্য উদ্দেশ্যের সাথে রয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫):-

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সবপ্রথম সানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়টি উল্লেখিত হয়। তবে মানব সম্পদ উন্নয়নকে শুধুমাত্র নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে আবদ্ধ রাখা হয়। এখানে এই বিষয়টি ছাড়া মানব সম্পদ অন্তর্ভুক্ত যে সব বিষয় উদ্দেশ্যে বর্ণিত রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো:-

১। সমহারে উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য মৌলিক প্রয়োজন পূরণ নিশ্চয়তার দ্বারা জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন।

২। উন্নয়ন সুফলতার জন্য চাকুরীর সুযোগ বিস্তার করে জনগণের প্রয়োজন পূরণে আয় ও সম্পদ তৈরী করা।

৩। মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য অশিক্ষা দূর এবং প্রাইমারী শিক্ষার বিস্তার।

৪। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

এ ছাড়াও মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্বকে উপলব্ধি করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়, "Education is the foundation of human resource and the fulcrum of technology."[৩]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য (১৯৯০-৯৫)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যসমূহ হলো -

১. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
২. উৎপাদনমূলক চাকুরীর বিস্তার
৩. প্রাইমারী শিক্ষা এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন
৪. দীর্ঘমেয়াদী কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়ন
৫. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা
৬. ণ্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ
৭. দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
৮. আত্ম সম্পর্ক উন্নয়ন

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার বিস্তার, চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি এবং ক্ষমতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরক্ষরতাকে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান বাঁধা হিসেবে চিহ্নিত করে শিক্ষাখাতে অধিক অর্থ

Dhaka University Institutional Repository

বাজেটে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। যেখানে ১৯৭৯/৮০ সালে ১৭৬.৮ কোটি টাকা ছিলো সেখানে ১৯৮৪/৮৫ সালে ৪৯২.৭ কোট টাকায় উন্নীত করা হয়। এছাড়া জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে চাকুরী সুযোগ সৃষ্টি করার কৌশল গ্রহণ করে। এলক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অধিকহারে জনগণকে প্রদানের কথা বলা হয় এবং এই প্রশিক্ষণ ৫৪টি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মশালা কেন্দ্র (Vocational Training Institute – VTI's) এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (Technical Training Center – TTC's) দ্বারা পরিচালিত হবে।*৪

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ (১৯৯০-৯৫)

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রথমবরের মতো মানব সম্পদ উন্নয়নকে অন্যান্য উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের অন্যতম উপায় বলে স্বীকার করা হয়। এই পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য হিসেবে ৩টি জটিল বিষয়কে অন্যান্য উন্নয়নের একত্রিকরণ হিসেবে চিহ্নিত করে। যেমন -

১) জাতীয় আয় বৃদ্ধি,

২) মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র দূরীকরণ এবং চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি এবং

৩) আত্ম-নির্ভরশীল উন্নয়ন

এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কৌশল গ্রহণ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়, তা'হলো -

বিশেষ করে গ্রামীন এলাকায় সেই সকল জনহণ যারা নিজেদের সম্পর্কে বেশী সচেতন তাদের সামর্থ নিরুপনের মাধ্যমে তাদের সমস্যাকে চিহ্নিত করণ এবং পরিকল্পনা তৈরী ও তাদের দ্বারাই বাস্তবায়ন করায় কৌশল গ্রহণ করা।*৫

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)

মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণার নির্দেশক সংশ্লিষ্ট উক্ত পরিকল্পনার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য গুলি হলো:-

১। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ,

২। অধিক হারে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি,

৩। জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন,

৪। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং জ্ঞান নির্ভর সমাজ গঠন - এর উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন।

মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য - শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং কমিউনিটি স্কুলের মাধ্যমে দক্ষতা ও সামর্থের উন্নয়নকে কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

পঞ্চম পরিকল্পনার তৃতীয় অধ্যায়ে 'দারিদ্র দূরীকরণে চাকুরী এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন' শিরোনামে ইউ.এন.ডি.পি.-র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের সূচকের উল্লেখ্য করা হয়, যার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো মানব উন্নয়ন পরিমাপ করা হয় এবং উল্লেখ করা হয় যে, "The

Dhaka University Institutional Repository

low level of human resource development in Bangladesh is a serious, constraint to the development process of the country" পৃ: - ১৪৭.

৫.২ পরিকল্পনায় আলোকে মানব সম্পদ উন্নয়ন

মানব উন্নয়ন নির্দেশকের নিরীখে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উন্নয়নের কোন পৃথক অধ্যায় হিসেবে আলোচিত হয়নি। ৪র্থ

সারণী - ৫.১ বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের নির্দেশক

	Indicators	Unit	Estimates	
			For Bangladesh	Comparable Figures from other low Income ESCAP Countries
A.	Health			
1.	Life expectancy at birth	Year	50.00	62.00
2.	Population growth	Percent per year	2.40	1.90
3.	Infant mortality rate	Per 1000 live births	125	66.30
4.	Child mortality rate	1-5 Years of age, per 1000	22.00	7.40
B.	Education (of population age, 5 years and above)			
5.	Illiterate	Percent of total population	57.90	-
6.	Education, Class I to IV	-do-	23.00	-
7.	Education, Class V to X	-do-	13.10	-
8.	Education, SSC and above	-do-	5.50	-
C.	Employment			
9.	Total Employment	In million person – year	27.89	-
10.	Total unemployment / underemployment	In percent of the total labour force	33.00	-
11.	Share of agriculture, forestry and fishing in total employment	In percent	58.00	-
12.	Share of manufacturing sector in total employment	In percent	8.90	-
13.	Share of trade, hotels and restaunants in total employment	In percent	11.65	-
14.	Share of finance, business, services in total employment	In percent	0.05	-

উৎস : - মাহমুদুল আলম, বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ ৪র্থ (১৯৯০-৯৫) পরিকল্পনা আলোচনায় উল্লেখিত টেবিল।

পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের নির্দেশক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, আয়ু, আয়, শিক্ষা, জন্মহার প্রভৃতির পরিমাপের মধ্যে মানব সম্পদকে সীমিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও পরিকল্পনাসমূহে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্নভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদান উন্নয়নের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে এবং দেখা গেছে যে, সকল উপাদান (যেমন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রম ও জনশক্তি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সমাজ কল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা, লোক প্রশাসন) মিলিয়ে মোট যে অর্থ বরাদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যান্য উন্নয়নমূলক একক খাত (যেমন, কৃষি-পানি সম্পদ, শিল্প, প্রাকৃতিক গ্যাস ও সম্পদ, যোগাযোগ, পরিবহন, আশ্রায়ন) থেকে খুবই কম (সারণী - ৫.২) - লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, কৃষি ও পানি সম্পদ উন্নয়নে ১ম থেকে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পর্যন্ত মোট অর্থ বরাদ্ধ ছিলো যথাক্রমে ৩১.২, ২৮.৯, ২৯.১, ২১.০৬,

Dhaka University Institutional Repository

২৭.০৬ কোটি টাকা। শিল্পখাতে যথাক্রমে - ১৩.৬, ১৭.০০, ১০.৪, ২২.৯৩ এবং ১০.২৬ কোটি টাকা। অপরদিকে মানব সম্পদ উন্নয়ন (সমস্ত উপাদান মিলিয়ে) অর্থ বরাদ্ধ ছিলো যথাক্রমে ১১.১, ৯.২, ১৭.২, ৯.৬০ এবং ১৪.৭৫ কোটি টাকা।

সারণী - ৫.২ এ ৪টি পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন ও অন্যান্য উন্নয়নে তুলনামূলক বরাদ্ধ দেখানো হলো-

Sector		Realized Expenditure (In Crore Taka at the Base Year Prices)				
		1st Plan (1973-78)	Two Yaer Plan (1978-80)	2nd Plan (1980-85)	3rd Plan (1985-90)	4th Plan (1990-95)
1.	Agriculture, water resources and Rural Development	31.2	28.9	29.1	21.06	27.06
2.	Industries	13.6	17.0	10.4	22.93	10.26
3.	Power, gas and natural resource	13.8	16.6	20.3	23.22	20.50
4.	Transport	20.3	18.8	13.7	10.82	15.32
5.	Communication	20.3	18.8	13.7	10.82	15.32
6.	Physical Planning and housing	6.5	6.1	4.7	3.69	3.05
7.	Human resource development*	11.1	9.2	17.2	9.60	14.75
8.	Others	3.5	3.4	4.6	17.31	7.66
Total		100.0 (2,074.00)	100.0 (5,359.00)	100.0 (15,303.50)	100.0 (17,129.34)	100.0 (40,730.00)

* Includes education and religious affairs, labour and manpower, health, population control, social welfare, science and technology research, public administration.

উৎস: মাহমুদুল আলম, বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার উপর একটি বিশেষ সেমিনারে মানব সম্পদ উন্নয়ন আলোচনা।

উল্লেখ্য যে, ৪র্থ পরিকল্পনাতে বাস্তবায়ন কৌশলে মানব সম্পদ উন্নয়নকে জনশক্তি পরিকল্পনা (Manpower Planning) এবং চাকুরী দানের (Employment) সঙ্গে এক করে দেখা হয় এবং বলা হয় This (Human Resource Development) is a new concept in manpower planning.*৬ খাত ভিত্তিক অধ্যায়ে (Sectoral Chapter - XV) জনশক্তি এবং শ্রম বিষয়ের আলোচনা মানব সম্পদ উন্নয়নকে এভাবে দেখানো হয়েছে যে, "Human resource development is much more than an Instrument of development, it is the ultimate objective of the development process. Human resource mobilization and development issues and efforts, therefore, remain the focal point of the process of development in the country." P. XV – 1.

এই পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নকে পর্যাপ্ত পরিমানে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদানসমূহকে বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে বিষয়ের নিরীখে একটি অধ্যায়ে বা একই জায়গায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। মানব সম্পদ উন্নয়নের সমস্ত উপকরণকে যথা:- জনগণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চাকুরী, প্রতিষ্ঠান (Institution Building) বিশেষ সংঘের কর্মসূচী (Programmes for special group) প্রভৃতিকে একটি বিশেষ অধ্যায়ে আলোচিত হয়নি। ফলত মানব উন্নয়নের খুব বেশী ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন - ১৯৯৬ (ইউ.এন.ডি.পি.) থেকে দেখা যায় যে, (১৯৯৩ পরিসংখ্যান) অনুযায়ী

- ৪৭.৫% মানুষের মাথাপিছু আয় খুবই কম।

Dhaka University Institutional Repository

- ৭৬.৯% মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে।
- ৫২.৪৫% মানুষ স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত।
- ৬৩.৩৫% মানুষের পয়ো:নিষ্কাসন ব্যবস্থা নেই।
- ২৬% শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায় না।

উক্ত প্রতিবেদনে আরো দেখা যায় যে, জন্মকালীন গড় প্রত্যাশিত আয়ু ১৯৬০ সালে ছিলো যেখানে ৩৯.৬ বছর সেখানে ১৯৯৩ সালে বেড়ে মাত্র ৫৫.৯ বছরে উন্নীত হয়েছে। জন্মকালীন শিশুমৃত্যু হার ১৯৬০ সালে ছিলো ১৫৬জন, সেখানে ১৯৯৩-তে কমে ১০৬ জনে নেমে এসেছে। অবশ্য ১৯৯৫ সালে এই নির্দেশক কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন - ১৯৯৫ সালে প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিল ৫৮ বছর, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯২%, বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার ৪৭.৩%, জন্মকালীন শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৭৮ জন এবং ৫বছর বয়সকালীন শিশুমৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৯.৭ জন। (পর পৃষ্ঠায় সারণী - ৫.৩ দ্রষ্টব্য)

উল্লেখ্য ৫ম পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নের নিম্ন হারের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ তথা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উন্নয়নের মাধ্যমে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শ্রম উৎপাদন এবং প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণায় মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয় হচ্ছে,

১। একটি দীর্ঘ ও সুস্থ্য জীবন উপভোগ,

২। জ্ঞানার্জন এবং

৩। প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রবেশাধিকার যার দ্বারা একজন মানুষ সক্ষম হয়ে উঠে। এ প্রেক্ষাপটে পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়নকে বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে যে, জ্ঞানার্জনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন কিন্তু সে শিক্ষা শুধুমাত্র অক্ষর জ্ঞান বা প্রাথমিক শিক্ষার দ্বারা অর্জন সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার কর্মসূচী দ্বারা জ্ঞানার্জনের জন্য প্রাথমিক ধাপ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, আবার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, বৃত্তিমূলক কর্মসূচী, দারিদ্র দূরীকরণে চাকুরীর সুযোগ সৃষ্টি প্রভৃতির মাঝে মানব সম্পদ উন্নয়নকে দেখার মধ্যে মানুষের সক্ষমতা গঠন হতে পারে না। উপরন্তু মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে আদৌ মানব সম্পদ উন্নয়ন হতে পারে না। কেননা, 'উন্নয়ন' ছাঁদের নিয়ম মাফিক মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়লেও অনেক সময়ে দারিদ্র কমেনা, কমেনা গৃহহীনতা। পুষ্টি বাড়ে না, জনস্বাস্থ্যের হাল ফেরে না।[*৭] এছাড়া মানব উন্নয়ন সূচক নির্দেশের ভিত্তিতে পরমায়ু, শিক্ষার মান ও আয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রেও কাংখিত উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। আয়ের প্রবৃদ্ধির মাপকাঠিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়। ১৯৬৫-৮০ কাল পর্বে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বাংলাদেশে বৃদ্ধিতো পায়ইনি বরং দশমিক তিন শতাংশ হারে প্রতি বছর হ্রাস পেয়েছে। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ নয়-দশ বছরেও বাংলাদেশের জনগণ পাকিস্তান আমলে

Dhaka University Institutional Repository

অর্জিত আয়ের মাত্রায় পৌঁছতে পারেনি। ১৯৮০-র পর বাংলাদেশের ইতিবাচক হারে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই কিন্তু সেই হার ছিল মাত্র ২.১ শতাংশ। ১৯৯২ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারী শিক্ষা ব্যয় ছিল মোট জাতীয় আয়ের মাত্র ২.৩ শতাংশ

সারণী - ৫.৩ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়নের অগ্রগতি

নির্দেশক	এছর	
	১৯৯১	১৯৯৫
১	২	৩
নারী প্রতি গর্ভধারণের হার	৪.৩	৩.৪
প্রতি হাজারে জন্ম হার	৩২	২৭.৫
প্রতি হাজারে মৃত্যু হার	১৩	৯
জন্মকালীন শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজারে)	৯১	৭৮
জীবিত জন্মে মাতৃমৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)	৪.৭	৪.৫
গর্ভনিরোধ হার (%)	৪০	৪৮
জন্মকালীন প্রত্যাশিত আয়ু (জাতীয়)	৫৬.১	৫৮
নিরাপদ পানীয় (% জনসংখ্যা)	৮০	৯৬
জনসংখ্যা প্রতি হাসপাতাল সংখ্যা	৩২০৫	৩৪৫৩
জনসংখ্যা প্রতি চিকিৎসক	৪৫২৬	৪৮৭০
পয়ো:নিস্কাসন ব্যবস্থা (% জনসংখ্যা)	৯	৩৫.৩
বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার (জাতীয়)	৩৫.৩	৪৭.৩
প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার (৬-১০ বছর জাতীয়)	৭৬	৯২

উৎস : ৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার: পৃ:- ১৫৩.

এবং স্বাক্ষরতার হার ৫০ অতিক্রম করেনি।[৮] গড় আয়ু প্রত্যাশা (১৯৯৩)তে ৫৫.৯, স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ প্রাপ্ত লোকসংখ্যা (১৯৮৫-৯৫) ৪৫ শতাংশ, উপযুক্ত পানীয় পানের সুযোগ প্রাপ্ত লোকসংখ্যা (১৯৯০-৯৫) তে ৯৭ শতাংশ, পয়:ব্যবস্থার সুযোগ প্রাপ্ত জনসংখ্যা ৩৪ শতাংশ। সুতরাং মানব উন্নয়নের সাধারণ দিক অর্থাৎ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গয়মায়ু, পানীয় জলের সুযোগ, আয় প্রভৃতির বিচারে যেখানে এখনো কাংখিত লক্ষ্য পূরণ হয়নি, সেখানে মানব সক্ষমতা গঠন ও তার ব্যবহারের পরিবেশ সৃষ্টি অনেক দূরগত বিষয়। উন্নয়নকে অবশ্যই শুধুমাত্র আয় ও সম্পদের বিস্তার প্রক্রিয়াকে অতিক্রমিত হতে হবে।

একইভাবে বাংলঅদেশের নারীদের এবং পুরুষদের মানব উন্নয়ন সূচক আরাদাভাবে পরিমাপ করা হয় তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ১৯৯৪ সালে নারীদের মানব উন্নয়নের সূচকের মান (০.৩৩) এর তুলনায় পুরুষদের মানব উন্নয়ন সূচকের মান (০.৪৪) ছিল ২৫ শতাংশ বেশী। ১৯৯৫ সালে যেহেতু নারীদের মানব উন্নয়ন সূচক আরো খানিকটা হ্রাস পেয়েছিল অথচ পুরুসদের সূচকটি স্থির থেকে গিয়েছিল। সেহেতু মানব উন্নয়নের সামগ্রিক সূচকের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ব্যবধান ১৯৯৫ সালে আরেকটু বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ শতাংশ।[৯]

সুতরাং মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণায় মানব উন্নয়ন সূচকের যেখানে এই অবস্থান সেখানে নারীর অবস্থান আরো করুণ হবে এটাই স্বাভাবিক।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৩ পরিকল্পনায় নারী

জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী ইস্যুটি এযাবৎকাল উপেক্ষিতই থেকেছে। কেননা নারীকে নারী হিসেবেই দেখেছে, মানুষ হিসেবে নয়। সংবিধান ও আইনের চোখে নারী-পুরুষের সমতার কথা বলা হয় কিন্তু এখন পর্যন্ত জাতীয় পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূল কর্মকান্ডের সাথে যোগ করা হয়নি। বরং গ্যাস, পানি, কৃষি সম্পদের মতো নারীকে একটি পৃথক অধ্যায়ে বর্ণিত করে আসছে। এমনকি নারী যে অর্ধেক মানব সম্পদ এটা স্বীকার করেও মানব সম্পদ উন্নয়ন অধ্যায়েও অন্তর্ভূক্ত করেনি। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের সামাজিক অঙ্গনে নারী-পুরুষের বৈষম্য অবসানের লক্ষ্যে ও নারী উন্নয়নের মূলমন্ত্র নিয়ে নারী উন্নয়ন ধারণাটি আসে দারিদ্র বিমোচনের প্রেক্ষাপট থেকে। দেখা যায় অতীতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিলো না। উন্নয়ন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারীরা ছিল অনুপস্থিত। ৭০ - এর দশকের শেষ ভাগ হতে এদেশের গ্রামীন ও তৃণমূল স্তরের জনগণ, বিশেষতঃ নারী সমাজের মাঝে ক্ষমতায়ন কার্যক্রম বর্দ্ধিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বেসরকারী উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলো দাতা গোষ্ঠীর সাহায্যপুষ্ট হয়ে কাজ করা শুরু করে। (বিষয়টি ২য় অধ্যায়ে ২.৩-এ ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে।) ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালে গণতান্ত্রিক পরিবেশে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দু'জন নারী প্রধান নেতৃত্বে আসেন।কিন্তু এর পরেও নারী উন্নয়নে তেমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি কেননা তারা উভয়েই নিহত পিতা বা স্বামীর অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রেরই প্রতিনিধি হয়ে ক্ষমতায় এসেছেন। তাই জাতীয় বাজেট তথা পরিকল্পনাগুলোতে নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য যতোটা না আগ্রহী হতে দেখা যায় তার থেকে বেশী দুঃস্থ, হতদরিদ্র নারী হিসেবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণের মাঝে বেশী সীমাবদ্ধতা হতে দেখা যায়।

৫.৪ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী কর্মসূচী

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেই উন্নয়ন অগ্রাধিকার নিরুপনে সরকারের মনোভাব প্রতিফলিত হয় এবং এখানেই দেখা যেতে পারে সরকার কিভাবে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর ভূমিকার বিষয়টিকে কিভাবে বিবেচনা করছে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) ঃ

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যের নিরীখে কোথাও নারীর বিষয় আলোচিত হয়নি। নারী ইস্যু এসেছে কেবল মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুনর্বাসন করার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত করে। সমাজ কল্যাণ অধীনে নারী উন্নয়নের উদ্দেশ্যে কোন পৃথক বাজেট বরাদ্ধ করা হয়নি। এই পরিকল্পনায় নারী বিষয়ক মোট ৫টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়, কিন্তু তা নির্দিষ্ট সময়ে বাস্তবায়িত হয়নি।[১০]

পরবর্তীতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাধীন সময়েই উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকার কথা উপলব্ধি করে ১৯৭৬ সালে প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

নামে একটি বিশেষ বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ মহিলাদের জন্য কতিপয় প্রকল্প যেমন - জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকার কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পুরকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে একটি কর্মসূচীও বাস্তবায়িত হয়নি। সমগ্র পরিস্থিতিই অপরিবর্তিত থেকে যায়।"[১১]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)

পাঁচ বছর মেয়াদী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার স্থলে ১৯৭৮ সালে ২য় পরিকল্পনা হিসেবে দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কেননা, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মুহূর্তে আরো একটি বড় পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ সাধ্য ছিল না। এছাড়া ২০০০ সাল পর্যন্ত (১৯৮০ থেকে) একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা গ্রহণের প্রত্যয়ে ভাঙ্গা দু'টি বছরের জন্য একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।"[১২]

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়,

১. দারিদ্রতা হ্রাস করা,
২. আয় বন্টনে সমতা আনয়ন,
৩. ৫.৬ ভাগ হারে উন্নয়ন অর্জন করা,
৪. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা,
৫. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীয় পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করা,
৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস করা,
৭. কৃষিখাতে ৪.১ ভাগ উন্নয়ণ হার অর্জন করা।

এখানে উদ্দেশ্যের নিরীখে নারী অনুপস্থিত। তবে এই পরিকল্পনাকালীন সময়ে (১৯৭৮-৮০) নারীর ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় রূপান্তরের ক্ষীণ উদ্যোগ পরিলক্ষীত হয়। নারীর কর্মসংস্থান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রথক কর্মসূচী গৃহীত হয় এবং নারীর উন্নয়নে ১০৫.৬০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ হয়।

দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেয়া হয় যাতে নারীরা তাদের আর্থ-সামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারেন। এ লক্ষ্যে নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কৃষিভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী, কুঠির শিল্প স্থাপন, উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন এবং কর্মজীবি নারী ও তাদের শিশুদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়। এ সময়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত ৫টি কর্মসূচীর সাথে আরো দু'টি প্রকল্পসহ মোট ৭টি প্রকল্প গৃহণ করা হয়। কিন্তু দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনার শেষে (ক) বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, (খ) পরিকল্পনা ও উন্নয়ন সেবা এই দু'টি মাত্র সমাপ্ত হয় এবং প্রথম পরিকল্পনার শেষদিকে ১৯৭৮ সালে নারীদের উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয় নারী সংক্রান্ত ভিন্নতর এবং কিছুটা ব্যাপকভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। এতে প্রথম উন্নয়ন ইস্যু হিসেবে নারী উন্নয়নকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, যাতে নারীরা তাদের আর্থসামাজিক অধিকার ভোগ করতে পারেন। যদিও এই পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, বেকারত্ব, নিরক্ষরতা, পুষ্টিহীনতা উত্যাদির প্রেক্ষাপটে মোটা দাগে কতগুলো উদ্দেশ্য ঘোষিত হলেও নারী বা তাদের সমস্যা এখানে অনুল্লেখ্য থেকেছে। ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীদের জন্য যে সকল লক্ষ্য নির্ধারিত হয় সেগুলি হচ্ছে :-

- জাতীয় উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমশ: বৃদ্ধির জন্য উপযোগী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা সুযোগ ও বিশেষ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটানো।
- নারীদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা এবং উপাজর্ন্তনমূলক কাজে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ বিস্তৃত করা।
- উন্নততর শিশু নিরাপত্তা ও পরিচর্যা ব্যবস্থা প্রচলন করা।

এই লক্ষ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীগুলো নিম্নরূপঃ-

১। নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং উৎপাদন কেন্দ্র,

ক) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১০০টি থানায় ১০০নারীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হবে (প্রত্যেকটি জেলায় ৫টি থানা অন্তর্ভূক্ত করা হবে)। এইসব কেন্দ্র প্রায় ৩০,০০০ নারীকে প্রতি বছর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সময়ে মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা দাঁড়াবে ১,৫০,০০০। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা' হবে গৃহপালিত পশু, ডেইরি ফার্ম, গার্মেন্টস, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প। প্রত্যেকটি উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আবার পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি, মৌলিক স্বাস্থ্য, বয়স্ক শিক্ষা, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

খ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়নের সময়কালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূণ্য পদে ৫০% নারীদের নিয়োগ দানের ব্যবস্থা করা হবে। এই কর্মসূচীর আওতাধীনে নারীদেরকে কার্যকরী প্রশিক্ষণ দানের জন্য সংগঠিত করতে হবে। নারী শিক্ষকের চাহিদা ও যোগান পূরণের জন্য প্রত্যেক বৎসরে ৫০০জন নারী শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিবে। এবং আশা করা হচ্ছে যে, প্রশিক্ষণবিহীনদের মধ্যে থেকে ২,৫০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে।

গ) দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নকালে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য বিশেষ ইনষ্টিটিউট স্থাপন করা গবে। এই ইনষ্টিটিউটে যে সব নারীদের

Dhaka University Institutional Repository

জুনিয়র পর্যায়ে লেখাপড়ার যোগফ্রতা রয়েছে তাদেরকে প্রশিক্ষিকা হিসেবে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। তা' ছাড়া এই ইনষ্টিটিউটে নেতৃত্ব সৃষ্টির জন্য নারীদের প্রশিক্ষণ দিবে। মহিলাদের শিক্ষাকে উৎসাহিত করার জন্য এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বিশেষ স্টাইপেন্ড এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

২) মহিলাদের জন্য সেবা

কর্মজীবী মহিলাদের বাসস্থানের অসুবিধা বিবেচনাপূর্বক দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে মহিলা হোষ্টেল স্থাপন করা হবে। দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের সমাজে পুনর্বাসিত এবং আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কার্যকরী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। চারটি দুঃস্থ নিবাস এবং চারটি সীমিত ব্যয়ে হোষ্টেল কর্মজীবী মহিলাদের জন্য পরিকল্পনাধীন সময়ে স্থাপন করা হবে বলে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়।

৩) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন

মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি কল্পে পরিকল্পনাধীন সময়ে ৪টি পোষাক শিল্প, ৩টি ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, ১টি রেডিও মেরামত এবং ১টি টেক্সটাইল প্রিন্টিং স্থাপন করা হবে। এই সবের পাশাপাশি ৪টি টেক্সটাইল মিল, টেক্সটাইল শিল্প সেকটরের আওতাধীন প্রতিষ্ঠিত হবে, যেখানে মহিলাদের নিয়োগ করা হবে।

৪) শিশু কার্যক্রম

শিশুদের ন্যূনতম মৌলিক চাহিদা পূরণের এবং সঠিক বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং এ পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেয়া হয় যে, পরিবার কল্যাণ, পুষ্টি, প্রশিক্ষণ, ডে কেয়ার সার্ভিসের উপর। পাশাপাশি নিম্ন আয়ভূক্ত মহিলাদের শিশুদের নিরাপত্তা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ২০টি ডে কেয়ার এবং ডে-নার্সারী খোলা হবে বলে লক্ষ্য মাত্রা ধার্য করা হয়। শিশুদের শারীরিক, নৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য শিশু একাডেমীর ২০টির অধিক শাখা খোলা হবে।

৫) জাতীয় মহিলা পরিষদ

ঢাকায় জাতীয় মহিলা সংস্থা গঠন করা হবে। মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় এই সংস্থার সচিবালয় হিসেবে কাজ করবে। এই সংস্থা মহিলা বিষয়ক ইন্নয়ন কর্মকান্ড দেখাশোনা, সমন্বয় এবং মাহলা উন্নয়নের জন্য নীতি গ্রহণকল্পে সুপারিশ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

৬) দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনমূলক কর্মসূচী

সমাজে মহিলা সচেতনতা এবং মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার জন্য বিস্তৃত আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করার জন্য পরিবর্তিত প্রতিনিধি, প্রকাশনা, ফ্লিম, পোষ্টার এবং অন্যান্য গণমাধ্যম ব্যবহার করার সুপারিশ করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৭) মহিলাদের সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণমূলক গবেষণা কর্মসূচী

মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে গবেষণা সেলকে আরো শক্তিশালী করতে হবে বলে উল্লেখ করা হয়, এক্ষেত্রে কুমিল্লা ও বগুড়ার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী নির্দিষ্ট গবেষণা কর্মসূচী অর্থাৎ মহিলাদের চাহিদা সম্পর্কিত গবেষণা কর্মসূচী অর্থাৎ মহিলাদের চাহিদা সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনার জন্য আর্থিক সাহায্য দিবে। BIDS এবং অন্যান্য ইনষ্টিটিশনকে মহিলাদের চাহিদা ও অন্যান্য দিক সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য ব্যবহার করা হবে। প্রয়োজনীয় তথ্য যোগানের জন্য ব্যাপকভিত্তিতে তথ্যসেল স্থাপন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[১৪]

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের কথা আরো উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হয়। এতে বলা হয়, নারীদের সুপ্ত সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে তাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করাকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করতে হবে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী পরিকল্পনার ন্যায় দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য মহিলাদের সমন্বয়ে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক - এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি থেকে মহিলা উন্নয়নের মূল লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিলো নিম্নরূপ -

ক) স্বাস্থ্য ঃ এই কার্যক্রমে শিশু ও মাতৃমঙ্গল, পরিবার-পরিকল্পনা, পুষ্টি-টিকাদান কার্যক্রম, পারিবারিক স্বাস্থ্য শিক্ষা, পয়িবেশ ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গ্রাম কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এই লক্ষ্যে পল্লী অঞ্চলে ১২২৫টি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদকালে দাঁড়াবে ৩,০০০টিতে।

খ) শিক্ষা ঃ পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যকার শিক্ষার বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার মহিলাদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত ও তরান্বিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। অতীতে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ সত্ত্বেও প্রধানত শিক্ষা ব্যবধানের কারণে উভয়ের মধ্যে অসমতা রয়ে গেছে। তাই গ্রামীন মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকার বৃত্তি প্রদান ছাড়াও বিশেষ ভর্তুকির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাই বর্তমান পরিকল্পনার সময়ে প্রতিটি পুরনো জেলার একটি করে মেয়েদের কলেজ এবং প্রতিটি নতুন জেলায় একটি করে মেয়েদের স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে ভবিষ্যতে কেবল মহিলা শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণের নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ৫০টি আসন বিশিষ্ট মহিলা হোষ্টেল নির্মান করা হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

গ) কর্মসংস্থান ঃ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সরকারের চূড়ান্ত লক্ষ্য মহিলা কর্মীদের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা এবং দেশের শ্রমশক্তির সাথে তাদের সম্পৃক্ত করার কথা স্বীকার করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারী চাকুরীসমূহে মহিলাদের কোটা ১০% থেকে ১৫% বৃদ্ধি করতে হবে। স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা খাতে ৬০ শতাংশের বেশী চাকুরী মহিলাদের দ্বারা পূরণ করা হবে বলে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

মহিলাদের আর্ত-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে,

১. অর্থোপার্জনকারী কর্মকান্ডে নারী সমাজের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীর বৈষম্য কমিয়ে আনা।

২. শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ধরণের এবং দক্ষতা প্রশিক্ষণের ব্যাপারে অধিকতর হারে অংশগ্রহণের জন্য নারী সমাজকে উৎসাহিত করা।

৩. নারী সমাজের স্বনিয়োজিত কর্মসংস্থানের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে ঋণ সুবিধার সম্প্রসারণ করা।

৪. চাকুরী প্রার্থী এবং চাকুরীরত মেয়েদের জন্য আবাসিক সুবিধা সম্প্রসারণ এবং কর্মজীবী কর্মজীবী মহিলাদের শিশু সন্তানের জন্য কম্যুনিটি ভিত্তিক দিবাযত্ন সুবিধার বিস্তার করা।

৫. বিভিন্ন স্তরের মহিলাদের জন্য নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬. শিশুদের নৈতিক, দৈহিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. সামাজিকভাবে অসহায় ও পরিত্যক্ত নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ

উপরোক্ত বিষয়াবলী অর্জনের লক্ষ্যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ গৃহীত হয়,

১. সার্বিক উন্নয়নে নারী সমাজ ও শিশুদের অবস্থার উন্নয়নকে একটি অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মাদের জন্য একটি সুপ্রীম কাউন্সিল বা সর্বোচ্চ পরিষদ গঠন করা। প্রেসিডেন্ট এই কাউন্সিলের প্রধান। এর কাজ হচ্ছে শিশু ও মায়েদের জন্য প্রধানত: শিশু ও মাতৃমঙ্গল, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের পুনর্বাসনের মতো পদক্ষেপ করা। সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমের সম্পূরক হিসেবে বেসরকারী সংস্থাসমূহকে নারী সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে অবদান রাখতে উৎসাহিত করা হবে। তা'ছাড়া দরিদ্র মহিলাদের জন্য সামাজিক, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানকল্পে বেসরকারী সংস্থাসমূহকে জোরদার করা হবে।

২. স্বল্প ব্যয়ে শিশুদের জন্য দিবা-যত্ন কেন্দ্র খোলা গবে। এতে করে সংগঠিত শ্রমশক্তি হিসেবে নারী সমাজ বিকাশ লাভ করবে। এধরণের কার্যক্রমের বিকাশ কল্পে স্থানীয় উদ্দোগ ও মডেল উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হবে।

৩. বিভিন্ন গ্রামীন সমাজ সেবা প্রকল্প এবং থানা ভিত্তিক উৎপাদন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে নারীদের দক্ষতা প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। চাকুরী ও শ্রম দক্ষতা কেন্দ্রিক প্রশিক্ষণের উপর

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ মনোযোগ দেয়া হবে। মহিলাদের কাজের চাপ কমানোর জন্য প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের প্রয়াস চালাতে হবে। সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করা হবে যাতে তা' নারী সমাজের সুপ্ত সম্ভাবনার সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও স্বয়ংসম্পূর্ণতা সুনিশ্চিত করে।

৪. নেতৃত্ব বিকাশ কার্যক্রমে জোর দেয়া হবে যাতে মহিলাদের ভেতর সেচ্ছা উদ্যোগ ও অতিরিক্ত সচেতনতা জন্ম নেয়। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার, বিশেষ সুবিধা সংরক্ষণ এবং তাদের নিজেদের ও সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ইস্যু ভিত্তিক চলচিত্র নির্মাণ, গবেষণা ও প্রকাশনার মতো প্রচার ধর্মী উদ্দোগ হাতে নেয়া হবে।

৫. উদ্বুদ্ধকরণ শিক্ষার জন্য প্রতিটি মহিলা কর্মসূচীতে অ-প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপাদানসমূহ যেমন, স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার-পরিকল্পনা, কৃষি সম্প্রসারণ ও স্বনির্ভরতার উপর প্রশিক্ষণ অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

৬. মহিলাদের কার্য্যক্রম বহুবিধ হওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। দিক নির্দেশনা প্রণয়ন ও মহিলাদের কার্যক্রমে ব্যবহারিক সমন্বয় সাধনের জন্য একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হবে। সমন্বয় কমিটির উপর মহিলাদের কার্যক্রমের পরিচালনা, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নেরও দায়িত্ব থাকবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার কৌশলসমূহ অর্জনের কর্মসূচীসমূহ

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কৌশলসমূহ কয়েকটি মূল কর্মসূচীর মাধ্যমে অর্জিত হওয়ার কথা। যথা:-

১) দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে যাতে করে বেকার ও নিরাশ্রয়ী নারীরা আরো বেশী হারে এসব কেন্দ্রের আওতায় আসে। প্রধানত: হাঁস-মুরগী পালন, দুগ্ধ উৎপাদন, পশু পালন, পোষাক তৈরী, গার্মেন্টস, হস্ত শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের উপরই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্রে পরিবার-পরিকল্পনা, বয়স্ক শিক্ষা, পুষ্টি, মৌলিক স্বাস্থ্য এবং সমবায় ব্যবস্থাপনার উপরও প্রশিক্ষন দেবে বলে উল্লেখ করা হয়।

২) মহিলাদের জন্য সেবা ঃ কর্মজীবী মহিলাদের তীব্র আবাসিক সংকটের কথা বিবেচনা করে ফাকার কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ এবং খুলনা হোষ্টেলের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করা হবে। তা'ছাড়া নতুন নতুন জায়গায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য আবাসিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি পাবে। বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থাসমূহের মাধ্যমে মহিলাদের স্ব-নিয়োজিত কার্যক্রমের প্রতিও সমর্থন যোগানো হবে বলে বলা হয়।

৩) **কর্মজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র ঃ** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় নিম্ন বেতনভুক্ত মায়েদের সন্তানেরা মায়েদের কর্মস্থলে থাকার সময় বাড়িতে অযত্নে পড়ে থাকে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বিভিন্ন স্থানে নিম্নবেতনভুক্ত মায়েদের শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র খোলা হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। আশা করা হয় পরিকল্পনাকালে এ ব্যাপারে ইউনিসেফের সহযোগিতা পাওয়া যাবে। সাহায্য আসবে দিবা-যত্ন সেবার উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায়।

৪) **মহিলা একাডেমী এবং জাতীয় সংস্থার সুদৃঢ়করণ ঃ** বর্তমানে মহিলা একাডেমীকে প্রাপ্ত সনদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহারের লক্ষ্যে আরো জোরদার করা হবে। একাডেমীটি হবে দক্ষতা উন্নয়ন, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষনের একটি কেন্দ্র।

৫) **বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর তৎপরতা ঃ** দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর শাখা স্থাপন প্রকল্প নেওয়া হয়। বর্তমানে ২০টি পুরণো জেলা সদরে শিশু একাডেমীর শাখা রয়েছে। এই শাখাগুলো বহাল থাকবে এবং এগুলো সারা দেশের থানা পরিষদসমূহকে পেশাগত বিষয়ে পরামর্শ প্রদান এবং শিশুদের কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রচার কার্য্য চালিয়ে যাবে বলে ধরা হয়।

৬) **উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন সমীক্ষা ঃ** উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের কর্মতৎপরতা এবং অর্থনীতির উপর তার প্রভাব নিরুপণ করার জন্য এগুলোর মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকল্প প্রণয়নের অতীব প্রয়োজনীয় এসব মূল্যায়নের ফলাফল ব্যবহার করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

৭) **সামাজিকভাবে অসহায় নারীদের প্রশিক্ষণ ও পুণর্বাসন ঃ** প্রায়ই দেখা যায় দারিদ্র, প্রলোভন এবং অন্যান্য আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাসহ বেশ কিছু মহিলা ভিক্ষাবৃত্তি এবং বেশ্যাবৃত্তির মতো অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এ পরিনতি মোটেই কাঙ্খিত নয়। এতে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবনতি ছাড়াও এসব মহিলাদের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তা এবং জাতি তার মানব সম্পদের অপচয়ের সম্মুখীন হয়। এসব মহিলাদের অসামাজিক প্রভাব থেকে দূরে রাখার জন্য এবং তাদেরকে সমাজের উপযোগী ও উৎপাদন সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নিরাপত্তা, যত্ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধাদি প্রদান করা হবে। ফলে তারা ধীরে ধীরে লাভজনক কর্মসংস্থানের পেয়ে সমাজে সঠিক অর্থে পুণর্বাসিত হতে পারবে।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে প্রথমবারের মতো সকল আর্থ-সামাজিক পরিসরে লিঙ্গীয় বৈষম্য দূর করা এবং উন্নয়নের মূলধারাতে নারীর সম্পৃক্তকরণের কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনাতে সুস্পষ্ট যে লক্ষ্য নির্ধারণ করে, তা'হলো -

১. জাতীয় পরিকল্পনাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নারী সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা;

২. লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে -

- নারী স্বাক্ষরতার হার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি করা;
- নারীদের জন্য কর্ম সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্ম পরিবেশ উন্নত করা;
- নারীদের জন্য ঋণ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থা ও পুষ্টিমান উন্নত করা।

৩.এই লক্ষ্যসমূহকে কার্যকর করে তোলার ক্ষেত্রে পরিকল্পনায় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে,

চতুর্থ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সমূহ

মহিলা উন্নয়নের জন্য ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যেসব উদ্দেশ্যসমূহ ধার্য করা হয়, তা'হলো -

১. বেনিফিসিয়ারী এজেন্ট হিসেবে মহিলাদের শিক্ষাসমূহ ও পরিবার-পরিকল্পনা, কৃষি, শিল্প ব্যবস্থা, সার্ভিস, পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

২. পাবলিক সেক্টারে মহিলাদের অংশগ্রহণ ৬% থেকে ১৫% এ বৃদ্ধিকরণ।

৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৫% থেকে ৩০% উন্নীত করা।

৪. মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ এবং মহিলাদের জন্য মেডিক্যাল সেবার ব্যবস্থার বৃদ্ধিকরণ।

৫. যেসব মহিলা এবং যুবতী মহিলারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে সেই সব মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থা করা।

৬. মহিলাদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন সুবিধা আরো সম্প্রসারিত করা, বিশেষ করে নন-ট্রেডিশনাল এলাকা।

৭. গ্রামীন এবং শহুরে মহিলাদের স্বকর্ম সংস্থান এবং এর জন্যে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা।

৮. কর্মজীবী মহিলাদের জন্যে আবাসিক সুবিধা প্রদান এবং তাদের শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন।

৯. দুঃস্থ, অসহায় মহিলাদের আইনগত সমর্থন প্রদান করা।

১০. শিশুদের সামগ্রিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে বালিকা শিশুদের বিবেচনায় আনতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১১. মহিলাদের প্রতি ইতিবাচক এবং নিজস্ব ধারণা সৃষ্টি করার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়নমূলক কর্মসূচী

৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়নমূলক যেসব কর্মসূচী বিবেচনা করা হয়েছে তা' নিম্নে আলোচিত হলো -

১. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী :

বেকার মহিলাদের জন্যে বিস্তৃত পরিধিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। যেসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যেমন - পোলট্রি, ডেইরি ফার্ম, পশু পালন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং অন্যান্য নির্বাচিত নন-ট্রেডিশনাল এলাকায়। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালীন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ১ লাখ মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে বলে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়।

২. মহিলাদের ঋণদান কর্মসূচী ঃ

যেসব মহিলা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে তাদেরকে স্বকর্ম সংস্থানের জন্যে আর্থিক সুবিধা দেওয়াহবে; ৫০,০০০ মহিলাদের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা ধার্য করা হয়।

৩. মহিলাদের জন্য দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী ঃ

আঞ্চলিক দারিদ্র দূর করার লক্ষ্যে ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর অধীনে অসহায় মহিলাদেরকে সংগঠিত করে তাদেরকে প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সুবিধা প্রতঃদান করা হবে যা থেকে তারা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সাহায্য পাবে। ১লাখ মহিলাদেরকে এই কর্মসূচীর আওতাভূক্ত করা হবে বলে ধার্য করা হয়েছে।

৪. কর্মজীবী - কর্মসন্ধিৎসু মহিলাদের আবাসিক সুবিধা ঃ চাকুরীজীবী মহিলা এবং চাকুরী সন্ধানরত মহিলাদের আবাসিক সুবিধার জন্যে গৃহীত ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে কর্মসূচীসমূহও ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চালু থাকবে।

৫. দিবাযত্ন কেন্দ্র ঃ কর্মজীবী মহিলাদের বাচ্চাদের জন্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ন্যায় এই পরিকল্পনাতেও কর্মজীবী মহিলাদের বাচ্চাদের লালন-পালনের জন্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু থাকবে।

৬. মহিলাদের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী ঃ

দুঃস্থ, অসহায় এবং বিকারগ্রস্থ মহিলাদের জন্যে উন্নয়নের বিশেষ কর্মসূচীর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০০)

৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য একটি রূপরেখা নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রনীত হয়েছে। এই পরিকল্পনায় জাতীয় পর্যায়ের উদ্দেশ্যাবলীতে লিঙ্গ বৈষম্য কমিয়ে আনা, নারীর শিক্ষা-প্রশিক্ষণ-আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সেই সঙ্গে কন্যা শিশুর জন্যে বিশেষ সহায়তা প্রদানের উপর অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলা হয়।

নারী ও নারীর অধিকারকে উৎসাহিত, সহায়তা, সুরক্ষিত করতে এবং নারীর ক্ষমতায়নে পাবলিক খাতের সম্পৃক্ততা হবে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল দিক।

পঞ্চম পরিকল্পনার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

নারী ও শিশু উন্নয়নের জন্য ৫ম পরিকল্পনায় যেসকল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ধার্য করা হয়েছে, তা'হলো -

১) সর্বক্ষেত্রে ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণের মধ্যে সমতা স্থাপন।

২) পরিবার, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রসহ সমাজের মানুষের মর্যাদা ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাঁধাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে দৃষ্টিভঙ্গী, কাঠামো, নীতিমালা, আইন-কানুন ও প্রথার পরিবর্তন সাধন।

৩) দক্ষতা, সম্পদ ও সুযোগ এবং তথ্যের জগতে প্রবেশসহ উন্নয়নের সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

৪) রাজনৈতিক, নাগরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

৫) নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি এবং এমন ধরণের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করা যা নারীর কর্মসংস্থান এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় সেক্টরে নারী শ্রমিকের আয় উপার্জনের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৬) লিঙ্গের সমতা ত্বরান্বিত এবং নারীর মর্যাদা উন্নয়নের লক্ষ্যে ইতিবাচক রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রীতিনীতি প্রতিষ্ঠা ও রূপান্তর সাধন।

৭) উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে ও প্রেক্ষাপটে নারীর বিষয়সমূহকে মূলধারায় পুরণত করতে সকল স্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ, মানব-সম্পদ ও ক্ষমতাসহ কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক মেকানিজম প্রতিষ্ঠা করা।

৮) সুযোগ-সুবিধা ও পরিসেবা লাভের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপের সদস্য, বিশেষ করে নারী সদস্যরা যেসব প্রতিবন্ধকতার সম্মুক্ষীণ হচ্ছে সেগুলি চিহ্নিত করা এবং এ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৯) দরিদ্র নারী প্রধান পরিবারসমূহের সাহায্যার্থে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক, সামাজিক, কৃষি বিষয়ক এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর নীতিমালা ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

Dhaka University Institutional Repository

১০) বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আইন-কানুনসমূহের পর্যালোচনা করা এবং আইন বাতিলের জন্য সুপারিশ করা।

১১) নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সাধন বা সিডও ও বেইজিং প্লাটফরম ফর অ্যাকশন বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত জাতীয় নারী উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা এবং নারী উন্নয়ন ও সক্ষমতার (WID Capability) প্রাতিষ্ঠানিক পর্যালোচনার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১২) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন, শিল্প ও বাণিজ্য, মৌলিক পরিসেবা যেমন ঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয়, জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাষণ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর বিষয়সমূহকে মূলধারায় পরিণত করা।

১৩) নারী শ্রম এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদানের দৃশ্যমানতা ও স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

১৪) শ্রমশক্তিতে নারী-পুরুষের অংশগ্রহণের হারের মধ্যকার ব্যবধান হ্রাস করা।

১৫) কর্মজীবী নারীদের জন্য সহায়ক পরিসেবা (Suppor Service) যেমন - শিশু প্রতিপালন কেন্দ্র ও পরিবহন সুবিধাদি, বিনোদন প্রভৃতির সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১৬) স্থানীয় সরকারের সকল স্তরসহ সরকার ও প্রশাসনে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা।

১৭) স্বাক্ষরতার হার এবং উন্নয়ন দক্ষতা ও কারিগরী প্রশিক্ষণসহ শিক্ষায় সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করা।

১৮) 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' - এই লক্ষ্যের অধীনে স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিষেবায় সমস্ত জীবনব্যাপী নারীর পরিপূর্ণ সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১৯) নারী ও বালিকারা যেসব নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে সেগুলো দূর করা, সব ধরণের নারী নির্যাতন দূর করা এবং নির্যাতিত নারীদের চিকিৎস ও পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

২০) নারী ও শিশুকন্যা পাচার রোধ করা।

২১) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি আলোচনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

২২) পরিবেশগত ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ও বিষয়সমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

২৩) গণমাধ্যমে নারী ও কন্যা শিশুর ইতিবাচক চিত্র বর্তিত মাত্রায় তুলে ধরা।

২৪) উন্নয়নে নারী নীতিমালার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য একটি জাতীয় পরিবীক্ষণ মেকানিজমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করা।

উদ্দেশ্য অর্জনের কৌশলগত দিকসমূহ (Strategic Concern)

এইসব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন লিঙ্গের পুনর্বণ্টনমূলক (Gender Redistribution) একটি সচেতন প্রয়াসের বিস্তৃত কর্মকৌশল যা এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীত হয়েছে। লিঙ্গের বৈষম্য হ্রাসের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কার্যফল প্রভাব বিস্তার এবং নারীর অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য এই পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কৌশলগত দিকসমূহের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে:

১. দারিদ্র দূরীকরণ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সহায়ক গুরুত্বপূর্ণ এ্যাপ্রোচ (Approach) হচ্ছে নারীর উপর বিদ্যমান ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের বোঝা লাঘব করা; রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এ জন্যে এমন সব যৌক্তিক নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত, যা হবে লিঙ্গ সংবেদনশীল ও নারীর অংশগ্রহণ সহযোগে রূপান্তরীত এবং সর্বমুখী উন্নয়ন কৌশল ভিত্তিক।

২. সরকারী ব্যয়

নারীর মৌলিক চাহিদাপূরণে সাধারণভাবে পাবলিক সেক্টর ব্যয় এবং নির্দিষ্টভাবে জন প্রশাসনিক ব্যয় পুণর্বিন্যাস ও সেই টার্গেট অনুযায়ী করতে হবে। এমন ধরণের মেকানিজম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যা নিশ্চিত করবে যেসকল সামষ্টিক,খাতওয়ারী এবং প্রকল্প পর্যায়ে সম্পদ বরাদ্ধ নারী সামাজিক ব্যয় ও নারীর কাজের সুফল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাকে প্রতিফলিত করে। সরকারী ব্যয়ের কর্মসূচী নারীর জন্য সুস্পষ্টভাবে কর্মসংস্থান, ঋণ ও উৎপাদনশীল সম্পদের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

৩. সরকারি কর্মসংস্থান

সরকারি চাকুরীতে নারীর অন্তর্ভূক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক, স্বাস্থ্য কর্মী, পরিবার কল্যাণধর্মী প্রভৃতি চাকুরীতে অগ্রাধিকার দেয়া হবে; নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর জন্য কোটা এবং সরাসরি নিয়োগমূলক ধরণের চাকুরির ক্ষেত্রে , যেমন - বিচার বিভাগীয় মনোনয়ন-এর ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান।

৪. শিক্ষা

একটি লিঙ্গ সংবেদনশীল শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ও প্রশাসনে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নারী-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে জনশিক্ষা কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৫. স্বাস্থ্য

প্রজনন স্বাস্থ্যসহ নারীর বিশেষ স্বাস্থ্য চাহিদা এবং সেআ সঙ্গে নারীর বহুমুখী ভূমিকা ও দায়িত্বগুলোকে বিবেচনায় নিয়ে এবং তাদের সময় উপযোগী করে স্বাস্থ্য ও পরিষেবার রূপরেখার প্রণয়নের বিধান রাখতে হবে। আরো ঐালোক স্বাস্থ্য পরিচর্যা-পরিষেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডাক্তার-নার্স এবং ডাক্তার-জনসংখ্যা অনুপাতে বৃদ্ধি সাধন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. **আইনগত নিরাপত্তা**

আইনের অধিকতর কার্যকর প্রয়োগ ও গণশিক্ষার মাধ্যমে নারী অধিকারের উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।

৭. **নিরাপত্তা**

নারী নির্যাতন প্রতিহত ও ক্ষতিপূরণের জন্য রাষ্ট্রযন্ত্রের সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে সক্রিয় করতে হবে।

৮. **প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো / সামর্থ সৃষ্টি**

তৃণমূল পর্যায়ে থেকে জাতীয় পর্যায়ে পর্যন্ত যথাযথ কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, বিভিন্ন খাতওয়ারী সংস্থার কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সকল ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থকে উর্দ্ধে তুলে ধরার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। জেন্ডার ইস্যুকে ধারাবাহিকভাবে বিবেচনা করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় / সংস্থাসমূহের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষমতাকে (Planning Capability) বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. **নারীর কর্মসংস্থানের জন্য সহায়ক পরিষেবা**

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যকে টিকিয়ে রাখতে নারীর সক্ষমতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পর্বের আবশ্যকতাস্বরূপ নারীর জন্য কর্মসংস্থান সহায়তা। বিশেষ শিশুযত্ন, কর্মস্থলের নিরাপত্তা, বাসস্থান ও পরিবহন ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১০. **গবেষণা ও ডাটাবেস উন্নয়ন**

নারীর পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য জ্ঞান/ডাটাবেস গড়ে তুলতে জেন্ডার ইস্যুসমূহ সংক্রান্ত পর্যাপ্ত গবেষণা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা হবে। সকল জাতীয় উপাত্ত সংগ্রহ ব্যবস্থাতে নারী-পুরুষ বিভাজিত উপাত্ত (Sex Disagregated Data) প্রস্তুতকরণ এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে এসব উপাত্তের ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১. **প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন**

উন্নয়নে নারী ইস্যুর ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী মন্ত্রণালয় হিসাবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অন্যান্য সরকারী সংস্থার কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রভাবক (Catalist) হিসেবে কাজ করবে এবং নারীর চাহিদা ও অগ্রাধিকারসমূহের প্রতি সকল সরকারী সংস্থার কাছ থেকে আরো সঙ্গতিপূর্ণ সাড়া পেতে ও তাদের মধ্যে একটি ভালো সমঝোতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা নারীর অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাদের নির্দিষ্ট সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্প / কর্মসূচীসমূহ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ সহজতর করা। সমন্বিত করা এবং পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণের কাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে নারী কার্যক্রমের (WID Activities) পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বিত করার জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে প্রধান করে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় নারী উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। এভাবে বর্ধিত ক্ষমতা ও কারিগরী সম্পদসহ কেন্দ্রীয় (Nodal) মন্ত্রণালয়টিকে শক্তিশালী করা হবে। নারী নির্যাতন দমনের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে প্রধান করে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় উপদেষ্টা কমিটি নারী নির্যাতন সম্পর্কিতত রিপোর্টসমূহের পর্যালোচনা চালিয়ে যাবে এবং সেবা সঙ্গে এই মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের অধীনে স্থাপীত জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের কমিটিসমূহের কার্যক্রম পরিবেক্ষণ করবে।

সামগ্রিক নীতিমালার দিক নির্দেশনা প্রদান, আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতা ও নারী উন্নয়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন খাতে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ (NCWD) গঠন করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সেক্টরসমূহে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়াবলীর সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধানের জন্য ৩২টি মন্ত্রণালয় ও সংস্থা উইড ফোকাল পয়েন্ট (WID Focal Point) স্থাপন করা হয়েছে। নারী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন সধন ও এ সংক্রান্ত একটি অধিকতর স্থায়ী কার্যক্রমের কৌশল সুনির্দিষ্টকরণের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় / পরিকল্পনা কমিশনের ভিতরে, বিশেষ করে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগে এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগে একটি ফোকাল পয়েন্ট মেকানিজম চালু করা হবে। জেন্ডার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত বিশেষ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে উইড ফোকাল পয়েন্টের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

নারীর অগ্রগতির জন্য জাতীয় নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার জন্য নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত একটি পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটিও গঠন করা যেতে পারে।

১২. প্রশাসনিক পদক্ষেপ

সরকারী ও ব্যক্তি মালিকানাধীন খাতের ব্যক্তিবর্গের জেন্ডার বিশ্লেষণ ও সংবেদনশীলতার প্রতি সরকার অগ্রাধিকার আরোপ করবে। প্রধান প্রধান সরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে জেন্ডার ইস্যু সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু করা হবে। নিয়োগও জেলা কোটা পূরণ করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণসহ চাকুরী ক্ষেত্রে নারী কোটা পূরণের বিষয়টি তরান্বিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সরকারী খাতে নারীদের জন্য চাকুরীর শর্তাবলী ও তাদের কর্মপরিবেশের উন্নতি সাধন করা গবে। যোগ্যতাসম্পন্ন নার্সের সংখ্যা বাড়ানো এবং সকল পর্যায়ে, বিশেষ করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষিকাদের সংখ্যা বাড়ানোর প্রক্রিয়াটি দ্রুততর করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ

উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে সকল পর্যায়ে (ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও জাতীয়) পরিকল্পনা ও খাতওয়ারি কর্মসূচী / প্রকল্পসমূহ প্রণয়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য সচেতন প্রয়াস চালানো হবে। পরিকল্পনা চক্রের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ সংযুক্ত করতে পরিকল্পনাবিদ ও বাস্তবায়নকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় মনোনিবেশ করা হবে।

১৪. সচেতনতা ও জনশক্তি

নারীর আইনগত অধিকার সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে একটি ব্যাপক কর্মসূচী নেয়া হবে এবং প্রয়োজনে নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা দেয়া হবে। নারীদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতার জন্য সরকার কর্মসূচী গ্রহণ করবে।

১৫. সরকারী সম্পদ বরাদ্ধ

বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় জেন্ডার ইস্যু সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একটি পদ্ধতি খুঁজে বের করতে হবে যা দ্বারা বাজেট তৈরীর সকল কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট নীতিগুলো এমনভাবে পৃথক করা হবে যাতে তা সরকারের সম্পদ বন্টন যে জেন্ডার বৈষম্য হ্রাস ও নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে অবদান রাখছে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে। পানি ও পয়োঃনিস্কাশন, পরিবহন, বাজার প্রভৃতির ন্যায় অর্থনৈতিক অবকাঠামোর জন্য সরকারী বিনিয়োগ কর্মসূচীসমূহের মধ্যে নারীর অগ্রাধিকারসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হবে। দরিদ্র, সম্পদহীন ও গৃহহীন পরিবারসমূহ, বিশেষতঃ নারী প্রধান পরিবারসমূহের জন্য একটি টেকসই জীবন-যাপনের নিরাপত্তা বিধানে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে সরকারী খাস জমি, পুকুর ও জলাশয় বরাদ্ধ দেয়া হবে। বিবাহিত দম্পতিদের বেলায় স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের নামে বরাদ্ধ দেয়া হবে।

১৬. দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নারীর প্রতিটি দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ গ্রহণের অগ্রাধিকার পাবে। ট্রেডিশনাল এবং নন-ট্রেডিশনাল দক্ষতা উন্নয়নের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণে নারী এবং বালিকার সমর্থন পাবে।

১৭. আর্থিক সুবিধা

ব্যক্তিক ঋণের আওতায় ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং ক্ষুদ্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধার সকল স্তরে নারীরা যাতে গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সরকারী এবং ব্যক্তিখাত ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যারা কার্যকর সহযোগিতা পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. **প্রয়োজন বিবেচনায় বিশেষ পদক্ষেপ**

সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাতপদ এবং অরক্ষিত সংঘ, যেমন -পরিত্যক্ত, দুঃস্থ, গৃহহীন নারী ও বালিকা এবং পঙ্গু নারী, বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োচিত নারী, সন্ত্রাসের শিকার যেসব নারী তাদের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৯. **ডাটা বেস**

জেন্ডার সংবেদনশীল পরিসংখ্যানগত ডাটা বেস ও তথ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রূপরেখা সম্পর্কে কর্মদের প্রশিক্ষণ ও উপাত্ত বিশ্লেষণের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে কর্মসূচী হাতে নেয়া হবে। গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সনাক্তকরণের উদ্যোগের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

২০. **সরকারী - বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা**

সরকারী - বেসরকারী পর্যায়ে সহযোগিতা প্রদান করা হবে। বেসরকারী সংস্থাসমূহকে সরকারী পর্যায়ে নারীর অবস্থান উন্নয়নে একই রূপ কার্যক্রম গ্রহণে উৎসাহিত করা হবে এবং এই লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী সংস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। সরকারী-বেসরকারী পরিষদের মাধ্যমে আলাপচারিতা পরিচালনার জন্যে ফোরাম গঠন করা হবে। যাতে করে বেসরকারী সংস্থাসমূহ জাতীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে তার জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

পঞ্চম পরিকল্পনায় ব্যষ্টিক অধ্যায়ে নারী উন্নয়ন

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দলিলের সামষ্টিক অধ্যায়ের মতো ব্যাষ্টিক অধ্যায়েও নারীদের উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কৌশল ও কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকারসমূহকে উৎসাহিত করা, সহায়তা প্রদান ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় খাতের অন্তর্ভূক্তিই হচ্ছে পঞ্চম পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। এত আরো বলা হয়েছে যে, জাতীয় নারীর উন্নয়ন বাস্তবায়নের জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে ঃ-

১. নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডও) বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

২. সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকারসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে নারীর অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান;

৩. জেন্ডার সমতা বৃদ্ধি এবং নারীর মর্যাদা অবস্থার উন্নয়ন সাধন।

Dhaka University Institutional Repository

৪. নারীর মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা এবং অধিকার সম্পর্কে নারী-পুরুষ সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

৫. তথ্য, দক্ষতা, সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা অর্জনসহ উনণয়নের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা;

৬. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি ও পয়োঃনিষ্কাশন এবং সামাচিক পরিষেবার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে নারীর সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি।

এছাড়া সামষ্টিক পরিকল্পনায় বর্ণিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের পরিপূরক অন্যান্য সব বিষয়ও এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এসব উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ব্যষ্টিক অধ্যায়ের সুনির্দিষ্ট কৌশলও স্থির করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, পঞ্চম পরিকল্পনা নারীদের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার বিষয়টি সমর্থন করে। এটি একটি বহুখাত ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং নারীর উন্নয়নকে পরিকল্পনা নীতি, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনের সঙ্গে একীভূত করার জন্য সকল উন্নয়ন খাতের মধ্যে দায়-দায়িত্ব ভাগাভাগির উপর গুরুত্বারোপ করে।

নারী উন্নয়নের এই বহুখাতমুখী অভিক্ষেপ (Thrust) অর্জনের জন্য পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালপর্বে নিম্নোক্ত সাধারণ কৌশলসমূহ অবলম্বন করা হবে;

১. আন্তঃখাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী (Inter Sectoral Approach)

মূল ধারায় নারীদের সম্পৃক্তকরণের কৌশলসমূহ হচ্ছে একটি বহুখাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে গণজীবনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন, শাসন প্রক্রিয়া (Governance) ও অংশদারিত্বের সাথে সম্পর্কিত্ত খাতসমূহ। খাতওয়ারী মন্ত্রণালয়সমূগ সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের কর্ম-বরাদ্ধ (Business Allocated) অনুযায়ী নির্ধারিত কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করবে। নেতৃত্বদানকারী সংস্থা হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সামগ্রিক নীতিমালার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে। নেতৃত্বদানকারী সংস্থা মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সামগ্রিক সামগ্রিক নীতিমালার দিক নির্দেশনা প্রদান করবে, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করবে এবং তথ্য আদান - প্রদান করবে যাতে সকল কর্মসূচীর ক্ষেত্রে নারীর উন্নয়ন ও সমতার পরিপ্রেক্ষিত পদ্ধতিগতভাবে অন্তর্ভূক্ত করাটা সহজতর হয়। এই সকল ক্ষেত্রে পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষনের কাজটিও তা করবে।

২. এ্যাডভোকেসী

নারী ও কন্যা শিশুদের অধিকার ও চাহিদাপূরণ, নারী নির্যাতন পতিরোধ, নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা তনান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারের আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারসমূহ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল পর্যায়ের সব ধরণের কর্মসূচী কার্যক্রমের একটি অংশ হিসেবে এ্যাডভোকেসীর বিষয়টি সংযুক্ত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ

দেশের উন্নয়নে নারী সম্পর্কিত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান এবং নারী উন্নয়নের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদ (NCWD) গঠন করা হয়েছে। এই পরিষদ উন্নয়নে নারী (WID) এর পরিচালক, নীতি নির্ধারক, উদ্দোক্তা, তদারককারী হিসেবে কাজ করবে। এর দু'টি অঙ্গ রয়েছে -

১. শীর্ষ ফোকাল পয়েন্ট (Lead Focal Point) - যার অবস্থান রয়েছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২. জিওবিএফডিপি টাস্কফোর্স (অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার ও বিদেশী উন্নয়ন অংশীদারদের নিয়ে গঠিত টাস্কফোর্স) যার অবস্থান হচ্ছে পরিকল্পনা কমিশনে।

শীর্ষ ফোকাল পয়েন্টের করণীয় হবে, নারী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ শনাক্ত করা এবং নির্দিষ্ট কোন মন্ত্রণালয় পড়ে না - এমন সব বিবেচ্য ক্ষেত্রে (Special Concern Area) নারীদের পরিষেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

জিওবিএফডিপি টাস্কফোর্সের প্রধান কাজ হবে আন্তঃখাতীয় সহযোগিতা ও কাঠামোগত পূর্ণবিন্যাসের জন্য (Structural Adjustment) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে সামষ্টিক নীতিমালা প্রণয়ন করা। খাতওয়ারী সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা। আন্তঃমন্ত্রণালয় সহযোগিতার কার্যকর তত্ত্বাবধান এবং সংশ্লিষ্ট খাতগুলো উন্নয়নে নারী কার্যক্রম উন্নয়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য জাতীয় নারী উন্নয়ন পরিষদকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহায়ক সুবিধা (Support Facilities) প্রদান করবে। মন্ত্রণালয়সমূহের উইভ ফোকাল পয়েন্টগুলোকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে মনোযোগ দেয়া হবে। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা, মূল্যায়ন ও সমন্বয় করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় উন্নয়নে নারী কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হবে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (DWA), স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, এনজিও এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যকর প্রতিনিধিদের তাদের কর্মকাণ্ডের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সহযোগিতার উন্নয়ন সাধন করা হবে।

৪. আন্তঃজাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

পঞ্চম পরিকল্পনার কতকগুলি কর্মসূচী ও প্রকল্পের বাস্তবায়ন মূলতঃ একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপআঞ্চলিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। সেজন্য নারী অগ্রগতি সাধন এবং নারী নির্যাতন ও পাচার রোধ করার লক্ষ্যে এধরণের সহযোগিতাকে উৎসাহিত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া কৌশলগত বিষয়ের বর্ণনায় এই অধ্যায়ে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ, সামর্থ সৃষ্টি এবং গবেষণা ও উপাত্তভিত্তিক উন্নয়নের প্রসঙ্গও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

৫. আইনের প্রয়োগ এবং আইনগত নিরপত্তা

নারী অধিকারের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা এবং আইন ও সাংবিধানিক নিশ্চয়তার অধিকতর কার্যকর প্রয়োগ; আইন, বিধি ও বিচার প্রক্রিয়ার সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অধিকার লঙ্ঘণ কার্যকরভাবে রোধ করা এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় নারীর প্রবেশাধিকার বাড়ানোর মতো সংশ্লিষ্ট উপায়গুলো শনাক্ত করার কাজে অপরাপর চালকদের (Actors) সাথে সংযোগ রক্ষার লক্ষ্যে চেষ্টা চালানো হবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় জেন্ডার সমতা উন্নয়নে একটি এ্যাডভোকেসী গ্রুপ গঠন করবে এবং নারী অধিকারের জন্য এ্যাডভোকেসী গ্রুপ গঠনের কাজে উৎসাহ প্রদান করবে।

৬. নারী নির্যাতন ও কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ

নারী ও শিশুদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং তাদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে বেশ কিছু আইনগত কার্যক্রম প্রণয়ন করা হবে। এই আইনগত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে থাকবে পারিবারিক আইন সংস্কার, সম-মজুরী ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে আইন এবং রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্লাটফরম ফর অ্যাকশন-এ স্বাক্ষর করেছে এবং তা বাস্তবায়নেরও অঙ্গীকার করেছে। নারীর অগ্রগতির লক্ষ্যে খাতওয়ারী পর্যালোচনার ভিত্তিতে ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি জাতীয় পরিকল্পনা (NAP) তৈরী করা হয়েছে। এতে নারীর সব ধরনের দূদর্শা দূর করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৭. পাচার, যৌতুক ও বহুবিবাহ

এই অনুচ্ছেদে নারী পাচার, যৌতুক ও বহু বিবাহ সংক্রান্ত প্রচলিত আইনে বর্ণিত শাস্তিসমূহের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও এই অধ্যায়ে গণসচেতনতা/গণশিক্ষা,সরকারী কর্মসংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আর্থিক পরিষেবা/সম্পদ, সরকারী ব্যয় বরাদ্ধ, সক্ষমতা বিনিক্ষণ, সরকার-এনজিও বেং বেসরকারী বা ব্যক্তিগত খাতের মধ্যে সহযোগিতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

পঞ্চম পরিকল্পনা সময়কালের কর্মসূচীসমূহ

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পঞ্চম পরিকল্পনার সময়কালে নিম্নোক্ত নারী উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে:-

Dhaka University Institutional Repository

১. **দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী**

ব্যাপক সংখ্যক কর্মহীন নারীকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণের সুযোগকে সম্প্রসারিত করা হবে। এই কর্মসূচীর অধীনে এক লাখ নারীকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে।

২. **সমন্বিত কর্মী উন্নয়ন কর্মসূচী**

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদপ্তর (DWA) নারী কর্মীদের (Personnel) সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই কর্মসূচী সম্পাদন করা হবে।

৩. **মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পলিসি এ্যাডভোকেসী ইউনিট**

নারী উন্নয়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পলিসি ও এ্যাডভোকেসী ভূমিকাকে শক্তিশালী করতে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একটি পলিসি ও এ্যাডভোকেসী ইউনিট চালু করা হবে।

৪. **নারীর ঋণ কর্মসূচী**

এই কর্মসূচীর আওতায় এক লক্ষ নারীকে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে।

৫. **নারীর জন্য ভিজিডি কর্মসূচী**

ভিজিডি (দুঃস্থ গোষ্ঠীর উন্নয়ন) কর্মসূচী অধীনে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা দারিদ্র-পীড়িত এলাকাগুলোতে সীমাবদ্ধ রাখা হবে এবং এই কর্মসূচীর অধীনে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র নারীকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে।

৬. **কর্মজীবী নারীদের বাসস্থানসুবিধা**

নিম্ন ও মধ্য শ্রেণী থেকে আগত কর্মজীবী নারীদের বাসস্থান সুবিধা সম্প্রসারণকর্মসূচী এই সময়কালে অব্যাহত থাকবে।

৭. **শিশুদের দিবাযত্ন পরিষেবা**

নিম্ন ও মধ্য শ্রেণী থেকে আগত কর্মজীবী মায়েদের জন্য বিদ্যমান ডে-কেয়ার সার্ভিসেস কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হবে।

৮. **নির্যাতন হ্রাসে বহুখাতমুখী কর্মসূচী**

কার্যকরভাবে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ ও প্রতিকারের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে তৎপর করতে একটি সামাজিক কার্যক্রম (Umbrella Action) কর্মসূচী সম্পাদন করা হবে।

৯. **ট্রেনিং রিসোর্স সেন্টার**

মহিলা অধিদপ্তরের জাতীয় নারী প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ণ এ্যাকাডেমীর পুণর্গঠনের মাধ্যমে অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটগুলোর জন্য একটি ট্রেনিং রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই রিসোর্স সেন্টারে একটি ডকুমেন্টেশন ও রিসোর্স সেন্টারও চালু করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন গবেষণা ও প্রশিক্ষণের উৎকৃষ্ট কেন্দ্র

দেশের ভিতর এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে তথ্যের আদান-প্রদান, গবেষণা, পরামর্শমূলক কার্যক্রম এবং কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সরকারী, বেসরকারী ও ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বিনির্মাণের উন্নয়ন ঘটাতে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

১১. নারীর স্বার্থসংক্রান্ত কর্মসূচী

নারী পাচার রোধের ন্যায় নারীর বিশেষ বিবেচনা ও স্বার্থ সংক্রান্ত কর্মসূচীর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১২. দারিদ্র দূরীকরণ ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী

নারীর ওপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের বোঝা দূর করতে সরকার নির্ভরযোগ্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে চরবে যা হবে জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নারীর পূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ও জনগণ কেন্দ্রিক উন্নয়ন কৌশলের উপর ভিত্তি করে প্রণীত। নারীর মৌলিক চাহিদার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সরকারি ব্যয়ের বরাদ্দ পূণর্বিন্যস্ত ও স্থির করা হবে। দারিদ্রের জন্য সামাজিক পরিষেবা সম্পদের বরাদ্দ যেন সামাজিক ব্যয় ও নারীর কাজের সুবিধাদির প্রতি গভীর বিবেচনা রেখে করা হয় - এটা নিশ্চিত করতে এবং নারীকে ঋণ ও সঞ্চয় কার্যক্রমে প্রবেশাধিকার দিতে মেকানিজম নির্ধারণ করা হয়।

এই কর্মসূচীসমূহের অধীনে নিঃস্ব ও দারিদ্র নারীদের সংগঠিত করা গবে; প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে এবং সমষ্ঠিগত অথবা ব্যক্তিগত উপার্জনমূলক কার্যক্রমের জন্য তাদেরকে ঋণ সুবিধা দেওয়া হবে। বিশেষভাবে দারিদ্র পীড়িত এলাকাগুলোর ভিজিডি কর্মসূচীর অধীনে অন্তর্ভূক্ত করা হবে।

চরম দারিদ্রের ক্ষেত্রে নারীর মৌলিক চাহিদাপূরণের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় একটি ত্রাণ কার্যক্রম (Relif Mechanism) হিসেবে দুঃস্থ গোষ্ঠী খাদ্য সহায়তা বা ভিজিএফ কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য বিতরণ প্রক্রিয়া প্রবর্তণ করেছে।

এই কর্মসূচীটি পরবর্তীতে উন্নয়নমুখী কর্মসূচীতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আশির দশকের মঝামঝি সময়ে এটি দুঃস্থ গোষ্ঠী উন্নয়ন বা ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি) হিসেবে পুণ:নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চার বছর সময়ের মধ্যে ভিজিডি কর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫৯৮ কোটি মিলিয়ন টাকা ব্যয় ও ৬ লাখ ২৩ হাজার ৩৭০ মেট্রিক টন গম বিতরণ করা গবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই কর্মসূচীর অধীনে প্রায় ১১ মিলিয়ন (১কোটি ১০লাখ) মহিলা শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্ব-কর্মসংস্থান সঙক্রান্ত প্রশিক্ষণের উন্নয়ন প্যাকেজের মাধ্যমে খাদ্যের নিরাপত্তা পাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

৫.৪ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলা উন্নয়নে সম্পদ বরাদ্দ

স্বাধীনতা উত্তরকাল থেকে এ যাবত মহিলা উন্নয়নের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। স্বাধীনতার পর থেকে এ যাবত মহিলা উন্নয়নের জন্য যে অর্থ ধার্য করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ-

সারণী - ৫.৪ ঃ নারী উন্নয়নে সরকারী ব্যয় বরাদ্দ

পরিকল্পনাসমূহের বিবরণ	খাতওয়ারী বরাদ্দ
১ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	নারী উন্নয়নের জন্য কোন বরাদ্দ ছিলো না *১
দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনা	১০৫.৬০
২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৩১৮.০০
৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫০০.০০
৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৮৮০.০০*২
৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা	৫২৫৩.৭১

উৎস: জেন্ডার প্রসঙ্গ, শাহীন রহমান, পৃ:- ১৮-২৩.

*১ ১ম পরিকল্পনায় সমাজ কল্যাণ ও যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত ৫টি প্রকল্পনা হাতে নেয়া হয়। যা ছিলো নারী বিষয়ক এবং আরো ২টি নতুন প্রকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় টেনে নেয়া হয় এবং এই প্রকল্পের জন্য অর্থাৎ ১৯৭৩-৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে নারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে মোট ২.৯৮ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয় যা ঐ একই সময়কালের মোট জাতীয় ব্যয় বরাদ্দের শতকরা এক ভাগেরও কম।

*২ ৪র্থ পরিকল্পনায় ভৌত অবকাঠামোতে (Business Infrastructure) বিনিয়োগসহ মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রকল্পসমূহ ৮৮০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ৩৩০ মিলিয়ন টাকা হচ্ছে ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে সকল প্রকল্প ৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অব্যাহত আছে তার জন্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নারী উন্নয়নে যে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তা মোট বরাদ্দের থেকে খুবই কমঅ এবং এরপরও বরাদ্দ অনুযায়ী ব্যয়ের আলোচনা করা হয়, তা'হলে দেখা যাবে যে, চলতি পরিকল্পনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন না করে পরবর্তী পরিকল্পনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যেমন - ১ম পরিকল্পনায় মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিতা নারীদের জন্য ৫টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এবং পরে আরো ২টি নতুন প্রকল্প নারী উন্নয়ন প্রকল্পে সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো (৭টি) ১৯৭৮-৮০ সালের অন্তবর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ২টি প্রকল্প ১৯৮০ সাল নাগাদ সম্পন্ন হয়।

২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ২৬টি প্রকল্পের জন্য চলতি মূল্যে ৩১কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ২১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়, ১টি পরিত্যক্ত হয় এবং ৪টি ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত করা হয়।

৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয় তার বাস্তবায়নের জন্য মহিলা বিষয়ক খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এছাড়াও জনসংখ্যা, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, কৃষি ইত্যাদি খাতে নারী উন্নয়নের বিশেষ কার্যক্রম আরো ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা গবে বলে উল্লেখ করা হয়। অতিরিক্ত ১৬ কোটি টাকা বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ব্যবহার করার জন্য বরাদ্দ করা হয়। ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে ঘোষিত বরাদ্দের পরিমান ছিল মোট বরাদ্দের ০.৪ শতাংশ, যার মাত্র ০.২ শতাংশ বরাদ্দ ছিল মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রকল্পসমূহের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে সকল প্রধান খাতে নারীদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে - কৃষি, পরিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদ, শিল্প বানিজ্য, সরকারী পরিষেবা এবং সামাজিক খাত। নারী উন্নয়ন খাতে মোট ৮৮ কোটি টাকা ধরা হয় এর মধ্যে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী থেকে স্থানান্তরিত কর্মসূচীর জন্য ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সুতরাং মোট ৫৫ কোটি টাকা নারী উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ করা হয়। পরপৃষ্ঠায় ৪র্থ পরিকল্পনায় ৮৮ কোটি টাকার খাতওয়ারী বরাদ্দ দেখানো হলো ঃ-

মোট ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প এ সময় নারী সংক্রান্ত উপখাতের অধীনে গৃহীত হয়, যার মধ্যে ৮টি প্রকল্প আবার পরের বছরগুলোতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়।

সারণী - ৫.৫ ঃ ৪র্থ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে খাতওয়ারী বরাদ্দ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	খাতওয়ারী বরাদ্দ
ক.	৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে স্থানান্তরিত কর্মসূচী	৩৩.০০
খ.	নতুন কর্মসূচী -	
১.	দক্ষতা ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১০.০০
২.	ঋণদান কর্মসূচী	১০.০০
৩.	মহিলাদের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী	১২.০০
৪.	দিবাযত্ন সেবামূলক কর্মসূচী	৩.০০
৫.	অসহায় মহিলাদের জন্য বিশেষ কর্মসূচী	২০.০০
	মোট	৮৮.০০

উৎস :- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৯০-৯৫, পৃ:- XIII – ৪.

৫ম পরিকল্পনায় নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে মোট ২৭৮০.০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৩৭০.০০ মিলিয়ন টাকা ৪র্থ পরিকল্পনার স্থানান্তরিত ১৮টি প্রকল্পের জন্য ধরা হয়েছে। দুঃস্থ গোষ্ঠী উন্নয়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়নকর্মসূচী বাস্তবায়নে ৫৯৮ মিলিয়ন টাকা ব্যয় এবং ৬লাখ ২৩ হাজার ৩৭০ মেট্রিক টন গম বিতরণ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নিম্নে নারী ও শিশু সম্পর্কিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ দেখানো হলো:-

সারণী - ৫.৬ ঃ ৫ম পরিকল্পনায় নারী ও শিশু সম্পর্কিত কর্মসূচী অনুযায়ী সম্পদ বরাদ্দ

ক্রমিক নং	কর্মসূচী	সম্পদ বরাদ্দ (মিলিয়ন টাকা)
ক.	৪র্থ পরিকল্পনা থেকে স্থানান্তরিত কর্মসূচী	১৩৭০.০০
খ.	নারী ও শিশু সম্পর্কিত নতুন কর্মসূচী	
১.	দক্ষতা উন্নয়ন / কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী	১৩০.০০
২.	ঋণ কর্মসূচী / নারী ক্ষমতায়ন এবং দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী	৬৩০.০০
৩.	লিঙ্গ সমতা আনয়নে এ্যাডভোকেসী এবং নীতি নির্ধারণ	৩০.০০
৪.	নারী ও শিশুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন	১৭০.০০
৫.	কর্মজীবী মহিলা হোস্টেল	৩০.০০
৬.	দিবাযত্ন কর্মসূচী	৫০.০০
৭.	নারীর বিশেষ বিবেচনা ও স্বার্থ সংক্রান্ত কর্মসূচী	১৪০.০০
৮.	নারী উন্নয়নে নতুন কর্মসূচী	২০.০০
৯.	গবেষণা ডাটাবেস উন্নয়ন	১০.০০
১০.	শিশু উন্নয়নে নতুন এবং পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচী	১৩০.০০
১১.	শিশু পাচার রোধের কর্মসূচী	৫০.০০
	মোট	২৭৮০.০০
	দুঃস্থ গোষ্ঠী উন্নয়ন কর্মসূচী (ভিজিডি)	৫৯৮.০০

উৎস :- ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ১৯৯৭-২০০২, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ:- ৫১৫.

Dhaka University Institutional Repository

৫.৬ পরিকল্পনাধীন কর্মসূচী ও তার বাস্তবায়ন ঃ-

বিগত ৫টি পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়ক যেসকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার বাস্তবতা বিশ্লেষণে বলা যায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদেরকে সম্পৃক্তকরণের জন্য তা যথেষ্ট নয়। মহিলা উন্নয়নে গ্রহীত সীমিত কর্মসূচী এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রীতা মহিলাদের যথাযথ উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকা সম্বন্ধে কোন কার্যকর সচেতনতা প্রতিফলিত হয়নি। নারীদের একটি সামাজিক গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত করে তাদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত নারীদের জন্য তখন যে ৫টি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিলো তাও আবার নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি সচিবালয়ের অধীনে মহিলা বিষয়ক বিভাগ নামে একটি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। এ বিভাগ নারীদের জন্য জাতীয় মহিলা একাডেমী, মহিলা উন্নয়ন কেন্দ্র, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী এবং ঢাকায় কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোষ্টেল নির্মান ইত্যাদি কতিপয় প্রকল্প গ্রহণ করে। কিন্তু পরিকল্পনাধীন সময়ের মধ্যে এসব প্রকল্পের কোনটিই বাস্তবায়িত হয়নি। পরে আরো দু'টি নতুন নারী উন্নয়ন প্রকল্প সংযোজন করে সব প্রকল্পগুলো (৭টি) ১৯৭৮-৮০ সালের অন্তবর্তীকালীন দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ৭টি প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২টি প্রকল্প ১৯৮০ সাল নাগাদ সম্পন্ন হয়।"[১৮]

২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ২৬টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২১টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়, ১টি পরিত্যক্ত এবং ৪টি তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্থানান্তরিত হয়। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রধান ভৌত সাফল্যের ভিতর ২০৪টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র। এটি হাঁস-মুড়গীর খামার (থানা পর্যায়ে) এবং দরিদ্র আশ্রয়হীন মহিলাদের প্রশিক্ষণের জন্য ৩৮টি ইউনিয়ন উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। ২টি উৎপাদনমুখী পাইলট প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষকতার ক্ষেত্রে মহিলাদের কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ক্রাশ প্রোগ্রামের অধীনে ৪৭টি প্রাথমিক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউটের হোষ্টেল মেরামত ও হল নির্মাণ করা হয়।"[১৯] এছাড়াও ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও গবেষণা, ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণের ব্যাপারে মহিলাদের জন্য কোন কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়নি। ২য় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, বিদ্যমান দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র এবং তিবাযুক্ত কেন্দ্রগুলোর উন্নয়নের মাধ্যমে মহিলাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সীমিত অগ্রগতি সাধিত হয়।"[২০]

নারীর জন্য কর্মসংস্থান বিস্তারের ক্ষেত্রে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়। ২য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নির্ধারিত সরকারী কর্মসংস্থানের ১০শতাংশ কোটা ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৫শতাংশে উন্নীত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় এবং স্বাস্থ্য

Dhaka University Institutional Repository

ও জনসংখ্যা খাতে নারী কোটা ৬০শতাংশ উন্নীত করার কথা বলা হয় এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময় উত্তীর্ণ হবার পর দেখা যায় যে, ৬০,০০০ হাজার মহিলাকে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ২লক্ষ্য মহিলাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ২০,০০০ মহিলাকে আত্মকর্মসংস্থানে আর্থিক সাহায্য করা হয়। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৫টি হোস্টেল, কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের জন্য ৩৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার, ১টি আইনগত সাহায্য সেল, ১টি কর্মসংস্থান তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ৫০কোটি টাকার মধ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।[১৯]

৪র্থ পরিকল্পনায় মোট ২০টি উন্নয়নপ্রকল্প এসময় নারী সংক্রান্ত উপখাতের অধীনে গ্রহীত হয় যার মধ্যে ৮টি প্রকল্প আবার পরের বছরগুলিতে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিকল্পনাধীন সময়ে রাষ্ট্রীয় কর্মসংস্থানে নারীর অংশ ৬ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি, নারী স্বাক্ষরতার হার ১৫থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ১লাখ নারী দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধার প্রবর্তন, ৫০ হাজার নারীর জন্য ব্যাপক ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচী। কাজ ও ঋণের মাধ্যমে ১লাখ নারীর জন্য দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণের কথা বলা হয় এবং পরিকল্পনাধীন সময়ের শেষে দেখা যায় যে, ৩৪৬২৯ মহিলাকে স্বকর্ম সংস্থানের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করা হয়েছে। এছাড়া ৬৩,১২৭ জন নারীকে বৃত্তিমূলক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ১,২৭৮.৭০ মিলিয়ন টাকা সহজ সর্তে ঋণ দেয়া হয়েছে। ৪র্থ পরিকল্পনায় নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৫৫০.০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে ১৯৯৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ৫৪৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।[১৮]

৫ম পরিকল্পনায় সমতা, পরিবেশ অনুকূল ও সামাজিকভাবে টেকসই উন্নয়ন এবং জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে বেইজিং প্লাটফরম ফর এ্যাকশন বাস্তবায়নের একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রনীত হয়েছে এবং জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালাও প্রণীত হয়েছে। যেহেতু সর্বশেষ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের বিষয়টি যেহেতু এখনো বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে তাই কর্মসূচী বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করা যাচ্ছে না।

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, নারীর উন্নয়নকে নারীর আয় বৃদ্ধি করে তার দারিদ্র দূর করার মাঝে সীমিত না রেখে যদি প্রচলিত মূল্যবোধের বিপরীতে নারীকে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের দিক নির্দেশনা তৈরী হয়, তবেই যথাযথ মানব সম্পদ হিসেবে নারীর উন্নয়ন সম্ভব। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বৃমিকা পালনকারী হিসেবে চিহ্নিত হলেই তার উন্নয়ন ঘটবে না বরং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সরকারী নীতি নির্ধারণীতে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন অপরিহার্য। কেননা, পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ এবং তার সমস্যা সমাধানে তার উচ্চকণ্ঠ ঘোষিত হওয়ার পরিবর্তে নারীকে উন্নয়নের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে পুরুষ কর্তৃক সমস্যার সমাধান খোঁজা

Dhaka University Institutional Repository

হলে তা যথার্থই উন্নয়নের পরিহাস বলে চিহ্নিত হবে। এ যাবৎ গৃহীত কর্মসূচীসমূহ তারই উদাহরণ। জনগণের কল্যাণ রাজনীতিতে ও রাষ্ট্র পরিচালনার কৌশলের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। জনগণ অর্থাৎ নারী এবং পুরুষ উভয়ই রাষ্ট্র পরিচালনা কৌশলের সমান অংশীদার।

প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন, রাষ্ট্র পরিচালনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল বিষয় এবং কলাকৌশল নির্ণয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একারণে নারীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রশাসনেই নারীর অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় পূর্ব শর্ত। নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, আন্তরিক ইচ্ছার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন পরিচালনায় এবং রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে নারীর উচ্চকণ্ঠ এবং নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় প্রশাসনের উচ্চস্তরে সংযোজন হওয়া প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র ঃ

*১ সৈয়দ শওকতুজ্জামান; ''উন্নয়ন ও পরিকল্পনা'' উন্নয়ন সিরিজ, ঢাকা, বাতায়ন পাবলিশার্স, নভেম্বর, ১৯৯৭, পৃ:- ১২.

*২ Special Seminar on Development Planning in Bangladesh: A review of the Droft Fourth Five Year Plan, Organized by BIDS, Dhaka 18-19 August,'90. P.- 1.

*৩ The Second Five Year Plan. 1980-85. Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, May '98, P:- 97

*৪ The Third Five Year Plan, Planning Commission, Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, Dec.'85. P:- 111-112.

*৫ The Fourth Five Year Plan, P:- 1-5.

*৬ প্রাগুক্ত. P:- 111-11

*৭ সৌমিত্র ভট্টাচার্য, 'উন্নয়ন ঃ অন্য বিচার', প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স, পৃ: ১০৫.

*৮ এম. এম. আকাশ, 'বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন', উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৫ সংখ্যা, পৃ: ১৮-১৯.

*৯ এম. এম. আকাশ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬.

*১০ আলতাফ পারভেজ, ''বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ'' জনঅধিকার, ২০০০, পৃ:- ৯৬.

*১১ তাহমিনা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ:- ৩৮.

*১২ আনু মোহম্মদ, ''বাজেট : পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন''হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ: ১১৩.

*১৩ Government of Bangladesh, 'Second Five Yaer Plan', Planning Commission, 1980-85, P – 435.

*১৪ Government of Bangladesh. Second Five Yaer Plan, 'Planning Commission', 1980-85, p:-XVIII – 36.

*১৫ Govt. of Bangladesh,"Third Five Year Plan", Planning Commission, 1985-90, P:- 437.

*১৬ Government of Bangladesh, "Four Five Year Plan", Planning Commission, 1990 – 1995. P:-XIII – 6.

*১৭ Government of Bangladesh, "Fifth Five Year Plan", Planning Commission, 1995 – 2000.

*১৮ শাহীন রহমান; ''জেন্ডার প্রসঙ্গ'' উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৮, লালমাটিয়া, পৃ:- ১৮.

*১৯ তাহমিনা আখতার, ''মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট'' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ:- ৪২.

*২০ Govt. of Bangladesh."Third Five Year Plan". Planning Commission, 1985-90. P:- 436.

*২১ তাহমিনা আখতার, প্রাগুক্ত, পৃ:- ৪৮.

*২২ Govt. of Bangladesh, Fifth Five Year Plan, Planning Commission. P.- 36.

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

৬.১ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ঃ একটি পর্যালোচনা

৬.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন বনাম নারী উন্নয়ন কর্মসূচী

৬.৩ নারী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা

৬.৪ উপসংহার ও সুপারিশমালা

তথ্য নির্দেশিকা

Dhaka University Institutional Repository

মানব সম্পদ উন্নয়নে নারী ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সাধারণত: কোন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের আশানুরুপ পরিবর্তনে, অনুন্নত দেশ উন্নত স্তরে, মন্দ সমাজ ভালো স্তরে, পরিবর্তিত হবে বা উন্নয়ন হবে। এই অর্থে উন্নয়ন একটি চলমান প্রক্রিয়া। 'উন্নয়ন প্রচেষ্টা'-র অর্থই হলো প্রতিটি মানুষকে পরিপূর্ণ জীবনের সুযোগ করে দেওয়া।[*১] পরিপূর্ণ জীবন 'জীবন যাত্রার মান' এবং 'সক্ষমতা'-র উপর নির্ভরশীল। 'জীবন যাত্রার মান' বলতে বুঝায় মাথাপিছু আয়ের হিসেব, প্রত্যাশিত আয়ু, বাস্তব সামগ্রীর গড়পড়তা ব্যবহারের পরিমান, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিক্ষার মান প্রভৃতি। এবং 'সক্ষমতা' হলো - অধিকার, রুচী, পছন্দ, ঝোঁক, প্রবনতা প্রভৃতি। তাই উন্নয়নের পথে অগ্রগতি বলতে "দেশের মানুষের সক্ষমতার বিকাশকে বুঝানো হয়"।[*২] এখন এই দেশের মানুষ শুধু পুরুষ নয়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উভয়কেই বুঝানো হয়। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। যখন আমরা পরিসংখ্যানের দিকে তাকাই, দেখি যে জীবন যাত্রার মান থেকে শুরু করে সক্ষমতা গঠনে নারী, পুরুষের থেকে অধিকহারে অধিকার বঞ্চিত। অধ্যায় ৪, ৫ ও ৬ -এ ব্যপকভাবে আলোচিত হয়েছে। এই বঞ্চনা উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিঘ্নিত করেছে। কেননা, একটা সময় ছিল যখন মনে করা হতো যে, দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার মূল সমাধানের জন্য জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি অবশ্য প্রয়োজনীয়। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই মূলধনের ক্রমবৃদ্ধি প্রয়োজনীয় আর তার জন্যই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা ছিলো উৎপাদন ও উৎপাদন বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধিভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতে মনে করা হয়েছিলো যে দ্রব্যোৎপাদনই অর্থনৈতিক বিকাশের চাবিকাঠি। মানবিক প্রয়োজন সাধন থেকে ধারণাটি একটু সরে গিয়ে স্থাপিত হলো অর্থনৈতিক বিকাশে আর অর্থনৈতিক বিকাশের মানে দাঁড়াল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি। পরবর্তীতে সেবাকর্মকে জাতীয় আয়ের হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হলো। অর্থাৎ মানুষের জন্য কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি হিসেবে ধরা হলো। কর্মসংস্থানের যৌক্তিকতা জাতীয় আয় বাড়ানোতে।[*৩] কিন্তু এর সীমাবদ্ধতায় দেখা গেল যে, মানব বিকাশের অনেক কিছুই অর্থনৈতিক বিকাশ দিয়ে সাধিত হচ্ছে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরমায়ু, শুদ্ধ পানীয় জল, চিকিৎসার ঔষধ ও ডাক্তার, মানুষের মর্যাদা ও ব্যক্তিত্ব এসবের অনেক কিছুই ঠিক অর্থনৈতিক বিকাশের হার দিয়ে স্পর্শ করা যাচ্ছে না। এরকম বোধ থেকে 'উন্নয়ন - মানব উন্নয়ন' বা অর্থনৈতিক বিকাশ ও 'মানব বিকাশ' ধারণাগতভাবে আলাদা হয়ে উঠল। বোধের এই ভিন্নতার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়া গেল ইউনাইটেড নেশনস্ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম - এর তরফে প্রকাশিত প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন থেকে। প্রতিবেদন ১৯৯০ এর কথামুখ শুরু হয়েছে এভাবে ঃ "This report is about people & about how development enlarges their choice. It is about more than GNP growth, more than income and wealth and more than producing commodities and accumulating capital." মাহবুব-উল হকের প্রণোদনায় প্রনীত এই প্রতিবেদন উন্নয়নের আশু ধারণাকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে দিয়েছে। পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে মানব উন্নয়ন সূচক তৈরী করা হলো এবং তুলনামূলক মানের

Dhaka University Institutional Repository

নিরীখে উন্নয়নকে দেখা শুরু হলো। যদিও অনেকে মনে করেণ যে, পরিসংখ্যানের মাপ থেকে বস্তুর প্রকৃত অবস্থা কিছুতেই ধরা যায় না।*৪ পরবর্তীতে লক্ষ্য করা গেল যে, মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে নির্ধারিত সূচকের সাহায্যে সমাজের সামগ্রিক স্তরের তথ্য ঠিকমত আসছেনা অর্থাৎ মানব উন্নয়ন থেকে নারী উন্নয়ন বাদ থেকে যাচ্ছে - সেই অসুবিধা দূর করতে আংশিক স্তরেরকিছু কিছু তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয় যা থেকে মানব উন্নয়ন নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী উন্নয়নকে বিবেচনা করা যায়। এইভাবে বর্তমানে কোন দেশের কতোটা প্রবৃদ্ধি অর্জিত হলো বা জনগণের জন্য পরিষেবা প্রাপ্তির পরিধি কতটুকু প্রসারিত হলো তা' দিয়েই নয়, সেই সঙ্গে সেই দেশের নারীর উন্নয়ন কতোটুকু ঘটছে সেই নিরীখেও প্রতিটি দেশের উন্নয়নকে বিচার করা হচ্ছে। কিন্তু এই সকল সূচক নির্দেশক নারী উন্নয়ন নীতিমালা উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় যে, সামগ্রিক বিচারে নারী উন্নয়ন ঘটছে না।

৬.১ পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন ঃ একটি পর্যালোচনা

যথোপযুক্ত শিক্ষ, ভাল স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রতা, পরিবেশ নিরাপত্তা, মানব কল্যাণ প্রভৃতিতে নারীর অসম অবস্থান লক্ষ্যণীয়। মানব সম্পদ উন্নয়ন ধারণা এবং পরিকল্পনাধীন কর্মসূচীর নিরীখে নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হবে যে, সক্ষমতার গঠন ও তার ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে মৌলিক মানবীয় চাহিদাপূরণের দ্বারা এবং এই মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ দেশীয় সরকারের দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। সেদিক থেকে সরকার তার উন্নয়ন দর্শন দলীয় তথা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তার প্রতিফলন ঘটায়। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নারীর অবস্থান বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ নিরাপত্তা, আয় প্রভৃতিতে তার অবস্থান এখনো প্রান্তিক (৪র্থ অধ্যায়ে পরিসংখ্যানসমূহ পরিদৃষ্ট)। এই প্রান্তিকতা একজন নারীর সমাজে আপোস করে বেঁচে থাকতে জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। জন্ম থেকেই শুধু টিকে থাকা, জীবন নির্বাহ করার চাহিদা পূরণের সংগ্রামে লিপ্ত হয় যে নারী তার মাঝে জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত সত্তাগুলো বিকশিত হয় না, তার জীবন হয়ে পড়ে অনিশ্চিত, আশাহীন, সেখানে সে নারীর সৃজনশীলতা অর্থহীন, অসম্ভব।

উন্নয়নের অর্থ মানুষের সৃষ্টিশক্তির মুক্তি এবং এই মুক্তির পরিকল্পনাই হলো উন্নয়ন পরিকল্পনা। এই উন্নয়ন হবে মানুষের দ্বারা বিশেষ করে নারী উন্নয়নের কথা যখন বলা হয় তখন আবশ্যিক ভাবে উন্নয়নে নারীর সৃষ্টিশক্তির বিষয়টি চলে আসে এবং এক্ষেত্রে পূর্বে প্রাথমিক প্রয়োজন পূরণ এবং পরে সৃষ্টি শক্তির বিকাশ বিষয়টি চলে আসে। যেখানে প্রয়োজন পূরণই হচ্ছে না সেখানে দ্বিতীয়টি বহু দূরাগত বিষয়। এ প্রেক্ষিতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালোচনায় বলা যায় যে, বিগত ৫টি পরিকল্পনাতে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে বিবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করা হলেও (৫ম অধ্যায়ে আলোচিত) সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় গ্রামীন নারী সমাজের ব্যাপক অংশ পিছিয়ে আছে। নারীর পরিস্থিতির উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ অবনতি হচ্ছে (৩য় অধ্যায়ের পরিসংখ্যানসমূহ পরিদৃষ্ট)। উন্নয়নের মূল ধারায় নারীদের আনয়নের

Dhaka University Institutional Repository

প্রেক্ষাপটে টাস্কফোর্স '৯১-এ পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনা করা হয় এভাবে 'প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা' কালে উন্নয়নে নারী বিষয়ক ধারণাটি তেমন প্রসার লাভ ঘটেনি। তা'ছাড়া তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনর্বাসনমূলক কর্মকান্ডই স্বাভাবিকভাবে গুরুত্ব পায়। পরবর্তীতে ১৯৭৮-৮০ মেয়াদের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনায় মহিলাদের বিষয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনার ধ্যান-ধারণায় অন্তর্গত করা হয় এবং এ ব্যাপারে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। মহিলা বিষয়ক বিভাগ ও বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা বিষয়ক সংস্থা সৃষ্টি করা হয়। তা'ছাড়া মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, কৃষিভিত্তিক কর্মসূচী, পুষ্টি ও শিশু যত্নের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্বে গৃহীত কর্মসূচী চালু রাখা হয় এবং মহিলাদের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে পূর্বের ধারাকে আরো বলবান করার প্রয়াস চালানো হয় এবং সেই সাথে নারীকে উন্নয়নমূলক খাতসমূহে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। তবে সার্বিকভাবে এ সমস্ত কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সীমিত ও খন্ডিত।

৪র্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্য প্রথমবারের মতো কার্যকরী নীতিমালা প্রণয়নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ বৈষম্য দূরীকরণের প্রচেষ্টাকে ৪র্থ পরিকল্পনার একটি লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখকরা হয়েছে।

৫ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সামষ্টিক কাঠামোর আওতায় নারীর উন্নয়নকে সমন্বিত করা এবং উন্নয়নের মূল ধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সকল ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য হ্রাস করাকে লক্ষ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্বোক্ত পরিকল্পনাসমূহে মহিলাদের উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা' বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে - কোন পরিকল্পনাই মহিলাদের আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। ৫ম পরিকল্পনা ছাড়া ৪টি পরিকল্পনাতে নারী কোন পৃথক অধ্যায়ে আলোচিত হয়নি।

- প্রথম পরিকল্পনাতে নারী ইস্যুটি এসেছে সমাজ কল্যাণ খাতের অধীনে এবং মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের পুণর্বাসন করার দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত করে।
- দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাতে নারীর ইস্যুকে কল্যাণমূলক থেকে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় রূপান্তরিত হয়।
- দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দক্ষতা বৃদ্ধি, ঋণ ও উদ্যোগ সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।
- তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী ও পুরুষের উন্নয়নের মধ্যে ঐায়সাম্যহীনতা দূর করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

- চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে অর্থনীতির সকল খাতে নারী উন্নয়নের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এতে বিভিন্নখাতভিত্তিক উদ্যোগের মাধ্যমে নারকে সামষ্টিক কাঠামোর (Macro Framework) প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করে দরিদ্র ও অসহায় নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ও উন্নয়নের ওপর নজর দেয়া হয়।
- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক নারী উন্নয়নের রূপরেখা প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য হলো সমতা, পরিবেশ অনুকূল ও সামাজিকভাবে টেকসই উন্নয়ন এবং জনগণের অংশগ্রহণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নারীর সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

এছাড়া সকল পরিকল্পনাতে দরিদ্র মহিলাদের প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে, সকল পরিকল্পনায় মহিলাদের জন্য একই ধরণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে যেমন - শিশু পালন, হাঁস-মুরগি, ডেইরি ফার্ম, মৎস চাষ, হস্ত শিল্প, কুঠির শিল্প, তাঁত শিল্প ইত্যাদি ধরণের প্রশিক্ষণ; যেগুলোর মান অত্যন্ত নিম্ন মানের এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারজাতকরণের সমস্যা রয়েছে। উপরন্তু মহিলাদের দক্ষতা উদ্দেশ্যে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, মাঠ পর্যায়ে সে প্রশিক্ষণ কাজে লাগাতে পারছে কিনা এ বিষয়ে অনুসরণ করা হয়না। অনেক সময় প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম লোকবলের অভাবে মাঠ পর্যায়ে তদারকি করাও সম্ভব হচ্ছে না যা কিনা ফলপ্রসূ কর্মসূচী বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত। অন্য দিকে এইসব প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা ও আর্থিক বরাদ্দ যা ধার্য করা হয়েছে তা মহিলা সমাজের জন্য একটা চরম হতাশাব্যঞ্জক। যে দেশে ৪৯.৮% হচ্ছে মহিলা যাদের ৮০% লোকই দারিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে, সেদেশে বিভিন্ন পরিকল্পনায় ৬০,০০০ বা ১লাখ মহিলা প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে। আবার যেহেতু মহিলারা দরিদ্র বিধায় স্বকর্ম সংস্থানের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তা স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫০,০০০ মহিলাকে স্বকর্ম সংস্থানের জন্য আর্থিক সহায়তা দান করা হয়েছে।"[৫]

প্রতিটি পরিকল্পনায় মহিলা শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং পুরুষ ও মহিলাদের বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন পরিকল্পনায় সার্বজনীন শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন - দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাতে যদিও প্রতিটি থানায় ১টি করে স্কুল, ১টি করে কলেজ স্থাপন করার কথা ছিল কিন্তু তা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। প্রাইমারি স্কুল ও কলেজগুলোতে এখনো পুরুষ শিক্ষক সর্বাধিক, মহিলা শিক্ষক অত্যন্ত নগন্য। যদিও প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় প্রাইমারি ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৬০% মহিলা শিক্ষ নিয়োগ করতে হবে এবং সেই সব পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এই লক্ষ্যমাত্রা আজ পর্যন্ত অর্জন করা সম্ভব হয়নি। পরিসংখ্যানগতভাবে যদিও আমরা দেখি তা হলে দেখা যাবে যে, ১৯৯১ সালে উচ্চ বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ১লক্ষ ১০হাজার ৩১৩জন, এর মধ্যে শতকরা ৮৭.৮৩জন পুরুষ শিক্ষখ এবং মহিলা শিক্ষক হচ্ছে শতকরা ১২.১৭ জন। অন্যদিকে ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

সালে প্রাইমারি বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা হচ্ছে ২০লক্ষ ২হাজার ৮৪৭জন এবং এর মধ্যে পুরুষ শিক্ষক হচ্ছে শতকরা ৭৯.৫৯জন আর মহিলা শিক্ষক হচ্ছে শতকরা ২০.৪১জন।[*৬]

আবার দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি পরিকল্পনায় শিশু উন্নয়ন এবং মহিলা উন্নয়ন সমবেত করার প্রয়াস। মহিলা উন্নয়নের সাথে শিশু বিষয়টি সম্পর্কযুক্ত থাকতে পারে, তার অর্থ এই নয় যে, শিশু উন্নয়ন এবং নারী উন্নয়ন। পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও একই সূত্রে গাথাঁ। তবে কর্মজীবী মহিলাদের কর্মকালীন সময়ে বাইরে থাকায় কারণে শিশু লালন-পালন এবং কর্মসংস্থান এ দুইয়ের বাইরে থাকায় পরিকল্পনাতে কর্মকালীন সময়ে নিম্নবেতনভূক্ত কর্মজীবী মহিলাদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। এবং কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের ঘোষণা করেণ। কিন্তু তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীন সময় শেষে দেখা যায় যে, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৫টি হোস্টেল, কর্মজীবী মহিলাদের শিশুদের যত্নের জন্য ৩৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার, ১টি আইনগত সাহায্য সেল, ১টি কর্মসংস্থান তথ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।[*৭]

নারী উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন করতে গিয়ে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় উল্লেখ করে যে,

- নারী উন্নয়নের উদ্যোগসমূহ 'এডহক' এবং সমন্বয়হীন।
- নারী উন্নয়নের ইস্যুর প্রতি সকল মনোযোগ শুধু মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে।
- সকল মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা-র প্রক্রিয়ায় নারী উন্নয়নের ইস্যুগুলো গুরুত্ব পায় না।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পগুরোতে নারীর সমতা ও উন্নয়ন জাতীয় লক্ষ্যমাত্রার আলোকে নির্বাচন করা হয় না।
- নারী ও পুরুষের অবস্থা, অবস্থান ও সুযোগের ক্ষেত্রে যে ভিন্নতা থাকে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট বোধগম্যতার প্রকাশ প্রকল্পগুলোতে সম্পৃক্ত হয় না। সে জন্য উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সুফল নারী-পুরুষের সমভাবে বন্টন করে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার কাজে প্রকল্পগুলো সফলতা অর্জন করতে পারছে না।
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন বিষয়ক নির্দেশ কিভাবে সেক্টরাল পরিকল্পনায় সম্পৃক্ত করতে হবে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের সে সম্পর্কে পরামর্শ বা নির্দেশনা থাকে না।
- প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলোতে নারী উন্নয়নের চাহিদা রয়েছে কিনা, নারীদের জন্য সমান সুযোগ থাকবে না। সেসব মূল্যায়নের কোন শর্ত প্রকল্প প্রস্তাবনা ও অনুমোদন ফরম্যাট-এ থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক প্ল্যানিং - এর জন্য উপাত্ত ও তথ্য ভিত্তি খুবই দুর্বল।
- নারীর ক্ষমতা বিষয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সম্পর্কে অধিকাংশ সরকারী পরিকল্পনা পর্যায়ের কর্মকর্তা অসচেতন।[*৮]

অন্যান্য পরিকল্পনার মতো ৫ম পরিকল্পনাতেও অতীতের ধারাবাহিকতার কতগুলো দুর্বলতা ও অসংগতি লক্ষ্য করা যায় বলে শাহীন রহমান তার 'জেন্ডার প্রসঙ্গ' সংকলনটিতে উল্লেখ করেণ। যেমন -

- পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন অধ্যায় ব্যতীত অন্যান্য অধ্যায়ে নারী উন্নয়ন ইস্যুসমূহের প্রান্তিক অবস্থান;
- পরিকল্পনা নীতি, কৌশল ও কার্যক্রমের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা;
- পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের অভাব;
- মন্ত্রণালয়ের রুলস অব বিজনেস/ম্যানোডটে নারী উন্নয়ন বিষয়টির অনুপস্থিতি;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মূল কার্যক্রমের সঙ্গে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সম্পর্কহীনতা;
- উইড ফোকাল পয়েন্টের অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং নারী উন্নয়ন কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সময়, সম্পদ ও দক্ষতার অভাব;
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ ও অর্থের অভাব;
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কমিটিতে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্বের সীমিত সুযোগ;
- জেন্ডার সচেতন তথ্য ও উপাত্তের অভাব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ঋণ, প্রশিক্ষণ প্রভৃতি গতানুগতিক কর্মসূচী এবং উপরোক্ত কাঠামোগত অসংগতি নারী উন্নয়নকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

৬.২ মানব সম্পদ উন্নয়ন বনাম নারী উন্নয়ন কর্মসূচী

বিগত পরিকল্পনা সমূহের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঐতিহাসিকভাবেই নারী উন্নয়ণ পরিকল্পনা উপেক্ষিত হয়ে আসছে। নারীর জন্য পুনর্বাসন ধারণা থেকে ধীরে ধীরে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা শুরু হয় যা বহুখাতভিত্তিক কর্মসূচীতে যুক্ত হয়। পাশাপাশি ১৯৭৪ সালে বিশ্ব জনসংখ্যা সম্মেলনের ফলে বাংলাদেশ সরকার দেশের জনসংখ্যা সমস্যাকে এক নম্বর সমস্যা হিসেবে ঘোষণা করে এবং এ প্রেক্ষিতে ৩টি কর্মসূচী চালু করে যা নারী সংশ্লিষ্ট, যেমন -

১। সমাজ কল্যাণমূলক মন্ত্রণালয়ের অধীনে নারীর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং গ্রামীন

Dhaka University Institutional Repository

মা সংগঠন (Rural Mother's Club) কর্মসূচী।

২। স্থানীয় সরকার ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (Ministry of Local Government and Rural Development এর অধীনে জনসংখ্যা পরিকল্পনার (Population Planning) জন্য 'নারী সমবায়' কর্মসূচী। এবং

৩। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ গণনার জন্য (Measure for Population Control) বাংলাদেশের নারী পুনর্বাসন এবং কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় যা এখন সমাজকল্যাণ ও নারী সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় হিসেবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

অন্যান্য কর্মসূচী যা,

১. আত্ম উন্নয়নের জন্য ঋণ কর্মসূচী, যেমন - গ্রামীন ব্যাংক প্রকল্প,

২. স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচী, যেমন - ধাত্রীবিদ্যা (Traditional Birth Attendant - TBA) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী,

৩. কৃষি সম্প্রসারণ প্রকল্প (Agricultural Extension Project),

৪. দুর্ঘটনা মোকাবেলা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (Crash Training Program),

৫. গ্রামীন নিয়োগ প্রকল্প (Rural Employment Project), যেমন - গ্রাম পরিচালনা (Rural Maintenance)

৬. দুঃস্থ সংঘ খাদ্য প্রকল্প (Vulnerable Group Feeding Project),

৭. নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প (Women Enterpreneurship Development Project)

প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচী গ্রহণের মূল বিষয় হিসেবে যে বিষয়টি কাজ করেছে তা'হলো - দক্ষতা উন্নয়ন ও ঋণদান কর্মসূচীর ভিত্তিতে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সহশিক্ষা (Impart Education) প্রদানের দ্বারা তাদের অবস্থার পরিবর্তন করা যাতে করে ছোট পরিবারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে এবং পরিবার পরিকল্পনায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। প্রায় প্রতিটি সরকার খাতভিত্তিক নারী কর্মসূচীকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রকল্পকে সম্প্রসারণ করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'নারী উন্নয়ন' প্রকল্পগুলো অধিকাংশ গড়ে উঠেছে জন্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও রিলিফের নীচে। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জন্মনিয়ন্ত্রণকে মহিলাদের বিষয় হিসেবে ধরা হয়েছে কারণ তারা জৈবিক পুণরুৎপাদনে ভূমিকা রাখে, তাই সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নারীর এই ভূমিকাকে রোধ করার জন্য নারীকে প্রধান হিসেবে ধরে নেয়া হয় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নারীদের আওতার বাইরে।[৯৮]

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য যে, উন্নয়ন পরিকল্পনায় যে অর্থ তার অধিকাংশই আসে বৈদেশিক সাহায্য থেকে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও (দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত) যে বৈদেশিক অর্থ সাহায্য ও দর্শন সাহায্য তার করাদ্দের ক্ষেত্রে উন্নয়নে নারীকে একপেশে করে রাখা হয়েছে। টেবিল - ২ এ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দাতা দেশগুলোর অনুদানের অর্থের প্রায় ৫৬ ভাগ ব্যয় হয় পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ নারী প্রজননের ক্ষমতা রোধ করাই নারী উন্নয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দাতাদেশগুলোর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে কম।

স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কর্মসূচী (ধাত্রী বিদ্যা) = নারীর স্বাস্থ্য বলতে গর্ভধারণ বিষয়কে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং এর জন্য প্রসূতী মায়ের চিকিৎসার উপর জোড় দেয়া হয়। কিন্তু জন্মের পর থেকেই অন্যান্য বৈষম্যের মতো খাবারের ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য

সারণী - ৬.১ ঃ নারী বিষয়ক প্রকল্পের জন্য দাতাদের সাহায্য ১৯৮০-৮৬

(হাজার ডলারে)

প্রকল্পের ধরণ	মোট বরাদ্দ অর্থ	শতকরা বরাদ্দ
স্বনির্ভর কর্মসূচী	২১৮৩১৯	২৫.৭
স্বাস্থ্য	২০০৯১	২.৩
পরিবার পরিকল্পনা	৪৬০৬৭৩	৫৫.৭
শিক্ষা	৬৫৯২৯	৭.৯
কৃষি	২৪৭৮	০.৩
গণপূর্ত কাজ	২৯৯৭৬	৩.৫
ট্রেইনিং	৬৮৯৩৯	৪.৬
গবেষণা	১২৫৩	০.১

উৎস ঃ উইমেন ফর উইমেন প্রকাশিত "ক্ষমতায়ন" জার্ণাল ১৯৯৬, সংখ্যা-১,
এ আবুল হোসাইন ভূইয়া ব্যবহৃত চার্ট। পৃ: ৩৩.

দেয়া হয়। কিন্তু জন্মের পর থেকেই অন্যান্য বৈষম্যের মতো খাবারের ক্ষেত্রেও যে বৈষম্য সূচীত হয় তার ফলে পুরুষের তুলনায় নারীর শারীরিক বৃদ্ধি কম হয়। উপরন্তু ধর্মীয় ও সামাজিক প্রচলিত অনেক কুসংস্কারজনিত গোড়ামীর জন্য এবং অর্থ বিবেচনায় নারীর অসুস্থ্যতা অগ্রাধিকার পায় না। তদুপরি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় গৃহাভ্যন্তরীণ অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অবস্থান গর্ভবতী নারীর স্বাস্থ্য রক্ষায় মারাত্মক হুমকী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং শুধুমাত্র দাত্রীবিদ্যা কর্মসূচী দ্বারা নারীর স্বাস্থ্যরক্ষা কতোটুকু হয় সেটাও বিবেচ্য বিষয়।

"ভূমিহীন ওযুবকদের ন্যায় নারীদেরকে সামাজিকভাবে বঞ্চিত এক গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নারীর শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের অভাব। এ ধরণের চিন্তাধারা নারীদের জন্য শিক্ষাদান কর্মসূচী ও বিভিন্ন অর্থসংস্থানকারী ও প্রশিক্ষণের জন্য প্রকল্পকে সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখে যা দারিদ্র দূরীকরণের নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত।"[১০] অর্থনীতি মূলত কৃষিভিত্তিক তাই গ্রামীন অর্থনীতির উৎপাদন সাধিত হবে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এবং এই উৎপাদন বৃদ্ধি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা তাদের ন্যূনতম চাহিদা মেটাতে পারছে এবং এই ভূমিহীন দিনমজুর শ্রেণীর প্রায় অর্ধেক অংশ হচ্ছে তাদের স্ত্রীরা। এই যুক্তিতে দারিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

দূরীকরণের নামে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সমবায় পদ্ধতিতে অর্থ উপার্জনজনিত প্রকল্প শুরু করেন। সরকারী আয় বৃদ্ধি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে, IRDP , কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও গ্রামীন ব্যাংক। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, DANIDA, SWALLOWS, PROSHIKA ইত্যাদি। অনেকের মতে, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করাতে নারীরা তাদের সনাতনী ভূমিকার বাইরে আসতে পেরেছে। কিন্তু এর পরও নারীরা তাদের নিজেদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সফল হতে পারছে না। সামাজিক মূল্যবোধ অপরিবর্তিত থেকে যাওয়ার দরুণ।

শিক্ষায় যে সুযোগ সুবিধা তা' নারীকে সামনে চলার পরিবর্তে পেছনের দিকে নিয়ে যায় এবং সত্যিকার প্রয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলে। কেননা যে, বাধ্যতামূলক প্রাইমারী শিক্ষা, বিনা বেতনে মেয়েদের দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক প্রভৃতির জন্য (ক) খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার ব্যবস্থা; (খ) মেয়েদের ক্ষেত্রে ৭৫% উপস্থিতি সাপেক্ষে বৃত্তিপ্রদান, যে ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছে তাতে একজন নারীর নিজের প্রয়োজনবোধকে বোঝার জন্য যথেষ্ট নয় বরং এতে কিছু পারিবারিক শিক্ষা দিতে পারে যেখানে নারী একজন মানুষ হিসেবে নয় বরং একজন মা, বোন বা স্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালনে কিছুটা সহায়তা করে তাকতে পারে। উপরন্তু শহর ও গ্রামে মেয়েদের শিক্ষায় মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এর কারন প্রধানতঃ অর্থনৈতিক যা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তা' ছাড়াও টাস্কফোর্স প্রতিবেদন ১৯৯১-এ উল্লেখ করা হয় যে শিক্ষা খাতে যে অর্থ ব্যয় হয় তার বিভাজনে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য স্পষ্ট। পঞ্চবার্ষিকপরিকল্পনাসমূহ, নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করলেও পুরুষের সমপর্যায় বিবেচনা করা হয়নি। ফলে দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং পরিকল্পনা প্রণয়নে বিরোধ দেখা দেয়। এর প্রতিফলন ঘটেছে আমাদের দেশর নারী শিক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাপনায়। গত ৩০ বৎসরের জাতীয় পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৯৬১ সালে পুরুষ স্বাক্ষরের সংখ্যা নারীর তুলনায় বেশী থাকলেও ক্রমান্বয়ে কমে এসে ১৯৮১-তে তা প্রায় দ্বিগুণে দাঁড়িয়েছে এবং ১৯৯১-তে এসে এই ব্যবধান আরো কমেছে (সারণী -৬.২)। ১৯১ থেকে ১৯৮১তে এসে শতকরা হারে নারী স্বাক্ষরের সংখ্যা বেড়েছে মাত্র ৫ ভাগ পক্ষান্তরে ১৯৯১-তে বেড়েছে প্রায় শতকরা ১১ ভাগ। এটি অগ্রগতির পরিচায়ক। কিন্তু এই অগ্রগতির প্রবনতা যদি ধরেও রাখা যায় তথাপি বাংলাদেশের সকল নারীকে স্বাক্ষর করতে সময় লাগবে কয়েকশত বছর। এখানেই পরিকল্পনা ও আইনে অসংগতি স্পষ্ট।

সারণী - ৬.২ ঃ নারী - পুরুষ ভেদে স্বাক্ষরতার হার ১৯৬১-৯১ (%).

বৎসর	নারী-পুরুষ	পুরুষ	নারী
১৯৬১	১৭.০০	২৬.০০	৮.৬০
১৯৭৪	২০.২০	২৭.৬০	১২.২০
১৯৮১	১৯.৭০	২৫.৮০	১৩.২০
১৯৯১	২৪.৯০	৩০.০০	১৯.৫০

উৎস ঃ BPC, 1991, P-123.

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়াও নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনাসমূহে দুঃস্থ সংঘ খাদ্য প্রকল্প, গ্রাম পরিচালনা প্রকল্প, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প প্রভৃতি কর্মসূচীসমূহ প্রকৃতপক্ষে নারী উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। নারী – পুরুষের বৈষম্য নিরোসন কমিয়ে আনা যেতে পারে কিন্তু সার্বিক ভাবে নারী সমতা আনয়ন একেবারেই অসম্ভব। কেননা, সাহায্য প্রকল্প সাময়িকভাবে প্রয়োজন দূর করতে পারে কিন্তু অবস্থা ও অবস্থানের উন্নয়ন সম্ভব নয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, নারী উন্নয়নে যে কর্মসূচীসমূহ যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে তা' আদৌ নারীকে একটি সন্তোষজনক অবস্থায় যেখানে উত্তরণ ঘটাতে পারছে না সেখানে মানব সম্পদ হিসেবে পছন্দ, সিদ্ধান্ত প্রভৃতিতে তার অংশগ্রহণ অর্থহীন ও অসম্ভব।

অপরপক্ষে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ সম্পর্কে বলা যায় যে, রাজনীতি ও উন্নয়ন পরস্পর সম্পৃক্ত। ... নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ তাদের অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। তাদের কণ্ঠস্বর যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে না শোনা যায় তা'হলে তারা কিভাবে কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনয়ন অসম্ভব। অপর পক্ষে পরিবর্তন ব্যতিরেকে এবং সমান সুবিধা ও সুযোগ ছাড়া ক্ষমতার অঙ্গনে পদার্পন করা যাবে না। সুতরাং রাজনীতির অঙ্গণে নারীর অবস্থান সংহতকরণ একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এপ্রসঙ্গে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীর অবস্থান পর্যালোচনায় বলা যেতে পারে যে, সংবিধানের,

১। ৩৬-৩৯ ধারায় নারী-পুরুষ, জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী নাগরিককে রাজনৈতিক অধিকারসহ সকল মৌলিক অধিকার প্রদান করেছে।

২। ধারা ৬৬, ১২২ - এ জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে নারী পুরুষে কোন পার্থক্য করেনি।

৩। ধারা ৬৫-তে জাতীয় সংসদে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংরক্ষিত আসনের বিধান রয়েছে।

৪। ধারা - ৯ এ স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে নারীকে বিশেষ প্রতিনিধিত্বের বিধান রয়েছে। এবং জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের নীতি বিধৃত হয়েছে।

৫। ধারা - ২৮ এ মৌলিক অদিখার হিসেবে রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকার প্রদান করেছে এবং নারী ও শিশুর পক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের এখতিয়ার রাষ্ট্রকে প্রদান করেছে।

বাংলাদেশের সংবিধানে উপরিউক্ত নারীর রাজনৈতিক অধিকার বিধৃত থাকলেও এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে নারীর আসন সংখ্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন নারী শূণ্য বলা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে সরকার ও বিরোধী

Dhaka University Institutional Repository

দল প্রধান নারী। তথাপিও স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায়ের সর্বস্তরে বিশেষভাবে কাঠামোগত রাজনীতিতে নারীর অবস্থান এক্ষেত্রে ব্যাপক সংগঠিত বা সুসংহত নয়। রাশেদ খান মেনন, 'রাজনৈতিক দল ও নারী এজেন্ডা' বিষয়ের আলোচনায় উল্লেখ করেন যে, সংবিধান, রাজনৈতিক দলের ঘোষণা, কর্মসূচী, নারী অধিকার সম্পর্কিত আইন, এমনকি রাজনৈতিক কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের বিষয়টি পর্যালোচনা কার তা' হলে এটা খুবই স্পষ্ট হবে যে, নারী ও নারী অধিকারের প্রশ্নটি আমাদের দেশের রাজনীতিতে এখনও পরিপূর্ণভাবেই অনুপস্থিত।"[১১]

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ থেকে নারীর বিযুক্তির কারণ ৪র্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এর কারণ আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে। সাধারণতঃ রাজনীতিতে পুরুষ প্রাধান্য ও নারীর বিযুক্তি বিষয়টিকে তত্ত্বগতভাবে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। **প্রথমতঃ** বলা হয় যে, নারীরা গৃহকর্মে আত্মনিবেদন করতে উৎসাহী বা সংসার সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডে আত্মনিয়োগই হচ্ছে নারীদের সামাজিকভাবে নির্ধারিত পছন্দ। **দ্বিতীয়তঃ** হলো, প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে রাজনীতিতে পুরুষের ভূমিকা এবং বিশেষ অধিকারের বিষয়টি তুলে ধরা। রাজনৈতিক প্রতিষ্টানগুলোও এসব ধ্যান ধারণা, মানোভাবকে আরো পাকাপোক্ত করে এবং রাজনীতিতে নারী বিযুক্তির সংস্কৃতিকে জিইয়ে রাখে। এছাড়াও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন এবং জনজীবনের রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় এই ধরণের নির্যাতন সমাজে ক্রমবর্ধমান হারে রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্বশালী হয়ে ওঠায় বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে প্রতিফলিত করে।"[১২]

রাজনীতিতে নারীর বিযুক্তির আরো যেসব কারণ রয়েছে,"[১৩] তা' হলো,

- রাজনীতি কর্মক্ষেত্রে কর্মদিবসের কোন বাঁধাধরা ও নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই এবং রাজনীতির দৈনন্দিন কার্যকলাপ ঘর-বাহির, দিন-রাতের কোন সময়সীমা টানে না। অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত নারী একটি কার্যদিবসের নির্দিষ্ট পরিসরে গৃহস্থালী ও কর্মক্ষেত্রের দ্বৈত দায়িত্ব সম্পাদন করতে যদিওবা সক্ষম হন, রাজনীতিতে এই সমন্বয় ঘটানো অত্যন্ত দুরুহ।

- রাজনীতিতে টিকে থাকা ও উপরিধাপে এগিয়ে যাবার জন্য অবধারিত চলাচল ও সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সমর্থন ও সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপন করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সমাজে এ ধরণের চলাচল ও সম্পর্ক স্থাপন সচরাচর গ্রহণযোগ্য হয় ন, কেননা তা' নারীকে প্রধানতঃ পুরুষের বা 'পর পুরুষের' সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, যেহেতু রাজনৈতিক অঙ্গন মূলতঃ পুরুষই ক্রিয়াশীল থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

- নারীর অভাব রয়েছে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার যা তাদেরকে রাজনীতি মুখী কর্মক্ষেত্রে স্থাপন করে রাজনীতিতে প্রবেশের পথ সুগম করে দিতে সক্ষম হতো।

- আমাদের সমাজে নারীর নিজস্ব আয় ও সম্পদের উৎস সীমিত। এছাড়া রয়েছে, যে সকল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ গোষ্ঠীর সাহায্যে বা সমর্থনে অর্থের সমাগম ঘটানো যায় বা রিসোর্স ও শক্তি সঞ্চয় করাযায় তাদের সঙ্গে নারীর জোরদার সম্পর্কের অভাব।[১৬]

এসব কারণ রাজনৈতিক অঙ্গণে নারীর উপস্থিতি ও সম্ভাবনাকে দূর্বল করে রাখে।

বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমদর্শিতার লক্ষ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা কাঠামোয় নারীর দৃশ্যমান করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বীকৃত। আমাদের দেশেও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায় নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, রাজনীতিতে নারীর সংখ্যাভিত্তিক অবস্থান বৃদ্ধি ও সংহতি হলেই কি স্বতঃসিদ্ধভাবে নারীর সমস্যা বা ইস্যুরাজনীতির অঙ্গণে দৃশ্যমান হবে? অর্থাৎ নারীর সমস্যা বা জেন্ডার কনসার্ণ কি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে প্রাধান্য পাবে? [১৭] জাতিসংঘের স্টাডির এক অংশে উল্লেখ করা হয় যে, সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পর্যায়, রাজনীতি ও ক্ষমতায় নারীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশীদারিত্বের যৌক্তিকতার পক্ষে বলা হয়েছে যে, নারীর রাজনীতিতে অংশগ্রহণ, প্রথমতঃ গণতন্ত্র ও সমতার প্রশ্ন, নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন, জনসংখ্যার অনুপাতে রাজনীতিতে এদের প্রতিনিদিত্বের তাবী অনস্বীকার্য। দ্বিতীয়তঃ নারীর দুর্বল উপস্থিতি রাজনৈতিক অঙ্গণে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। কেননা, রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়ায় অপ্রতুল উপস্থিতি ও সীমিত অংশগ্রহণের কারণে নারী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক প্রদ্ধতির মধ্যে রয়ে যায় এক বিরাট ব্যবধান বা ডিসজাংশন। তৃতীয়তঃ যুক্তি নারী-পুরুষের স্বার্থের ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীরা তাদের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকেবহাল। কিন্তু রাজনীতিতে যদি তাদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব না থাকে তা'হলে তারা তাদের স্বার্থ উপস্থাপন ও সংরক্ষণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। চতুর্থতঃ নারীর সকল সংখ্যায় রাজনীতিতে প্রবেশ রাজনীতির মূল ফোকাসে বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন ও বিস্তৃত এঙটাবে। কেননা, নারীর জীবন ও সমস্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে সমস্ত সমস্যা নেহায়েত ব্যক্তিগত বলে চিহ্নিত এবং যথার্থ রাজনীতির আওতা বহির্ভূত বলে বিবেচিত, সেগুলোও রাজনীতির প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচিত হবে।

পঞ্চমতঃ দেশের মানব সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের প্রয়োজনও রাজনীতির অঙ্গণে নারীর সবল উপস্থিতি আবশ্যক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং সাংবিধানিকভাবে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি বা সংরক্ষণই যথেষ্ট নয় বরং নারীকে নিজ প্রয়োজনে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজনীতিতে তার অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

৬.৩ নারী উন্নয়নের প্রাসঙ্গিকতা

"No society can changes unless it's women change"[১৪] – এই পরিবর্তন শুধু তার অধঃস্তন অবস্থানের পরিবর্তন নয়, বরং অধঃস্তনতার নিয়োসনসহ পুরুষের সাথে নারীকেও উন্নয়নের বাহক ও ভোগস্বত্বাধীকারী হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রান্তিকতা থেকে পুরুষের সাথে কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে। সমাজের সম্পদ ও সুযোগ নারী-পুরুষের সমভাবে ভোগের অধিকার স্বীকার ও চিহ্নিত করা প্রয়োজন। সামাজিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতা ও সমানাধিকারের নীতি সর্বজন গৃহীত হওয়া আবশ্যক। নারী যে, অন্যান্য ভূমিকা পালন করেণ সমাজে সন্তানের জন্মদান, লালন ও সামাজিকরণের মধ্য দিয়ে, সেই দাবীতেও নারীর সমতা ও উন্নয়নের যুক্তি অনস্বীকার্য। সর্বোপরি রয়েছে মানুষ হিসেবে তাদেরও 'ব্যক্তি' পদমর্যাদার দাবী। নারীকে 'মানুষ' বা ব্যক্তিত্বের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সকল ধরণের বৈষম্য, অসমতা ও নিগ্রহের অবসান ঘটানো প্রয়োজন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী অধিকার মানবাধিকার প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। নারীর 'ব্যক্তিসত্ত্বা'-র (Personhood) প্রশ্ন, নারীর জীবন ও দেহের নিরাপত্তা এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকারের দাবি নারীকে উন্নয়নের বাহক ও ভোগ সত্ত্বাধিকারী হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যুক্তিকে জোরদার করে।[১৫] অর্থাৎ নারীকে উন্নয়নের নির্ধায়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে যে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে, তা' হলো –

১। সকল ধরণের বৈষম্য, অসমতা ও নিগ্রহের অবসান।

২। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।

৩। সমাজের সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার স্বীকার ও নিশ্চিত করা।

৪। রাজনীতিক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে সমতা ও সমানাধিকার।

৫। নারীর জীবন ও দেহের নিরাপত্তা এবং জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার।

৬। নারীকে মানুষ বা ব্যক্তিত্বের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা।

যদি আমরা নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারী নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহের পর্যালোচনায় ফিরে তাকাই তা হলে দেখতে পাবো যে, যে সব পদক্ষেপ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার গ্রহণ করেছে, তা সমগ্র নারী জাতির সত্যিকার উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এর প্রমাণ আমরা গবেষণায় উল্লেখিত পরিসংখ্যানসমূহ থেকে পেতে পারি। এছাড়া, দ্বিতীয় অধ্যায়ে নারী উন্নয়নে জাতীয় কার্যক্রমসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নারীর জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে, যেমন –

১। নারীর সাংবিধানিক অধিকারসমূহ।

২। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন।

Dhaka University Institutional Repository

৩। নারীর মানবাধিকার।

৪। নারীর জন্য পূর্ণবাসন প্রকল্প।

৫। নারী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ।

৬। নারীর জন্য আইন, আইনী সহায়তা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ।

৭। নারীর যাতায়াত, বাসস্থান ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম।

৮। আয় ও কর্মসংস্থানের জন্য কোটা সংরক্ষণ ও ব্যাংক ঋণ প্রদান।

৯। নারীর চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা।

১০। নারীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কার্যক্রমসমূহ নারীর অধঃস্তন অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না। সাংবিধানিক অধিকারসমূহ এবং পরিকল্পনায় গৃহীত নীতিমালাসমূহ কথা বলবে আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং নীতিমালার বাস্তবায়ন দ্বারা। উপরন্তু, নীতিমালাসমূহকে হতে হবে সমাজ ঘনিষ্ঠ ও নারী সমস্যা সংশ্লিষ্ট। সীমিত পরিসরে যেসব নীতিমালা প্রণীত হচ্ছে তার বাস্তবায়ন অপারগতায় নারী উন্নয়ন আশানুরূপ নয়। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, "The International Women's Year has come and gone into history. A number of plans and programmes devised to liberate the women and everyone hoped that the future was all women. But alas! things did not move at all and we are standing today where we are 10 years ago on a slipping."[১৭]

বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র নারীর অনুকূলে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে, বিদ্যমান আইনের সংস্কার করেছে। এখানে মতাদর্শিক পরিবর্তন যতনা কাজ করেছে তার তুলনায় অর্থনৈতিক কারণ বেশী কাজ করেছে। যেহেতু, মতাদর্শিক পরিবর্তনের প্রভাব গভীর ছিল না, তাইসমাজে বিদ্যমান কাঠামো এবং মূল্যবোধকে অক্ষুন্ন রেখেই নারীরা কর্মক্ষেত্রে যোগদান করে। এর ফলে নারীদের অনুকূলে যে ধরণের অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা একান্তবাবে প্রয়োজন সেসব সুবিধা সমাজে তৈরী হয়নি। তবে, মেয়েদের বাইরে কাজ করার ফলে মূল্যবোধের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সহনশীলতা বেড়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী ছাড়া দেওয়া হচ্ছে, কড়াকড়ি শীতিল হচ্ছে। তবে ছাড় ততটুকুই দেয়া হচ্ছে যে পর্যন্ত ছাড় দিলে নারীরা কর্মক্ষেত্রে মোটামুটি সংগ্রাম করে কাজ করতে পারবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা নারী মুক্তির মতাদর্শের পক্ষ হয়ে মূল্যবোধগুলো পরিবর্তিত হচ্ছে না। ফলে নারীরা সেই গন্ডির মধ্যেই থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

'এ সংকটের ভিত্তি নিহিত অনেক গভীরে যেকানে রাষ্ট্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে এবং এখানে বহুবিধ, ভিন্ন ও বিপরীত ধর্মী স্বার্থ বিদ্যমান। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এই ধরণের বিভিন্নতা ফুটি ওঠে নারী সম্পর্কিত বিয়ে বিভিন্ন বিরোধপূর্ণ নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে।'[১৮] রাষ্ট্রের মতাদর্শ এখানে সমাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখে, রাষ্ট্র নারীকে অধঃস্তন হিসেবে দেখেছে। নারীকে ব্যবহার করেছে তার ক্ষমতা সংহত করার উপায় হিসেবে, পূণরুঃপাদনমূলক যন্ত্র হিসেবে, সস্তা শ্রমশক্তি হিসেবে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র সাহায্যদাতা বিভিন্ন দেশ বা সংস্থান মতদর্শ অনুসারে নারীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা নারীর অংশগ্রহণের পরিসরকে বিস্তৃত করে। অন্যদিকে নারীর জন্য বলবৎ রেখেছেপারিবারিক আউন। যেকানে নারীর অধিকার, স্বাধীনতা খন্ডিত, সীমিত। ব্যক্তিক আইন রচিত ধর্মীয় গ্রন্থের ভিত্তিতে। সমাজে ধর্মের রয়েছে এক সুনির্দিষ্ট ভূমিকা। আর তা'হচ্ছে নারীর অধঃস্তন অবস্থাকে টিকিয়ে রাখা ও তার পুণরুৎপাদন করা।"[২৩] ব্যক্তিক আইনের আওতায় রয়েছে মোটামুটিভাবে বিয়ে, বিবাহবিচ্ছেদ, তালাক, বহুবিবাহ, সন্তানের অভিভাবকত্ব ইত্যাদি যা নারীর সামগ্রিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইনের সংস্কার সাধন হলেও নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে এখনো তা' অসম রয়ে গেছে। এচাড়াও নারী উন্নয়নে সংকট হিসেবে রাজনৈতিক দলসমূহকে চিহ্নিত করা যেতে পারে। "প্রতিটি দলই কিছু বিশ্বাস, আদর্শ ও দর্শন দ্বারা প্রবাবিত।" রাজনৈতিক দলের দর্শন বা আদর্শই নির্ধারণ করে দেয় তাদের উন্নয়ন সংক্রান্ত ধারণা। প্রতিটি রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রে ক্ষমতা দখল করার পর সচেতন বা অসচেতনভাবে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র ও জনগণকে নিজ নিজ উন্নয়ণ দর্শন দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও পরিচালিত করার প্রয়াস পায়। এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল একটি সরকারী উন্নয়ন স্ট্রাটেজিকে জাতির সামনে উপস্থিত করে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিস্ট নীতিমালা, কর্মসূচী ও পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করে।"[২৪] এপ্রেক্ষিতে উল্ল্যেখ করা যেতে পারে যে, '১৯৯১ সানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ ও পাঁচ দলের নির্বাচনী ইসতেহার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নারীর সমতা ও সমানাধিকারের দাবী দাওয়া কোথাও উপস্থাপিত হয়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তাদের নির্বাচনী ইসুতহারে নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড ও অধিকার সংক্রান্ত ৩টি দাবী বা ঘোষণা তাদের অর্থনৈতিক ও মানবাধিকার শীর্ষক কর্মসূচীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে। পাঁচ দলের নারী অধিকার ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী সীমাবদ্ধ থাকে 'নারী অধিকার সংক্রান্ত' শিরোনামে কিছু দাবী-দাওয়ার মধ্যে। আওয়ামী লীগের ইসতেহারে 'নারী সমাজ ও জাতীয় উন্নয়ন' শিরোনামে ৩টি দাবী বা পজিশন পেশ করা হয়েছে এবং 'আইন-শৃংখলা ও সামাজিক নিরাপত্তা'-র অধীনে নারী নির্যাতনের উল্ল্যেখ করা হয়েছে। কোন ইসতেহারেই নারীর অধিকার, অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে দলীয় নীতি ও আদর্শ সামগ্রিকভাবে ও ক্ষেত্র বিশেষে বিধৃত হয়নি।'"[২৫] সুতাং দেশের প্রধান বিরোধী দলসমূহের নির্বাচনী ইসতেহারে যেখানে নারী উন্নয়নের এই সীমিত কর্মসূচী প্রতিফলিত হচ্ছে সেখানে সরকার ক্ষমতায় যাবার পরে নারী উন্নয়নের জন্য সামগ্রিকভাবে নয় বরং সীমিত আকারেই উন্নয়ন নীতিমালা প্রনয়ন করবে এতে সন্দেহের কিছু নেই।

'বাংলাদেশে সাধারণতঃ নারী সংগঠনগুলি নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে কর্মসূচী পালন করে থাকে। নারী ও সমাজের সচেতনতা সৃষ্টি, নারীকে স্বনির্ভর ও স্বাবলম্বী করে তোলা, বিরাজমান জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ - সার্বিকভাবে বলা যায় আদর্শগত ও কর্মপদ্ধতিগত ভিন্নতা স্বত্ত্বেও এগুলোই নারী সংগঠনের মূল লক্ষ্য।'"[২৬]

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু রাজনীতির সাথে নারী সংগঠনসমূহের যোগাযোগহীনতা তাদের দাবী ও আন্দোলনকে ম্লান করে দেয়। এ প্রসঙ্গে রাশেদ খান মেনন উল্লেখ করেন যে, 'স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজ তাদের ১৭ দফা দাবীকে সংবিধিবদ্ধ করেছে কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের বিজয়ের পর অন্যান্য আন্দোলনের মতো নারী আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেছে। ফলে ঐক্যবদ্ধ নারী সমাজের ১৭ দফা দাবীর ভিত্তিতে সংবিধান ও সংসদের আইনে যা করা প্রয়োজন ছিল তার বিশেষ কিছুই হয়নি। ক্ষেত্র বিশেষে উল্টোটাই হয়েছে।... ... শ্রেণী আন্দোলনের সাথে নারী আন্দোলনের সংযোগ ভিন্ন রাজনীতিতে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না।'[২৩]

উন্নয়ন দৃশ্যপটে বেসরকারী সংস্থাসমূহের আগমন ঘটে বিকল্প উন্নয়ন বিতর্কের একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে। এটি ধারণা করা হয়েছিল যে, দারিদ্র বিমোচনের পক্ষে তারা ভালো ভূমিকা রাখতে পারবে। কারণ তারা তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য যথার্থভাবে সক্ষম ছিল।[২৪] ফলে তাদের কর্মকান্ডের প্রয়োজনে নারী প্রশ্নকে তাদের কাজের অন্যতম বিষয় হিসেবে নিয়েছেন। কিন্তু তাদের কর্মসূচীতে দারিদ্র বিমোচনের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নারী থাকছে, কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক অস্তিত্ব হিসেবে নয়।

নারী উন্নয়নের সংকট আলোচনায় সামাহিকভাবে নারীর 'অবস্থা' ও 'অবস্থান'-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। 'অবস্থা' হলো বস্তুগত, যেমন - খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, আয়-ইপার্জন ক্ষমতা, জীবন যাত্রার মান ইত্যাদি। অবস্থার উন্নয়ন মানে জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন। তাই নারীর অবস্থা বলতে বোঝায় নারীর বস্তুগত অবস্থা, যেমন - নারীর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আয় ও উপার্জন। সুতরাং নারীর এইসব অবস্থার উন্নয়ন হলো তার জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন।

অন্যদিকে 'অবস্থান' হলো সরাসরি ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত। কারো অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেই তার অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। নারীর অবস্থান বলতেবোঝায় নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমতা, অধিকার ইত্যাদি অর্জন এবং এই অবস্থানের উন্নয়ন নির্ভর করে,

১। বস্তুগত সম্পদ, যেমন - ছানিক, মানব সম্পদ, আর্থিক সম্পদ।

২। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ, যেমন - জ্ঞান, তথ্য, ধারণা।

৩। আদর্শিক সম্পদ, যেমন - উপলব্ধি।[২৫] প্রভৃতি সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ ও অধিকারের উপর। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীর এই সম্পদের উপর কোন নিয়ন্ত্রণ বা অধিকার নেই। ফলে প্রকল্প ভিত্তিক কর্মসূচী দ্বারা নারীর জীবন যাত্রা মানের কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হওে প্রকৃতপক্ষে যে সক্ষমতা যার দ্বারা উন্নয়ন সম্ভব, তার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না।

এভাবে দেখা যায় যে, নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় আইন, বেসরকারী সংস্থা, নারী সংগঠন এবং নারীর অবস্থা ও অবস্থানগত ক্ষমতাহীনতা,

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রকৃত উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করছে। এবং এসকল কিছুর পিছনে সামাজিক, ধর্মীয় অনুশাসন ও মতাদর্শ নারী উন্নয়নের বিপরীতে কাজ করছে।

সংবিধানে, পরিকল্পনায়, রাজনৈতিক দলে, সভা-সমিতি-সেমিনারে উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের কথা ব্যাপকভাবে শোনা যায়। কিন্তু তথ্যগত কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক এ বিষয়টি সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায় না যে, কি কি বিষয় নারী উন্নয়নের অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা, পরিকল্পনাসমূহের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি পরিকল্পনাই নারী উন্নয়নে সমান অংশীদারিত্বের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কিন্তু কর্মসূচী সমূহে সমান অংশীদারিত্বের পরিবর্তে নারী দুঃস্থ ও অসহায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে[২৩] এবং অর্থ বরাদ্দ হচ্ছে বয়স্ক ভাতা, অবহেলিতদের (নারী ও শিশু) সাহায্য, সহযোগিতায়।

উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ বলতে দু'টি বিষয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে; **প্রথমত:** উন্নয়নে নারী প্রান্তিক নয়, বরং কেন্দ্র। তারা অর্ধেক মানব সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে কিছু সংখ্যক নারী কর্মসূচী যোগ করলেই চলবে না, বরং উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরে তাদের ভূমিকা ও সুযোগ প্রাপ্তির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। **দ্বিতীয়ত:** উন্নয়নে, ভূমিকাপালনকারী এবং সুবিধাভোগকারী গোষ্ঠীরূপে নারীকে গণনা করতে হবে যা উন্নয়ন পরিকল্পনা উপেক্ষা করে থাকে।[২৪]

এছাড়া 'সমঅংশীদারিত্ব'-এর ধারণাটির বিতর্ক রয়েছে এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে। যেমন - 'সমঅংশীদারিত্ব' বিষয়টি 'সমান ভূমিকা' (Similar Role) এবং 'তুলনামূলক ভূমিকা' (Comparable Role) কে ব্যাখ্যা করতে পারবে কিনা। এ সম্পর্কে রওনক জাহান তার Women in Development গ্রন্থে ঢাকায় আঞ্চলিক সেমিনারে ধারণাটি উল্লেখ করেন, যেমন - "Equal participation to refer to the inherent equality between women and men – that they are capable of performing comperable rules." নারীর উন্নয়নে অংশগ্রহণ (Intigration) এবং সমতা (Equality)-র কথা বলা হচ্ছে একারণে যে তারা দেশের অর্ধেক মানব সম্পদ হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে ও সামাজিকভাবে উন্নয়নে অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং তাদের স্বল্প সংখ্যক (Minorities) বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী অথবা অসুবিধাভোগী গোষ্ঠীরূপে অধিকাংশ বঞ্চিত না করে, বরং সামাজিক ও অর্থনীতিক ভূমিকা পালনকারী হিসেবে তাদের প্রতি সচেতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করা উচিত। এবং এর জন্য নারী সমস্যার মোকাবেলায় 'কল্যাণমূলক কর্মসূচী'র পরিবর্তে অর্থনৈতিক কার্যক্রম (Economic Activity), উচ্চতর উৎপাদনে (Higher Productivity), উচ্চতর আয় (Higher Income) কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা দরকার। উন্নয়নে নারীর যথাযথ ভূমিকাকে চিহ্নিত করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় বলা যেতে পারে, Integrating Women in Development means not addirion of special programmes for women but full participation of women

Dhaka University Institutional Repository

in all existing development programmes of the country, and policies and programmes aimed at women should not be welfare oriented. Women should be given equal participation as men both as agents and as beneficiaries of changes.*২৮

৬.৪ উপসংহার ও সুপারিশমালা

'Women in general are not ruled by law but are ruled and controlled by customs and tradition.'*২৯ বিষয়টি নানাভাবেই গবেষণায় এসেছে। সংবিধান নারী-পুরুষের সমতার কথা বললেও তার কার্যকরী প্রতিষ্ঠানসমূহের দক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নারী সমতা ও অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বপ্রদান সত্ত্বেও কর্মসূচীসমূহ নারী ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য কল্যাণমূলক (Welfare Oriented) কর্মসূচীতেই রূপান্তরিত হয়। অর্ধেক মানব সম্পদরে পরিবর্তে নারীরা নির্ণীত উন্নয়নমালা যথা, দুঃস্থ ও অসহায়, অবহেলিত গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হয়। যেখানে নারী এখনো পর্দা, বাল্য বিবাহ, বিবাহ আইন, বৈধব্য প্রভৃতি অসম অধিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং যেখানে শুধুমাত্র কল্যাণকর কর্মসূচী, দুঃস্থ সেবা কর্মসূচী প্রভৃতি দ্বারা উন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় যেখানে মানব সম্পদ হিসেবে উন্নয়ন যথা:- সক্ষমতা, পছন্দের ব্যবহার প্রভৃতির*৩০ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব। মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক বিষয় যেমন:- শিক্ষা, ব্যক্তি অধিকার, স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদিতে নারীর অবস্থান, অধঃস্তনতা লক্ষ্যনীয়। এছাড়াও রয়েছে সম্পদ, জীবিকা প্রভৃতিতে অসম অধিকার। এইসব মানবীয় সমস্যা ও প্রয়োজন নিরোসন ব্যতিরেকে মানুষকে সম্পদে যেমন পরিনত করা যাবে না তেমনি সম্পদ গঠন ছাড়া সক্ষমতার ব্যবহার অসম্ভব এবং উন্নয়ন যা মানুষের সৃষ্টিশীলতার উপর নির্ভরশীল সেই কাঙ্খিত উন্নয়নও সম্ভব নয়। উন্নয়নে পুরুষের ভূমিকার মূল্যায়নের পাশাপাশি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নারীকে প্রথা ও গতানুগতিকতার বেড়াজাল থেকে সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক তার ভূমিকার মূল্যায়ন আবশ্যক এবং অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কর্মসংস্থান ইত্যাদির পরিসংখ্যানগত তথ্য বিরাজমান বৈষম্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। আয়ুসীমা, মাতৃমৃত্যুহার নারীর অসম অবস্থানের সূচক। নারীকে অর্ধেক মানব সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে তার উন্নয়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব বৈষম্যের অবসান ও পরনির্ভরশীলতা নিরোসন ঘটানো, নারীকে সক্ষম ও সক্রিয় হিসেবে বিবেচনা করে তার ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি ও অবদানের স্বীকৃতি এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ। সুতরাং এ প্রেক্ষাপটে নারীর ক্ষমতায়ন অপরিহার্য এবং এর জন্য অর্থনৈতিক, আইনগত ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত বিদ্যমান। সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ হতে হলে এই পরিপ্রেক্ষিত বা মাত্রা ধারণ করতে হবে।

উন্নয়নের ধারাকে প্রবহমান ও কার্যকর রাখতে হলে উন্নয়ন মডেল, প্রক্রিয়ায় সমাজের নারীসহ সব জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি ও অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারীর ক্ষমতায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য কেবল নারীর শক্তি সঞ্চয়নই নয়, বস্তুতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়নের

Dhaka University Institutional Repository

সুষম ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটানোর একটি মাধ্যম। নারীকেও পুরুষের সাথে উন্নয়নের বাহক ও ভোগস্বত্বকারী হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রান্তিকতা থেকে পুরুষের সাথে এবং কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করতে হবে। সমাজের সম্পদ ও সুযোগ নারী-পুরুষের সমভাবে ভোগের অধিকার স্বীকার করা প্রয়োজন।[৩৯] এই লক্ষ্য অর্জনে নারী সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও সরকার-এর ব্যাপক ভূমিকা পালন অপরিহার্য। এটা সম্ভব মন্ত্রী পরিষদ, জাতীয় সংসদ, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সরকারী নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্রসমূহে যথাস্থানে নির্বাচন ও নিয়োগের মাধ্যমে। এছাড়াও টাস্কফোর্স '৯২-এর মতে, দলীয় কর্মসূচীতে স্থান দিয়ে, সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্যায়ে সচেতন অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উন্নয়ন বিষয়ক সরকারী দলিলপত্রে নারীর ভূমিকা ও অবস্থানগত সঠিক ঘোষণা দিয়ে এবং উপযুক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া জোরদার করা সম্ভব। উন্নয়নে সরকার, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তেমনি চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের ভূমিকাও অপরিহার্য। কেননা, বৃহত্তর সমাজের প্রধানতম ও প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিতকরণ করা ও সেই অনুযায়ী সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করা রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের দায়িত্ব। এছাড়াও রয়েছে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করা, যার সহায়তায় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

সুতরাং এ প্রেক্ষিতে নারী উন্নয়নের জন্য সরকার ও সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের যেমন দায়িত্ব তেমনি রাজনৈতিক দল, সংগঠনের ইতিবাচক ভূমিকা থাকা জরুরী। উন্নয়ন পরিকল্পনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়নে এইসব সংগঠনসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত।

এইসব সংগঠনের নিজস্ব কার্যসূচীর এখতিয়ারভূক্ত তবে একটি রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে রাজনৈতিক দলের মুখ্য ভূমিকা প্রয়োজন। কেননা, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রের উন্নয়ন আদর্শ প্রতিফলিত করে। ক্ষমতার স্তরে, রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা, আমলাতন্ত্র, নারী সংগঠনসমূহ উন্নয়নে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর অন্তর্ভূক্তি ভেবে দেখা যেতে পারে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মনোনয়নের কোটা বা ন্যূনতম সংখ্যা (শতকরা ১০-১৫) নির্ধারণ পূর্বক রাজনৈতিক দলের মূলনীতি, কর্মসূচী ও ইশতেহারে নারী অধিকার ও সমতা সংক্রান্ত দাবী দাওয়া সন্নিবেশিত হতে হবে। এবং সম্ভব হলে খাতওয়ারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমস্যা চিহ্নিত করে তা মোকাবেলা বা নিরোসনের দিকনির্দেশনা দেয়া; রাজনৈতিক দলে আভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং এর উপরিস্তর বা হায়ারআর্কিতে যথেষ্ট সংখ্যক নারীর উপস্থিতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোটা বা ন্যূনতম সংখ্যা নিরুপন করতে হবে। এছাড়া দলের অভ্যন্তরে নারীর অবস্থান ও ইস্যু সংহতকরণের উদ্দেশ্যে দলীয় পর্যায়ে মহিলা রাজনীতিকদের কক্কাস বা ছোট ইনফরমাল গ্রুপ গঠনের মাধ্যমে জোরদার ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং যেহেতু নারীর আর্থিক শক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সীমিত সেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে মনোনীত মহিলা প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারকার্যে আর্থিক ও সাংগঠিক সহায়তা দান করবে।

জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে সরাসরি ভোটে নির্বাচনী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে, নির্বাচন কমিশনের নির্বাচনী এলাকা নির্দিষ্টকরণের উদ্দেশ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুপারিশ করাসহ সংসদের আওতাভূক্ত কার্যক্রমে নারী প্রেক্ষিত যথাযথভাবে কার্যকর রয়েছে কিনা তা' মনিটর করা বা নজর রাখার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদে নারী সম্পর্কিত বিষয়ে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি বা পার্লামেন্টারী স্ট্যান্ডিং কমিটি অন উইমেন ইস্যুজ গঠন করা, সংসদের অভ্যন্তরে এবং স্ব স্ব সংসদীয় দলে নারীর স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয় উথাপন, সমর্থনজ্ঞাপন ও সমর্থন আদায়ের জন্য দলীয় রাজনীতি ও স্বার্থের উর্দ্ধে মুহলা সংসদ কর্তৃক সর্বদলীয় সংহতি গ্রুপ গঠন করার উদ্যোগ নেয়া এবং মন্ত্রী পরিষদে মহিলা নিয়োগ বৃদ্ধি করা হোক।

নির্বাচনী রাজনীতিতে নারীর প্রার্থীতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনকে নির্দলীয় রূপে নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং নারী স্বার্থ সংরক্ষণে অঙ্গীকারবদ্ধতার ভিত্তিতে নারী প্রার্থীদরে নির্বাচনী প্রচারকার্যে সর্বতো সাহায্য প্রদানসহ রাজনৈতিক দলের মহিলা শাখা নারী অধিকার ও নারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিস্তৃতির মাধ্যমে নারী জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত ও মোবিলাইজ করতে, সমর্থনের ভিত তৈরী করতে এবং নারীর রাজনৈতিক ভূমিকার প্রতি ইতিবাচক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হবে এবং নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে।

রাজনীতিতে নারীর আগমনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অর্থ ওঅস্ত্রের রাজনীতির উপর কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ, নারীর শিক্ষা ও পেশাগত সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহনের পথ ও প্রবেশের পথ সুগম করা শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত নারীর ব্যক্তিত্ব, অবদান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা, শিক্ষা ও প্রচার মাধ্যম মারফত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়ে নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রনোদিত করতে হবে এবং সমাজে উপযুক্ত মূল্যবোধ গড়ে তুলতে হবে এবং সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগ দান করে নারীকে সমাজে নেতৃত্বমূলক ভূমিকায় অধিষ্টিত করতে হবে। যাতে সমাজে অনুকরণীয় রোল মডেল তৈরী হয় এবং নারীর নেতৃত্বমূলক কর্মক্ষেত্রে (যথা, রাজনীতিতে) প্রবেশের আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় নারী আন্দোলনের করণীয় হতে পারে[৩২] ঃ-

Dhaka University Institutional Repository

- নারীর রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী রাজনৈতিক দলের ঘোষণা ও কর্মসূচীতে অন্তর্ভূক্ত করা।

- রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে মহিলাদের অধিক সংখ্যায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সেই উপযোগী কর্মনীতি ও কর্মধারা নির্ধারণ, তাদের জন্য পার্টি ফান্ড নিশ্চিত করা।

- নির্বাচনে সাধারণ সিটে সংবিধানের বিধান-এ মেয়েদের মনোনয়ন দান বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত করা।

- পারিবারিক ও উত্তরাধিকার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

এছাড়াও নারী ও রাজনীতি শীর্ষক সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশ যা 'নারী ও রাজনীতি' গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা'-র বাস্তবায়নে নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় আনয়নে সক্ষম হবে বলে আশা করা যেতে পারে; যেমন-

- নীতি নির্ধারণী ক্ষেত্রসমূহে নারীকে সংশ্লিষ্ট করার লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে আন্দোলন গড়ে তোলাসহ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে (অর্থাৎ রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে) নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য অপনোদন সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন এবং অভিন্ন সিভিল কোড প্রবর্তন করতে হবে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন আনার জন্য এবং নারীকে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা ও কার্যক্রমের দিকে প্রণোদিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রচার মাধ্যমকে উপযুক্ত কাজে লাগাতে হবে।

- স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষাক্রমে নারীর রাজনৈতিক ও অন্যান্য সকল অধিকার সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভূক্ত নারী রাজনীতিক ও নারী সংগঠনের মধ্যে পারস্পারিক যোগাযোগ ও নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট উদ্যোগ নিতে হবে। এই উদ্দেশ্যে একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় মহিলা ফোরাম গঠন করতে হবে।

- সার্বিক পরিসরে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

- মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা নারীর অধিকার খর্ব করে বিধায় এধরণের ধ্যান-ধারণা এবং নারীর অবস্থান ও অধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মকে অপব্যবহার করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে।

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে মহিলা সদস্যদের মনোনয়ন প্রথা বিলুপ্ত করে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

নারীকে উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে নেবার জন্য জাতিসংঘ, দাতা সংস্থাগুলো জাতিসংঘের (Plat Form of Action) -এর কর্মপন্থায় ১২টি বিষয়কে নারী সমাজের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করেছে তার অপসারণের জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারের করণীয় সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে তা' পরিকল্পনা প্রতিফলিত করা যেতে পারে :-

- নারী-পুরুষ প্রেক্ষাপট থেকে জাতীয় কর্মসূচী ও নীতিগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ;

- সরকারী সম্পদের সুষম বন্টনের জন্য নীতি ও কর্মসূচী প্রনয়ন;

- সরকারী ব্যয় বরাদ্দ, পুণর্গঠন ও লক্ষ্য এমনভাবে নির্ধারণ করা যাতে মেয়েরা উৎপাদনশীল সম্পদের সমান ও সুষম অংশ পায়;

- মেয়েদের পূর্ণ ও সমান অর্থনৈতিক সম্পদের প্রাপ্তির লক্ষ্যে আইন ও প্রশাসনিক প্রথা সংশোধন;

- মেয়েদের ঋণলাভের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচলিত ব্যাংক ও অপ্রচলিত ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা;

পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তির সুপারিশ

উপরোক্ত পি.এফ.এ. (PFA)-কে সামনে রেখে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হওয়া দরকার এবং সেই সাথে পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তির জন্য নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যেতে পারে।

১। 'সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি রাজনৈতিক মাত্রা রয়েছে; রয়েছে বিশ্বাস ও আদর্শ'। এপ্রেক্ষিতে নারী এজেন্ডায় দল-মত নির্বিশেষে সার্বিক দৃষ্টিকোণে গ্রহণযোগ্য কর্মসূচী যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের প্রয়াস নিতে হবে।

২। একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নে আগামী পাঁচ বৎসরে আমরা কোথায় যেতে চাই তার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র আঁকতে হবে। এর পরে এটি অর্জনের জন্য বেসরকারী

Dhaka University Institutional Repository

খাতের জন্য একটি দিক নির্দেশনা (Guidling Principles) এবং সরকারী খাতের জন্য এসব ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে হবে যেখানে সরকারী হস্তক্ষেপ (প্রকল্প, কর্মসূচী, নীতিমালার সংস্কার অথবা নতুন নীতিমালা প্রবর্তন) প্রয়োজন।*[৩৩]

৩। বাংলাদেশের উন্নয়ন যেহেতু প্রকল্পভিত্তিক সেহেতু প্রকল্পসমূহ দাতাগোষ্ঠীর প্রভাব থেকে মুক্ত করে স্থানীয় পর্যায়ে নারীর অগ্রাধিকার বিবেচনায় সর্বোত্তম সুবিধা প্রদানকারী প্রকল্প নির্বাচন করে তা' বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

৪। বাংলাদেশে পরিকল্পনা প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত। পরিকল্পনা প্রনীত হয় বিশেষজ্ঞ, আমলা ও সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা, আলোচনা, পর্যালোচনাও হয় মূলতঃ ঐ পর্যায়ে। কিন্তু এখন এর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের প্রয়োজন। অর্থাৎ নারী উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর অংশগ্রহণ স্বীকৃত হতে হবে যাতে করে যখন কোন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হবে তখন নারীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৫। বাংলাদেশের পরিকল্পনায় নারী উন্নয়ন মডেল দেশী অথবা বিদেশী উপদেষ্টা কর্তৃক নির্মিত হয় বিধায় মডেল প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত। প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এ জন্য নারীর প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে।

৬। নারী উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী (Piecenual Approach) নয়, সমন্বিত (Integrated) ও সামগ্রিক (Holistic) দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে নারী উন্নয়নে কোন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করলে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাবে সেদিকে গুরুত্বারোপ না করে বরং খাত ভিত্তিক চাহিদা এবং কৌশলের ভিত্তিতে প্রকল্পে প্রণীত হওয়া উচিত।

৭। 'নারী উন্নয়নকে একটি দীর্ঘ মেয়াদী প্রক্রিয়া হিসেবে ধরে মাইক্রো লেভেলে রেখে পরিকল্পনা ম্যাক্রো লেভেলে ধার্য করতে হবে। এলক্ষ্যে ২০ বৎসর ব্যাপী নারী উন্নয়নের জন্য 'Perspective Plan' তৈরী করতে হবে। জাথীয় মহিলা কমিশন গঠন অথবা জাতীয় মহিলা সংস্থার দ্বারা উন্নয়নের বিভিন্ন সেক্টারে নারী উন্নয়ন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে 'Perspective Plan' পর্যালোচনা করতে হবে।'*[৩৪]

৮। পরিকল্পনায় নারী উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ খুবই কম। অর্থ বরাদ্দ যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি না পেলে নারীর সমস্যা নিরোসন সম্ভবময়। কেননা, দুঃস্থ সাহায্য সেবা দ্বারা নারী উন্নয়ন অসম্ভব। বেশী পরিমানে কর্মসূচীর জন্য বেশী পরিমানে অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

৯। উন্নয়ন পরিকল্পনায় উন্নয়নে প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকার সুষ্ঠো মূল্যায়ন প্রয়োজন। তা না হলে নারীর সমস্যা প্রান্তিক বা প্রচ্ছন্ন থেকে যাবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। নারীর সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও যথাযথ প্রকল্প গ্রহণ অপরিহার্য।

১০। বৈষম্যমূলক তথ্য বিশ্লেষণে বাংলাদেশ ব্যুরোর নিয়ন্ত্রণে একটি নারী সেল (Women's Cell) গঠন করতে হবে। তা' না হলে নারী নীতিমালা মূল্যায়ন কঠিন হবে।

১১। Social Accounting Matrix (SAM) এবং Development Matrix (DM) বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে লিঙ্গকে নির্ধায়ক হিসেবে অন্তর্ভূক্ত বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১২। বৃহত্তর দরিদ্র গোষ্ঠী ও চরম অবহেলিত গোষ্ঠীরূপে উন্নয়ন কৌশল ও কর্মসূচীতে গ্রামীন নারীর অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দারিদ্র নিরোসন করা প্রয়োজন।

১৩। শিক্ষিত নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নিয়োগ দানের জন্য নিয়োগ আইনে সম্প্রসারণ (Existing Recruitment Rules) করতে হবে। জাতীয় পরিকল্পনা কাঠামোয় নারীকে সংযুক্ত করা উচিত।

১৪। মেয়ে শিক্ষার্থী/যুবতী মেয়েদের জন্য আংশিক সময় চাকুরীতে নিয়োগের জন্য চাকুরী সংক্রান্ত অধিক সুযোগ থাকা অবশ্যক।

১৫। কৃষি ও শিল্পের মতো প্রযুক্তিতে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে দক্ষতা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৬। ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়নে নারীর জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত যাতে করে নারী উদ্যোক্তাগণ মধ্যস্বত্বভোগী দ্বারা নিস্পেষিত (Exploited) না হয়।

১৭। ইউনিয়নে নারীর অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা এবং সর্বনিম্ন বেতন, কর্মসময় যা কারখানা আইনে (Factory Laws) রয়েছে তার বাস্তবায়ন করা উচিত।

১৮। শিক্ষাখাতে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত:

(ক) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয়ক্ষেত্রে মৌলিক শিক্ষাকে নারীর জন্য বাধ্যতামূলক করা;

(খ) স্কুল পর্যায়ে সিলেবাসসমূহে বিভিন্নক্ষেত্রে বিখ্যাত নারীদের জীবনী এবং লিঙ্গ সমতা সম্পর্কিত বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত করা।

১৯। নারীর অশিক্ষা দূরীকরণে কার্যকর উৎসাহজনক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২০। স্বাস্থ্যখাতে Mother Care Health (MCH) কর্মসূচীর সাথে নারীর জন্য সাধারণ স্বাস্থ্য সেবাকে গুরুত্ব দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

২১। TBA এবং নারী স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত কর্মীদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিত যাতে করে উপযুক্ত সাহায্য সেবাসহ সকল ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান করতে পারে।

২২। গ্রামীন এলাকায় মাতৃমৃত্যুহার ও অসুস্থ্যতা দূর করার জন্য গ্রাম কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ঔষধ, যন্ত্রপাতি এবং প্রশিক্ষিত সেবিকা ব্যবস্থা থাকা উচিত। সে সঙ্গে উপজেলাসমূহ (Analgesia, Anesthesia) সহ রক্ত সরবরাহে সুবিধা প্রদান করা উচিত।

২৩। প্রতি জেলায় আনুসঙ্গিক সুবিধা প্রদানসহ প্রসূতি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করা উচিত।

২৪। অল্প বয়সী বালিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টির স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা তাকা উচিত।

২৫। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে নারীর কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি প্রয়োজন সংখ্যক দিবাযত্ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

২৬। বিদেশী সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে উন্নয়নে নারী কর্মসূচীতে আত্মনির্ভরশীলতা বিষয়ে দাতা গোষ্ঠীকে উৎসাহিত করা দরকার।[৩৫]

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, জাতীয় পরিকল্পনা কেবলমাত্র একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় নয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি পরিকল্পনা থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। এই অর্থে পরিকল্পনা একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন দর্শনের দলিল। উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সমাজের সকল সম্পদের সমাযোজন আবশ্যক। সকল সম্পদের মধ্যে মানব সম্পদ অন্যতম প্রধান বিষয়। কেননা পরিকল্পনা প্রনীত হয় মানুষকে কেন্দ্র করেই। ১২কোটি অধ্যুষিত এই দেশে মানুষকে সম্পদ হিসেবে বিবেচনায় এনে উন্নয়ন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন, যে উন্নয়ন হবে সবার জন্য কল্যাণমুখী এবং যা অর্জন করতে হবে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে এবং যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সুপ্ত গুণাবলী ও প্রতিভা বিকাশের সর্বাধিক সুযোগ পাবে। প্রতিটি কর্মক্ষম ও কর্মেচ্ছুক ব্যক্তি তার ক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী উপার্জন করার সুযোগ পাবে।

পরিকল্পনা যদি মানুষকে কেন্দ্র করে প্রণয়ন করা যায় যা মানুষকে জ্ঞান, আচরণ, মূল্যবোধ সম্পন্ন করে তুলবে, এ লক্ষ্যে উপরোক্ত সুপারিশসমূহ পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা আশু প্রয়োজন এবং সেই সাথে তার বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। কেননা, পরিকল্পনা প্রণয়নই শেষ কথা নয়। এ প্রেক্ষাপটে মানব সম্পদের অর্ধেক জনগোষ্ঠী যাদের কর্মক্ষেত্র ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যাদের দৈনন্দিনের পরিশ্রমের নেই কোন স্বীকৃতি, যারা সৃজনশীলতা বিকাশের সুযোগ থেকে এবং জ্ঞানের অভাবে ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত – সেই অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী সমাজকে মানব সমাজ উন্নয়নের ধারার সাথে

Dhaka University Institutional Repository

সম্পৃক্ত করতে হবে যার ফলশ্রুতি হবে একটি দীর্ঘ, সুস্থ্য, সৃষ্টিশীল সমাজ গঠন করা। নারীকে সমস্যা হিসেবে নয়, টার্গেট গ্রুপ হিসেবে নয় বরং সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া উচিত এবং সেইসাথে কাঙ্খিত মূল্যবোধ পরিবর্তনের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার। যেখানে নারী তার নিজ জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াও সামাজিক, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ করতঃ সৃষ্টিশীল কাজে তার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে পারে।

তথ্যসূত্র ঃ

*১ অমর্ত্য সেন, 'জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ:- ১০৬.

*২ প্রাগুক্ত, পৃ:- ১২১.

*৩ সৌরীন ভট্টাচার্য, "উন্নয়ন ঃ অন্য বিচার", প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ:-১১০.

*৪ প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১.

*৫ তাহমিনা আখতার; প্রাগুক্ত, পৃ:- ৫১.

*৬ তাহমিনা আখতার; প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২.

*৭ Govt. of Bangladesh,"Fourth Five Year Plan", Planning Commission, P:- XIII-6.

*৮ বেইজিং ফলো আপ ১৯৯৯ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

*১০ মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য, 'নারী : রাষ্ট্র, উন্নয়ন ও মতাদর্শ', সনিকে, ১৯৯০, পৃ: ৭.

*১০ প্রাগুক্ত, পৃ: ৯.

*১১ নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, 'নারী ও রাজনীতি', প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭.

*১২ শাহীন রহমান; 'জেন্ডার প্রসঙ্গ, উন্নয়ন পদক্ষেপ', ১৯৯৮, পৃ: ৫২.

*১৩ নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০.

*১৪ নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯.

*১৫ SMT. Shobhana Penade, "The Real Issues", Women and Development, Some Critical Issues.

*১৬ ড: নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, ১৯৯২.

*১৭ RANADE, SMT. Shobhana, 'The Real Issue', Women's development, Some critial Issues. MAPWAH Publication. P-24.

*১৮ মেঘনা গুহঠাকুরতা, 'বাংলাদেশে নারী নির্যাতন : রাষ্ট্রের ভূমিকা', বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ও জারিনা রহমান খান (সম্পাদিত) বাংলাদেশের নারী নির্যাতন, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৯৩, পৃ: ৭-৮.

*১৯ রেহনুমা আহমেদ, 'ধর্মীয় মতাদর্শ ও বাংলাদেশে নারী আন্দোলন', বাংলাদেশে নারী নির্যাতন, সনিকে, পৃ: ৯৪.

*২০ নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, 'নারীর ক্ষমতায়ন, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা', টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ: ৩২.

*২১ নাজমা চৌধুরী - 'রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ : প্রান্তিকতা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা', নাজমা চৌধুরী এবং অন্যান্য (সম্পাদিত) 'নারী ওরাজনীতি', উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৪, পৃ: ৩০.

*২২ নাজমা চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১.

*২৩ রাশেদ খান মেনন, 'রাজনৈতিক দল ও নারী এজেন্ডা', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০-৪১.

*২৪ মেঘনা গুহঠাকুরতা, 'নারী এজেন্ডা ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭.

*২৫ রহমান শাহীন, 'জেন্ডার প্রসঙ্গ' উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৮, পৃ: ১০৬.

*২৬ জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রীর দেওয়া বাজেট ২০০১ ২০০২ বক্তৃতায় নারী ও শিশু সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যেতে পারে। দৈনিক প্রথম আলোম, ৮ই জুন ২০০১.

*২৭ Rounaq Jahan and HANNA Paranek, "Women and Development : Perspectives SOUTH AND SOTHEAST ASIA." P – 4.

*২৮ Opt. Sit. P – 18.

Dhaka University Institutional Repository

*২৯ Shobhana Ranade. "The Real Issue". Women and Development. Some Critical Issues. MAPWAH Pub. P-24.

*৩০ মানব সম্পদ উন্নয়নের

*৩১ ড: নাজমা চৌধুরী ও অন্যান্য, 'টাস্কফোর্স প্রতিবেদন-১৯৯২', পৃ: ১২-১৩.

*৩২ রাশেদ খান মেনন, 'রাজনৈতিক দল ও নারী এজেন্ডা', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪০-৪১.

*৩৩ আলম, এম, খোরশেদ, 'বাংলাদেশে উন্নয়ন পরিকল্পনা - প্রাসঙ্গিকতা, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি', বুক বিউটি, ১৯৯৭, পৃ: ৪৩.

*৩৪ হামিদা বেগম ও অন্যান্য সম্পাদিত, Women and Nitional Planning in Bangladesh, Women for Wome, 1990.

*৩৫ নিলুফার পারভিন, 'দারিদ্রদূরীকরণে নারীর ভূমিকা ঃ একটি পর্যালোচনা', 'ক্ষমতায়ন', উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮, পৃ:৪৫

Dhaka University Institutional Repository

References :

(Publication - English)

1. *Development and Democracy – must there be winners & losers,* BUP, 1995.
2. Hamida Begum et all (ed) *Women and National Planning in Bangladesh*, Women for women, 1990.
3. Chowdhury Dilara, *Women publication in the Formal Structure and Decision making Bodies in Bangladesh*, Raushan Jahan and etat, Empowerment of Women, Mourobi to Beijing (1985-1995), Women for Women, 1995.
4. Hamid Shamim, *Why Women Count Essays on Women in Development in Bangladesh*, UPL, 1996.
5. Islam Nurul, *Development Planning in Bangladesh, A study in Political Economy* UPL, 1976.
6. Jahan Rounak and Hanna Papanek, *Women and Development; Perspectives from South and Southeast Asia*, Bangladesh Institute of Law & International Affairs, Dacca, 1979.
7. Jayagopal R. *Human Resource Development, Concept Analysis and Strategies*, Sterling Publications, New Delhi, 1990.
8. Kaur Parminder, *Human Resource Development For Rural Development*, Anmol Publication, New Delhi, 1996.
9. Noman Ayesa, *Status of Women and Fertility in Bangladesh*, University Press Limited, 1984.
10. Rao T. V. *Human Resource Development – Experiences, Interventions, Strategies*, SAGE Publications, New Delhi, 1995.
11. Rahman Sobhan, *The crisis of External Dependence : The Political Economy of Foreign Aid to Bangladesh*, UPL, 1982.
12. Streeten Paul, *Ten Years of Human Development,* Human Development Report, Oxford, 1999.
13. Reneda, SMT, Shobhana, *The Real Issues, Women and Development, Some Critical Issues,* MAPWAH, 1989.

Dhaka University Institutional Repository

(প্রকাশনা - বাংলা)

১. আহম্মেদ কাজী খালেকুজ্জামান, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*, শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৮.

২. আলম এম. খোরশেদ, *বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা, প্রাসঙ্গিকতা, প্রতিষ্ঠান ও পদ্ধতি*, বুক বিউটি, ১৯৯৭.

৩. আক্তার তাহমিনা, *মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫.

৪. আকাশ এম. এম. *শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন : পারস্পারিক সম্পর্ক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সংকট, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা*, ১৯৯৭, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, UPL, ১৯৯৭.

৫. আহমেদ এমাজউদ্দীন, *তুলনামূলক রাজনীতি, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ, বাংলাদেশ বুক কর্পোরেশন*, ১৯৭৮.

৬. ইসলাম মোঃ সিরাজুল, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ ও প্রতিকার*, সেবা প্রকাশনী, ১৯৯১.

৭. ঘোষ নির্মল কান্তি, *আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা*, ছায়া, কলকাতা।

৮. জাহান সেলিম, *অর্থনীতির কড়চা*, সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৯৬.

৯. খান বোরহানউদ্দীন জাহাঙ্গীর এবং অন্যান্য, *বাংলাদেশের নারী নির্যাতন*, সনিকে, ১৯৯৩.

১০. চৌধুরী নাজমা ও অন্যান্য, *নারী ও রাজনীতি*, ইউমেন ফর ইউমেন, ১৯৯৪.

১১. চৌধুরী নাজমা ও অন্যান্য, *উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা*, টাস্কফোর্স প্রতিবেদন, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯২.

১২. গুহ ঠাকুরতা মেঘনা ও বেগম সুরাইয়া, *নারী, রাষ্ট্র উন্নয়ন ও মতাদর্শ*, সনিকে, ১৯৯০.

১৩. গুহ ঠাকুরতা মেঘনা ও অন্যান্য, *নারী : প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, সনিকে, ১৯৯০.

১৪. গুহ ঠাকুরতা মেঘনা, *বাংলাদেশের নারী নির্যাতন : রাষ্ট্রের ভূমিকা*, খান বোরহান উদ্দীন জাহাঙ্গীর এবং খান জারিনা রহমান (সম্পাদিত) *বাংলাদেশে নারী নির্যাতন*, সনিকে, ১৯৯৩.

১৫. আলতাফ পারভেজ, *বাংলাদেশের নারী : একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ*, জনঅধিকার, ২০০০.

১৬. এর্ধন প্রনব, *রাষ্ট্র, সমাজ ব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৫.

১৭. ভট্টাচার্য সৌরীণ, *উন্নয়ন ঃ অন্য বিচার*, প্রতিক্ষণ পাবলিশার্স, ১৯৯৫.

১৮. ভূঁইয়া ওদুদ, *তুলনামূলক রাজনীতি ও সমকালীন পদ্ধতি*, রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৮.

১৯. মজিদ এম. এ., *প্রকল্প ব্যবস্থাপনা*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫.

২০. মোহম্মদ আনু, *বাজেট ঃ পরিকল্পনা, দারিদ্র বিমোচন* হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৮.

২১. রায় অজয়, *বাংলাদেশের অর্থনীতি ঃ অতীত ও বর্তমান*।

২২. রহমান শাহীন, *জেন্ডার প্রসঙ্গ*, উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৮.

২৩. রহমান মোঃ আনিসুর, *উন্নয়ন জিজ্ঞাসা*, ব্রাক প্রকাশনা, ১৯৯২.

২৪. শওকতুজ্জামান সৈয়দ, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা*, শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৭.

Dhaka University Institutional Repository

২৫. সেন অমর্ত্য, *জীবন যাত্রা ও অর্থনীতি*, অনন্ত পাবলিশার্স, ১৯৯০.

২৬. হাসান মোস্তফা ও হোসেন মো: আবুল, *পরিকল্পনা ও প্রকল্প প্রণয়ন*, গতিধারা, ১৯৯৯.

২৭. আখতার তাহমিনা, "মহিলা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা - বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" বাংলা একাডেমী ১৯৯৫।

২৮. পারভেজ আলতাফ, "বাংলাদেশের নারী - একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ" জন অধিকার, ২০০০।

বাংলাদেশ সরকারের দলিল এবং প্রকাশনা

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)

২. দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)

৩. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)

৪. তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০)

৫. চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)

৬. পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)
পরিকল্পনা কমিশন,
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়,
গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,

৭. বেইজিং ফলোআপ, ১৯৯৯, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৮. বেইজিং ফলোআপ, ১৯৯৯, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৯. Chowdhury Dr. Nazma, "Women Politics in Bangladesh in situation of Women in Bangladesh", Ministry of Social Welfare and Women's Affairs, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 1985.

১০. Chowdhury Dr. Nazma , "Women in Development : A guide book of Planners" খসড়া রিপোর্ট, ১৯৭৬.

১১. লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৮৯, বিবিএস।

১২. টাস্কফোর্স রিপোর্ট, ১৯৯১, পরিকল্পনা বিভাগ, কমিশন, গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Dhaka University Institutional Repository

United Nations Reports/Publications :

* Bangladesh Human Development Report, UNDP, Bangladesh, 1996.
* Bangladesh Human Development Report, UNDP, Bangladesh, 1998.
* Human Development Report, UNDP, 1991.
* Human Development Report, UNDP, 1992.
* Human Development Report, UNDP, 1993, 1994, 1995 & 1999.
* The United Nation's Committee for Development Planning, UNCDP.
* World Conference on Education for all, 1990.
* জাকার্তা ঘোষণা ও জাকার্তা কর্মপরিকল্পনা, বেইজিং এনজিও ফোরাম, '৯৫ সংক্রান্ত জাতীয় প্রস্তুতি কমিটি, বাংলাদেশ - এর পক্ষে মিডিয়া এ্যাডভোকেসী উপকমিটির কনভেনর হোসেন তাসমিমা কর্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত, ডিসেম্বর, ১৯৯৪.

জার্নাল, সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা

জার্নাল ঃ

* আকাশ এম. এম. 'বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন' উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৫ সংখ্যা।
* আক্তার সাবরিনা, 'উন্নয়নের নতুন ধারা ঃ অংশগ্রহীতা তত্ত্ব' রাষ্ট্রবিজ্ঞান দর্পন, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৯৪.
* আকাশ এম. এম. 'বাংলাদেশ ঃ উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা' সমাজ নিরীক্ষণ/৪১, সনিকে, ১৯৯১.
* আখতার রাশেদ, *উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিও, গ্রামীন নারীর আর্থ-সামাজিক, পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঃ একটি প্-তাত্ত্বিক আলোচনা,* ক্ষমতায়ন, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯০.
* আসাদুজ্জামান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা,* উন্নয়ন সমীক্ষা/৬, ১৩৯৫.
* ইসলাম নজরুল, 'বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ঃ একটি পর্যালোচনা' সমাজ নিরীক্ষণ/৯১, সনিকে, ১৯৮৬.
* ইসলাম মো: নজরুল, *বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ একটি বিশ্লেষণ,* সমাজ নিরীক্ষণ/৬০, সনিকে, ১৯৯৬.
* উল্লাহ ড: আ: হো: শাহাদাৎ, *বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা,* উন্নয়ন বিতর্ক/২, ১৯৯৮.

Dhaka University Institutional Repository

* চৌধুরী সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের সমাজ ঃ আশির দশকের নিরীখে*, সমাজ নিরীক্ষণ/১৫, মনিকে, ১৯৯৫.
* চৌধুরী এজাজুল হক, *অনুন্নয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতি*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১৫.
* চৌধুরী এজাজুল হক, *মানব উন্নয়ন*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১২.
* চন্দন আজাদুর রহমান, *পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারী*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১৪.
* জাহান সেলিম, *উন্নয়ন ও পরিকল্পনা ঃ প্রসঙ্গ কথা*, উন্নয়ন বিতর্ক/১, ১৯৮৭.
* বোরহানউদ্দীন জাহাঙ্গীর খান, *গ্রামীন রাজনীতি ও নারী সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ/১০, সনিকে, ১৯৮৬.
* নবী বেলা, *সিডও পরিস্থিতি ঃ বাংলাদেশ*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১১, ১৯৯৮.
* বোস শিপ্রা, *জেন্ডার প্রাতিষ্ঠানিকরণ ঃ ধারণা ও কৌশল*, উন্নয়ন পদক্ষেপ.১৬, ১৯৯৯.
* তালুকদার মনির, *নারীর মুক্তি, নারীবাদ, প্রগতিবাদ*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১১, ১৯৯৮.
* মনির তালুকদার, *মানব সম্পদ উন্নয়ন*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১৪, ১৯৯৮.
* রহমান শাহীন, *মানব উন্নয়নের চালচিত্র/৯৫*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/৪.
* রহমান শাহীন, *মানুষের উন্নয়ন*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/৮ম.
* রহমান শাহীন, *মানুষের উন্নয়ন / দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষাপট*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১০ম.
* রহমান শাহীন, *জেন্ডার উন্নয়ন পদক্ষেপ/১১, ১৯৯৮*.
* প্রাগুপ্ত, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১৪.
* মো: আনিসুর রহমান, *অমর্ত্য সেন ও উন্নয়নের অর্থ সংস্থান*, উন্নয়ন বিতর্ক/৪র্থ.
* সুব্রত কুমার সাহা, *নারী উন্নয়ন ও কিছু কথা*, উন্নয়ন পদক্ষেপ/১১, ১৯৯৮.
* আবেদা সুলতানা, *নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নই নারী উন্নয়নের ভিত্তি ঃ একটি বিশ্লেষণ*, ক্ষমতায়ন/২, উইমেন ফর উইমেন, ১৯৯৮.
* হোসেন, *পরিকল্পনা প্রণয়নে গানিতিক মডেলের ব্যবহার*, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা/৪র্থ.
* ফ.র.মাহমুদ হাসান, *উন্নয়ন ঃ বিকল্প দৃষ্টিকোণ / বিশ্লেষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ/৪২,

পত্রিকা

* দৈনিক প্রথম আলো, ৮ই জুন, ২০০১.